প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭,

প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর
শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫নং ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৺রাজবালা দেবী
মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

তোমার এমন শাণিত বচন

বর্তমান কালে রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের নয়নের সম্মুখে মধ্যাহ্ন-সূর্যের দীপ্তি নিয়ে বিরাজমান। তার ভাষার মাধুর্য ও ভাবের মর্মস্পর্শিতা আমাদের নিকট শুধু বিস্ময়ের বস্তু নয়, গর্বের বস্তুও বটে। শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন কারলাইল বলেছিলেন যে যদি প্রশ্ন ওঠে যে শেক্সপীয়ার আর ভারত-সাম্রাজ্য ইংরেজদের এই যে দুটি দুর্মূল্য সম্পদ আছে, তাদের মধ্যে একটিকে ছেড়ে দিতে হবে তা হলে ইংরেজ কি করবে? সেই প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে তিনি নিজেই তার উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে যে ইংরেজ তা হলে অনায়াসে ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে রাজী হবে, কিন্তু শেক্সপীয়ারকে কিছুতেই ছাড়তে সম্মত হবে না। আমাদের ভারতবাসীদের সামনে যদি অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে একদিকে রবীন্দ্রসাহিত্য এবং অপর দিকে আমাদের যা বাস্তব শ্রেষ্ঠ সম্পদ আছে, তাদের মধ্যে একটিকে ত্যাগ করতে হবে, তা হলে আমরাও অনুরূপ উত্তর দিতাম। ধরা যাক কেউ যদি বলেন হয় দিল্লী না হয় রবীন্দ্রসাহিত্য, এদের কোন্‌টাকে রাখবে, তা হলে একথা নিশ্চিত সত্য যে আমরা ভারতবাসীরা বলব যে দিল্লী ত্যাগ করতে স্বীকার, তবু রবীন্দ্রনাথকে নয়। রবীন্দ্রসাহিত্য আমাদের আনন্দের অক্ষয় ভাণ্ডার, আমাদের জাতির গৌরব, বহির্বিশ্বে আমাদের পরিচয়-পত্র। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যকে আমরা এত ভালবাসি, তাই রবীন্দ্রনাথকে আমরা এমন ভক্তি করি।

কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন আমাদের দেশেরই মানুষ তাঁকে এ চক্ষে দেখে নি, তাঁর রচনার প্রতিকূল সমালোচনা ক'রে তাঁকে অতিষ্ঠ করেছে। তখন রবীন্দ্রনাথ সবে মাত্র সাহিত্যের আসরে প্রবেশ লাভ করেছেন। তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর তাঁর রচনায় কিছু কিছু প্রকট হয়ে পড়েছে, তাঁর ভাবী বিরাট সম্ভাবনার আভাস কোনো কোনো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীর চোখে ধরা পড়েছে, কিন্তু তখনো তিনি সাহিত্যসমাজে ভাল রকম প্রতিষ্ঠা পান নি। তাঁর লেখার নূতন রীতি, নূতন রচনাভঙ্গি, নূতন বিষয়বস্তুর বিন্যাস সকলের চক্ষেই নূতন লেগেছিল। তবে বেশীর ভাগ মানুষের মনেই রচনার এই অভিনবত্ব মন্দ লাগেনি এবং অনেকের মনে তা একটি প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় দলের কাছে রচনারীতির অভিনবত্ব এবং সমাজনীতির বিরোধী বিষয়বস্তুর অবতারণা অপ্রীতিকর ঠেকেছিল

এবং ফলে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিকূল সমালোচনা করতে সুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভা সে প্রতিকূলতাকে অবহেলা ক'রে সাহিত্য-সমাজে অনতিবিলম্বেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল বলে সে প্রতিকূলতার কঠোরতা আমাদের অনেকের কাছে নূতন সংবাদরূপে প্রতিভাত হবে। আমাদের মধ্যে যাঁরা নবীন তাঁরা এটাকে সম্পূর্ণ নূতন খবর বলেই গ্রহণ করবেন, যাঁরা প্রৌঢ় তাঁরা খানিকটা হয়ত স্মরণ করতে পারবেন। কেবল যাঁরা অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ তাঁদেরই এ বিষয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান লেখকেরও যে প্রথম জীবনে অত্যন্ত কঠোর এবং হৃদয়হীন প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা বর্তমান পাঠকসমাজে মোটামুটি নূতন তথ্য বলেই গৃহীত হবে।

এই প্রতিকূলতা পাঠকের মধ্যে বেশ ব্যাপকভাবে সেদিন বিস্তার লাভ করেছিল। সাধারণ পাঠক হতে যশস্বী সাহিত্যিক, সকলেই এই প্রতিকূল গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত ছিলেন। সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ হিসাবে শ্রীঅকিঞ্চন দাসের মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন :

'রবীন্দ্রনাথের ভাব যেমন বিকট, ভাষাও তেমনি উদ্ভট। ঐ মনগড়া ভাষা কত দিন টিকিবে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ আছে।'

(চব্বিশ পরগণা বার্তাবহ)

অকিঞ্চন দাস ছিলেন গ্রামের মানুষ। তাঁর মন্তব্যেই এত তিক্ততা। যাঁরা ছিলেন কলিকাতা মহানগরী-নিবাসী সাহিত্যিক-ধুরন্ধর, তাঁদের প্রতিকূল মন্তব্য তিক্ততায় আরও পীড়াদায়ক ছিল। এই প্রসঙ্গে সেকালের তিনজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা হলেন কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ছিলেন সে যুগের 'হিতবাদী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি নিজে কবি ছিলেন। তাই প্রতিকূল মন্তব্যগুলি কবিতার আকারে রূপ দিতে ভালবাসতেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র এবং সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'সাহিত্য'-এর সম্পাদক। এই পত্রিকাতেই প্রধানত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত প্রতিকূল আলোচনা স্থান পেত। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বনামধন্য কবি ও নাট্যকার। তাঁর সাহিত্য-শক্তি ছিল যেমন অসাধারণ তেমন মনে হয় তিনিই এদের মধ্যে প্রতিকূল আলোচনায়

প্রধান অংশটি গ্রহণ করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধটির রাহু নাম দিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের এই প্রতিকূল সমালোচকের ভূমিকার কোনো নামকরণ করে গেছেন বলে জানা নেই। তবে প্রসিদ্ধ সমালোচক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে রবীন্দ্রসাহিত্যের কালমেঘ বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের প্রতিকূল সমালোচনার বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা পুস্তক হল 'কবিকাহিনী'। তা প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বৎসর। তার পরের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র প্রকাশ হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হয় পর বৎসর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। কবি নিজেই বলেছেন যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' অবধি তাঁর কাব্যজীবনে যে যুগ চলেছিল তা শৈশবের যুগ। তাকে তিনি কপিবুকের যুগ আখ্যা দিয়েছেন এই কথা বোঝাতে যে, শিশু হাতের লেখা পাকাতে যেমন কপিবুকে দাগ টানে, কবি-জীবনের এই অধ্যায়ে তিনিও তাই করেছেন। খানিকটা হাত পাকিয়ে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়ে তিনি প্রথম যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন তা হল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। তিনি নিজেই বলেছেন কপিবুকের যুগের চৌকাঠ পেরিয়ে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু এখানেও তিনি নিজের কবিসত্তাকে ঠিক খুঁজে পান নি। শৈশবে তাঁর প্রকৃতির সহিত যে সংযোগ ছিল তা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে কবিতা রচনার শক্তি অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। তাই কবি নিজের কল্পিত বিষয়কে নিয়েই রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই কারণে তার কবিতাগুলির মধ্যে একটা বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়।

এই আবদ্ধ ভাব হতে কবি মুক্তি পান একটি দিব্যদৃষ্টির অভিজ্ঞতার ফলে। তাই হল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটির প্রেরণা। এইভাবে 'প্রভাত সঙ্গীত'-এ কবির সহিত বহির্বিশ্বের সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। তার পরে পাই প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল'। তা প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। এই কাব্যগ্রন্থে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি-প্রবণতা বিশেষ পরিস্ফুট। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাত সঙ্গীত' সেকালের পাঠকের বিশেষরকম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এমন কি দু-এক জন প্রবীণ সাহিত্যিক তার মধ্যে ভাবী সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখে তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। কিন্তু 'কড়ি ও কোমল'-এর আবির্ভাব যেন সাহিত্য-জগতে একটা রীতিমত আলোড়ন এনেছিল। তার পরিচয় আমরা

পাই প্রতিকূল সমালোচকদের মন্তব্য হতে। এটা সুনিশ্চিত যে তাঁদের মনকে তা বিশেষ রকম বিচলিত করেছিল।

প্রথম হতেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা বিভিন্নমুখী ছিল। নাট্যের ক্ষেত্রে 'রুদ্রচণ্ড'-ই প্রথম গ্রন্থ। তা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। একই বৎসর গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচিত হয়। তার প্রচার আরও বেশী হয়েছিল, কারণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে তার যে অভিনয় হয় তাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির চরিত্র অভিনয় করেন এবং কলিকাতার বিদগ্ধসমাজের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তারপর রচিত হয়েছে 'কালমৃগয়া', 'নলিনী', 'প্রকৃতির পরিশোধ' প্রভৃতি। তারও পর 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন'। শেষের দুটি নাট্য পরিণত শিল্পী-মনের রচনা। এগুলি পাঠকসমাজে আদৃত হয়েছিল, কিন্তু তেমন প্রতিকূল সমালোচনার পাত্র হয় নি। সম্ভবত তার কারণ, তার বিষয়বস্তু রক্ষণশীল মনের কাছে নীতিবিরুদ্ধ ঠেকে নি। কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য-নাট্যের ভাগ্য ছিল একান্ত মন্দ। তার প্রকাশ-তারিখ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। তার কাব্য-মাধুর্য, তার রচনাশৈলী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা সমালোচক মহলে ভীষণ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তার কারণ, তার গল্প সমাজনীতির মর্যাদা লঙ্ঘন করেছিল। সমালোচকের নীতি-বোধ আঘাত পেয়ে তাই ভীষণ রুষ্ট হয়েছিল।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক। তার প্রকাশন-তারিখ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। তাঁর বয়স তখন বাইশ বৎসর মাত্র। জীবনের অভিজ্ঞতা যৎসামান্যই। এই উপন্যাসে কাঁচা হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। পরবর্তী উপন্যাস-গ্রন্থ 'রাজর্ষি' প্রকাশ হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। তার প্রেরণা একটি স্বপ্ন। তুলনায় তা উৎকৃষ্টতর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখনীর ক্ষমতার পূর্ণ গৌরব তাতে প্রকট হয় নি। পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে তা প্রথম প্রকট হয় 'চোখের বালি' উপন্যাসে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। এমন পুস্তক ঔপন্যাসিক হিসাবে যেমন তাঁর প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল, তেমন সমালোচক মহলেও দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। তারও কারণ কাহিনীর বিষয়বস্তু। কাহিনীর নায়িকা বিনোদিনী বিধবা। এক বিবাহিত যুবকের সহিত তাঁর প্রণয়কাহিনীই মূল ঘটনা। সুতরাং তা সমাজনীতি-বিরুদ্ধ এবং সেই কারণেই যেন সমালোচক বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু এমন ভাবে ক্ষুব্ধ হবার সঙ্গত কারণ বিশেষ পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে গোবিন্দলাল ও রোহিণীকে কেন্দ্র ক'রে একটি অনুরূপ কাহিনী সাহিত্যে

স্থান পেয়েছিল। সামাজিক নাটকে বিধবার প্রণয়কাহিনী একটি স্বাভাবিক বাস্তবধর্মী ঘটনা। তাতে বিশেষ আপত্তির কি কারণ হতে পারে বোঝা যায় না। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে সমালোচক-গোষ্ঠী যেমন শক্তিমান ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে সাহিত্যের শৈশব অবস্থায় তাঁরা তেমন প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন না।

আমরা দেখব এই 'কড়ি ও কোমল', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চোখের বালি' নামে তিনটি গ্রন্থ সমালোচকদের যেন বিষদৃষ্টিতে প'ড়েছিল। তাদের লক্ষ্য ক'রেই প্রধানত তাঁদের কটুভাষার উক্তিগুলি বর্ষিত হয়েছিল।

'কড়ি ও কোমল'-এর প্রথম সংস্করণে হাল্কা সুরে লেখা কতকগুলি কবিতার আকারে লেখা চিঠি স্থান পেয়েছিল। চিঠিগুলি যাঁকে উদ্দেশ ক'রে লেখা, তিনি হলেন কবির পরম স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। খুড়ো-ভাইঝির সম্পর্কটি মধুর এবং হাল্কা হওয়া স্বাভাবিক। কবিতাগুলিও সেই সুরে লেখা। শুধু তাই নয়, রচনাভঙ্গিতেও বেশ শিথিলতা ছিল; যেমন, ইংরাজি ও বাংলা কথার মিশ্রণ, অর্ধবোধ্য কথার ব্যবহার ইত্যাদি। অপর পক্ষে, এই কাব্যগ্রন্থে কতকগুলি নূতন বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছিল। উভয় কারণেই বইখানি সমালোচকদের তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

প্রতিকূল সমালোচনায় যিনি সবার অগ্রণী হয়েছিলেন, তিনি হলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। এই কাব্যে প্রথম প্রবর্তিত রচনার রীতিও তিনি পছন্দ করেন নি, কবিতায়-লেখা চিঠিগুলিও তিনি বরদাস্ত করেন নি। প্রথমে কবিতায়-লেখা চিঠিগুলির কথা আলোচনা করা যাক। তিনি এই গ্রন্থের প্রতিবাদ বেশ আড়ম্বর-সহকারেই করেছিলেন। প্রতিবাদের বাহন করেছিলেন তিনি কবিতাকে এবং তাদের সংকলনটিকে 'কড়ি ও কোমল নহে, পুরো সুরে মিঠে কড়া', এই নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। পুস্তকটিতে তিনি নিজ পিতৃদত্ত নাম ব্যবহার করেন নি। ছদ্মনাম দিয়েছিলেন 'রাহু'। এই ব্যবস্থা হতে অনায়াসেই তাঁর 'কড়ি ও কোমল' সম্বন্ধে মনোভাবটি বেশ অনুমান করা যায়। তিনি 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলির সমালোচনা ক'রে কবিকে বেশ ভাল-রকম মিঠে-কড়া কথা শুনিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে রাহুগ্রস্ত করতে চেয়েছিলেন। এই কবিতা-সংকলনের হাল্কা সুর, অর্থহীন শব্দ সংযোজন এবং ইংরাজি কথার মিশ্রণ ইচ্ছাকৃত। উদ্দেশ্য হল দেখান যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'কড়ি ও কোমল'-ই তার মডেল এবং তার

পরিপূর্ণ কলঙ্কের চিত্রটি দেখতে হলে 'কড়ি ও কোমল'-এ তা পাওয়া যাবে। তিনি তাই পাঠককে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন :

'ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ
বঙ্গের আদর্শ কবি।
শিখেছি তাঁহারি দেখে
তোরা কেউ কবি হবি ?
'কড়ি ও কোমল' পড়
পুরো সুর চাস যদি।'

এই কবিতা-সংকলনে তিনি 'কড়ি ও কোমল' হতে নয়টি কাব্যাংশ উদ্ধৃত ক'রে তার ওপর কবিতায় নিজের মন্তব্য দিয়েছেন। এই মন্তব্য-সংগ্রহটির তিনি নাম দিয়েছেন 'নবরত্ন'। নামকরণই সূচিত করে মন্তব্যগুলির মূল সুরটি ; ব্যঙ্গই সেই সুর। তার দুটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠির অংশ এই :

'মাগো আমার লক্ষ্মী
মনিষ্যি না পক্ষী
এই ছিলেম তরীতে
কোথায় এনু ত্বরিতে
কাল ছিলেম খুলনায়
তাতে আর ভুল নাই
কলকেতায় এসেছি সদ্য
বসে বসে লিখছি পদ্য।'

(কড়ি ও কোমল, প্রথম সংস্করণ)

এই সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মন্তব্য এই :

'আয় তোরা কে দেখতে যাবি
ঠাকুর বাড়ীর মস্ত কবি॥
হায়রে কপাল, হায়রে অর্থ !
যার নাই তার সকল ব্যর্থ।'

অর্থাৎ ইঙ্গিতে তিনি ঠেস দিয়ে এই কথাটি শোনাতে চেয়েছেন যে যিনি অর্থশালী তিনি যা লিখবেন তাই কবিতা নামে চলবে।

ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লেখা আর একটি কবিতায়-লেখা চিঠির অংশ এইরূপ :

'তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম।
খোপে বসে পায়রা যেমন
কচ্ছে কেবল বকবকম।
আজকে নাকি মেঘ করেছে
ঠেকছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা।
তাই খানিকটা ফোঁস ফোঁসিয়ে
বিদায় হল রবি কাকা।'

(কড়ি ও কোমল, প্রথম সংস্করণ)

এই হাল্কা ভাষায় লেখা অপরিমার্জিত রচনাটি কাব্যবিশারদ মহাশয়ের নিকট এতই অসহ্য হয়েছিল যে তিনি কবিকে খোপে আবদ্ধ থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন :

'উড়িস নে রে পায়রা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা।
তোর বক্‌বকম আর ফোঁস ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা।'

বাস্তবিকই নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেও এই কবিতায়-লেখা চিঠিগুলিকে এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া উচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। সম্ভবত কাব্যে চিঠি লিখে ভ্রাতুষ্পুত্রীর মনোরঞ্জন করাই ছিল উদ্দেশ্য। কাকা যেখানে কবি সেখানে ভাইঝি কাব্যে লেখা চিঠিই আশা করেন। তা নিতান্ত ঘরোয়া জিনিষ। কবিতাগুলির মধ্যে এমন সাহিত্যিক গুণ ছিল না যা তাদের কাব্য-গ্রন্থে স্থান দেবার অধিকার দিতে পারে। এইখানেই সম্ভবত অবিবেচনার কাজ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী লিখিত 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রথম সংস্করণের সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। সমালোচনাটি 'নব্য ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মোটামুটি গ্রন্থখানি সম্পর্কে তিনি সপ্রশংস মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। তার কাব্যগুণ যে তাঁকে সবিশেষ মুগ্ধ করেছিল তা তাঁর নীচে উদ্ধৃত মন্তব্য হতে বেশ বোঝা যায় :

'একথা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে রবীন্দ্রবাবু বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া এ যুগের অধিনায়ক হইয়া বসিয়াছেন।'

যিনি কবির প্রথম জীবনেই তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আসনে অভিষিক্ত করেছিলেন তিনিও এই কবিতায়-লেখা চিঠিগুলির প্রতি সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন নি। তিনি যা মন্তব্য করেছিলেন তা একটু কঠোর হলেও তার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার না করা শক্ত হয়ে পড়ে। তিনি লিখেছিলেন :

'শ্রীমতী ইন্দিরার নিকট কবি যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহার অনেক স্থানেই বেশ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানে স্থানে অসার কথায় পূর্ণ, এ সকল পত্র অন্য পুস্তকে ছাপাইলেই ভাল হইত।

'এইগুলি কি না ছাপাইলেই চলিত না? এগুলি সন্নিবেশিত করা সম্পাদকের নিতান্তই ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর রবীন্দ্রবাবু যদি ছাপাইতে বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কি এতই অহংকারী মনে করিব যে তাঁহার সব লেখাই তিনি ছাপাইবার উপযুক্ত মনে করেন?'

'কড়ি ও কোমল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ যখন প্রকাশ হয় তখন এই কবিতায়-লেখা চিঠিগুলি তাতে স্থান পায় নি। সেই কারণে বর্তমানেও এই কাব্যগ্রন্থে সেগুলি দেখা যায় না। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর মন্তব্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

'কড়ি ও কোমল'-এর যুগের পর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শক্তি ও সম্পদের নানা পরিচয় তাঁর কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, সমালোচনায়, নাট্যে প্রকট হয়ে পড়ল। তখন তাঁর প্রতিভার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করবার আর কোনো কারণ থাকল না। যিনি প্রতিকূল সমালোচক তিনিও অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে রবীন্দ্রনাথ শক্তিশালী লেখক। কিন্তু তা বলে তাঁরা সমালোচনায় প্রতিকূলতা বর্জন করতে পারলেন না। কারণ, তাঁর রচনার রীতি তাঁদের রুচিবোধে বাধে, তাঁর রচনার বিষয়বস্তু তাঁদের নীতি-বোধকে পীড়িত করে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমালোচনা এই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই লেখা।

'চোখের বালি' উপন্যাস হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরিণত হস্তের প্রথম রচনা। তা প্রথম ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয় নব-পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'-এ। 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রকাশিত হয় স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এবং সম্পাদনায়। তারপর তাঁর অগ্রজ কিছুকাল তার সম্পাদনা করেন। তারপর তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কিছুকাল পর রবীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩০৮ সন হতে তা পুনঃপ্রবর্তিত করেন। তার নাম হয় 'নব বঙ্গদর্শন'। এই 'নব বঙ্গদর্শন'-কে আশ্রয় ক'রেই 'চোখের বালি'-র

প্রথম আবির্ভাব। সেই প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই উপন্যাসের একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। তা হতে উদ্ধৃত নীচের মন্তব্যটি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচয় দেবে :

'আমরা বলিতেছি যে আমাদের অত্যল্প আলোকানুসারে অবশ্যই বরাবর বলিব যে রবিবাবু এত বড় লম্বা ও এমনতর কুৎসিত উপন্যাসে হাত দিয়া একেবারেই ভাল করেন নাই। ভগবান তাঁহাকে যে শক্তি দিয়াছেন তাহা এরূপ কার্যের আদৌ উপযোগী নহে।'

উপরের মন্তব্য হতে মনে হয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের কারণ, তা তাঁর নীতিবোধে আঘাত দিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধিতা আরো ব্যাপক। রচনার রীতিও তাঁর নিকট যেমন রুচিবিরুদ্ধ, রচনার বিষয়ও তেমনি নীতিবিগর্হিত। অথচ সাহিত্যিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। বরং তাঁর অসাধারণ ক্ষমতাই দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁর উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চালানর প্রেরণা জুগিয়েছিল। ভাবটা যেন এই যে, তাঁর কুদৃষ্টান্ত দেখে অন্য যাঁরা তাঁর অনুসরণ করেন, তাঁদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ; কাজেই তাঁদের ক্ষতি করবার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ ক্ষমতাবান লেখক হয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন তার অনুকরণ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। তিনিই যেন কুদৃষ্টান্ত ছড়াবার মূলে। কাজেই তাঁকে তিনি বিষবৃক্ষের মূলের সহিত তুলনা করেছেন। মূলে আঘাত করলেই এ ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়। এই হল তাঁর মনোভাব। নীচে উদ্ধৃত তাঁর মন্তব্য হতে সেটি বেশ পরিষ্কার হয়ে যাবে :

'কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে আমি রবীন্দ্রবাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন ? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, তাহা না করিয়া কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব ? তাহার দোষ কি ? সে বেচারী অন্ধ অনুকারক মাত্র। সে রবিবাবু মাইনাস প্রতিভা, সে সকল ব্যক্তি সমালোচকের অবজ্ঞেয়। তাহাদের কাব্যের জন্য দোষী অর্ধেক তাহারা, অর্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্রবাবু। শুদ্ধ পাপে বড় যায় আসে না ; কিন্তু দুর্নীতির প্রাণশক্তি বড় ভয়ঙ্কর। তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে।'

(কাব্যে নীতি)

এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল বলেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলালের আক্রমণ এমন সর্বাত্মক হয়েছিল। তিনি নিজেও ছিলেন গুণী সাহিত্য-শিল্পী। তাই আক্রমণ নানা রূপে প্রকাশ লাভ ক'রে বিচিত্র হয়ে উঠেছিল। যেখানে রবীন্দ্রনাথের রচনার রীতি তাঁর রুচিবিরুদ্ধ হয়েছিল সেখানে তিনি আক্রমণ করেছিলেন পাল্টা প্যারডি রচনা করে। কোথাও নিজ-রচিত নাটকের চরিত্রের মুখ দিয়ে পরোক্ষভাবে অপবাদ প্রচার হয়েছিল। কোথাও প্রত্যক্ষভাবে সমালোচনা-প্রবন্ধে তা নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

প্যারডিতে পরোক্ষ নিন্দার একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা শুরু হয়েছে এইভাবে :

'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসরমত বাসিও
আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিও।'

এর অনুকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল নীচের প্যারডি কবিতাখানি রচনা করেছিলেন :

'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি 'লেজার' মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে বসে আছি
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।'

নাটকের চরিত্রের মাধ্যমে পরোক্ষ আক্রমণ অতি মারাত্মক রূপ নিয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ বিদায়' নাট্যে। সেখানে অনেক শ্লেষপূর্ণ উক্তি আছে যা পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখা বলে মনে করা যায়' এমন কি তা কোথাও কোথাও রুচির সীমাও লঙ্ঘন করেছে। কাজেই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রেই এই প্রসঙ্গটি আমরা শেষ করব। 'আনন্দ বিদায়'-এর প্রস্তাবনার একটি উক্তি নীচে স্থাপিত হল। পাঠক অনুমান করতে পারেন এর লক্ষ্য বস্তু কে :

'নাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর
লালসার শুধু অনুরক্তি
এটা তাঁরও মস্তকে চাঁটিকা।'

(আনন্দ বিদায়, প্রস্তাবনা)

দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য হল যে রবীন্দ্রনাথের রচনা দুর্নীতি প্রচার করে এবং সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে তা নিতান্তই হানিকর। রবীন্দ্রনাথের সাধারণ প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্য এই :

'রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন। 'সে আসে ধীরে', 'সে কেবল চুরি ক'রে চায়', 'দুজনে দেখা হল' ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান—সবই ইংরাজি কোর্টশিপের গান।

'তাঁহার 'তুমি যেও না এখনি', 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' ইত্যাদি লম্পট বা অভিসারিকার গান।'

(কাব্যে নীতি)

উপরের মন্তব্য হতে মনে হয় প্রণয়ীর বচনে বা আচরণে প্রগল্‌ভতা তাঁর রুচি-বিরুদ্ধ। তাই এই ধরণের কবিতা তাঁর ভাল লাগেনি।

প্রত্যক্ষ সমালোচনার নিষ্ঠুরতা চরমে উঠেছিল ইংরাজি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'চিত্রাঙ্গদা'-নাট্য প্রকাশের পর। প্রমথ চৌধুরীর মতে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য মানুষের যৌবন স্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র। দ্বিজেন্দ্রলালও যে তার গুণগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন নি তা নয়। রচনা হিসাবে তার সৌন্দর্যের তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

'আমি চিত্রাঙ্গদার সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবদ্ধ পদ, ইহার উপমাচ্ছটাও অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর বোধ হয় আর কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।'

(সাহিত্য, ১৩১৬ চৈত্র সংখ্যা)

এত গুণ সত্ত্বেও বিনা দ্বিধায় তিনি তাকে দগ্ধ করতে বলেছিলেন এই কারণে যে তাঁর মতে নাট্যের নায়কের আচরণে ভীষণ দুর্নীতি প্রচার হয়েছে এবং ফলে প্রাচীন ভারতের একটি সর্বজন-সম্মানিত চরিত্রের মর্যাদাহানি ঘটেছে। তাঁর মতে গ্রন্থখানি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য হতেও খারাপ, কারণ সে কাব্যের দোষ হল তা অশ্লীল, আর এ গ্রন্থ দুর্নীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অশ্লীলতা রুচি বিকৃত করে, কিন্তু যা নীতিবিরুদ্ধ তার সংস্পর্শে এলে সমাজ নষ্ট হয়। তাঁর মতে তাই সুরুচি বাঞ্ছনীয় কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য। তাই 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অশ্লীলতা মার্জনীয় কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা'-র দুর্নীতি ক্ষমার অযোগ্য। সেই কারণেই তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যের

সমালোচনা এত কঠোর হয়ে উঠেছে। তাঁর মন্তব্যের কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল :

'রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন দেখুন।...... অর্জুন একজন কুমারীর ধর্ম নষ্ট করিলেন। একটু ইতস্তত করিলেন না, মনে একটুমাত্র দ্বিধা হইল না। বর্ষকাল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। আর তিনি যে সে ব্যক্তি নহেন, তিনি অর্জুন, রাজপুত্র, পঞ্চপাণ্ডবের একজন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথ্য করিতেন, যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে উর্বশীর প্রেমও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। যিনি বেশ্যাসক্তিও অনুচিত বিবেচনা করিতেন, তিনিও রবীন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে একটি রাজকন্যার ধর্মনাশ করিলেন।'

(সাহিত্য, ১৩১৬, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা)

এত যে তাঁর ওপর আক্রোশমূলক আক্রমণ চলেছিল তার ফলে রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ আমরা বিশেষ লক্ষ্য করি না। মনে মনে প্রতি-আক্রমণের জন্য কোনো উৎসাহ তিনি পান নি। তার কারণ, তাঁর সূক্ষ্ম রুচিবোধ ছিল তাতে প্রধান বাধা। প্রতি-আক্রমণ করতে গেলে নিজেকেও যে সমালোচকদের স্তরে নামতে হয়। তবে মনে যে বেদনা পেয়েছিলেন প্রচুর, সে কথাও ঠিক। তার কিছু পরিচয় তাঁর একটি কবিতা হতে পাই।

সাহিত্যিকদের জীবনে সমালোচনার কষাঘাতের প্রতিক্রিয়া নানারূপে দেখা যায়। প্রতিকূল সমালোচনা কীট্স-এর কোমল হৃদয়ে এমন প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল যে তাঁর তরুণ বয়সে অকাল মৃত্যু ঘটিয়েছিল। আমাদের দেশে প্রাচীন কবিদের মধ্যে ভবভূতির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্য করুণরসমণ্ডিত হয়ে এমন কোমল রূপ ধরেছে যে পাষাণকেও গলিয়ে দেবার তা ক্ষমতা রাখে। কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁকেও ভীষণ প্রতিকূল সমালোচনার যে সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। তিনি, যাঁরা তাঁকে অবজ্ঞা করেছিলেন তাঁদের প্রতিকূল সমালোচনা হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছিলেন যে তাঁরা বিশেষ কিছুই জানেন না, কাজেই তিনি অপেক্ষা করবেন ভাবী কালের জ্ঞানবান গুণগ্রাহী সমালোচকের জন্য :

'যে জন আমারে করে অবজ্ঞা প্রকাশ
সামান্যই জানে সে যে, এ যতন তার তরে নয়।

অপেক্ষিব সমধর্মা লাগি, হব না নিরাশ,
আছে কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা যে হয়।'*

ভবভূতি তাঁদের অজ্ঞ বলে উপেক্ষা করেছিলেন। প্রথিতযশা ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও অনুরূপ অবস্থায় পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন অন্যভাবে। তিনি ইংরাজি সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীতে যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ততখানি আর কোনো কবি করেন নি। তিনি ছিলেন নূতন রীতির নূতন ভাবধারার প্রবর্তক। সাধারণ বস্তু বা ঘটনাকে সাধারণ সরল ভাষায় প্রকাশ দিয়ে তিনি কবিতায় অসাধারণের পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম জীবনে সমালোচক-গোষ্ঠী না তাঁর ভাষা, না তাঁর ভাবধারা, কোনোটিকেই সুনজরে দেখতে পারেন নি। তাই তাঁর ভাগ্যেও রবীন্দ্রনাথের মত প্রথম জীবনে কঠোর প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি সেই সমালোচনার আঘাত হতে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই মন্তব্যগুলির প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়ে। লেডি ব্যোমন্ট্‌-কে লেখা তাঁর এক চিঠিতে সে বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন :

'আমার কান দুটিকে এই অর্থবিহীন গুঞ্জন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বধির ক'রে রেখেছি এবং আমার দেহকে উপেক্ষণীয় দংশন-দাহ সম্পর্কে লোহার মত বোধশক্তি-বিহীন করেছি।'†

রবীন্দ্রনাথ যেটুকু প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তা ছিল ভিন্ন ধরণের। তিনি সমালোচকদের অজ্ঞ বলে তাচ্ছিল্য করেন নি বা আঘাত হতে আত্মরক্ষার জন্য তাঁদের প্রতি নিজেকে ঠিক উদাসীনও করেন নি। তিনি অতি সংযত ভাবে বলতে চেয়েছেন যে যদি কারও তাঁর কবিতা ভাল লাগে, তার জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া কেন :

'আমার এ লেখা কারো ভালো লাগে
তাহা কি আমার দোষ ?

---

* যে নাম কেচিৎ মাং প্রতি প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তেষাং প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

† "My ears are stone-dead to the idle buzz and my flesh as insensible as iron to these petty stings."

কেহ কবি বলে (কেহ বা বলে না)
কেন তাহে তব রোষ।'
(মানসী)

তিনি আরও বলেছেন যে হয়ত তাঁর লেখা সুন্দর নয়; তাই যদি হয়, গুণের অভাবে পাঠক দু'দিন পরে তাঁর কথা ভুলে যাবে। সুতরাং শাণিত বচন প্রয়োগ ক'রে আঘাত হানবার প্রয়োজন আছে কি?

'হয় ত এ ফুল সুন্দর নয়
ধরেছি সবার আগে—
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে
ভুলে কারো ভালো লাগে।
যদি ভুল হয় কদিনের ভুল।
দুদিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন
সেই কি অমর হবে?'
(মানসী)

তিনি আর যা করেছেন তা আর কেউ করেন নি, নিজের অন্তরেরই মহত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। সমালোচককে ভৎসনা করা বা অবজ্ঞা করা দূরের কথা, তিনি তাঁকে অন্তরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই বলে যে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা যেন প্রতিষ্ঠা পায়। এই মহত্ত্বের জন্যই তো রবীন্দ্র-প্রতিভা শুধু আমাদের হৃদয় জয় করে না, তাঁর চারিত্রিক গুণ আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তিনি প্রত্যুত্তরে সমালোচককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই বলে:

'হউক ধন্য তোমার যশ
লেখনী ধন্য হক
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে
জাগাক সপ্তলোক।'
(মানসী)

উপরে যে কাব্যাংশগুলি উদ্ধৃত হল, সবই একই কবিতার অংশ। সে কবিতাটির নাম 'নিন্দুকের প্রতি'। তা 'মানসী' নামে কবিতা-গ্রন্থে স্থান পায়। 'মানসী'র

প্রকাশ-তারিখ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রকাশ-তারিখ ১৮৮৬। তাই দেখে মনে হয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের প্রতিকূল সমালোচনাই এই কবিতার লক্ষ্য বস্তু। তা যদি হয়, পরবর্তীকালে যখন 'চোখের বালি' ও 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশের পর অত্যন্ত কটু ভাষায় যে সব সমালোচনা প্রকাশ হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ কাব্যে হক, অন্তভাবে হক তার কোনো উত্তর লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে সমালোচককে লক্ষ্য ক'রে প্রথম জীবনে লেখা আর কোনো রচনা ত নজরে পড়ে না। তখন বোধ হয় তিনি নিন্দাকে গায়ে না মাখার মত মনের বল সঞ্চয় করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল এমনটি কেন হয়? এর সব থেকে ভাল উত্তর বোধ হয় ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-ই দিয়েছেন। তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম দিকের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে এ বিষয় বিশেষ ভাবিয়ে তুলেছিল। এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, যে কোনো বিশিষ্ট কবির জীবনে এমন ঘটে থাকে। এটি যেন কাব্যজগতের একটি সম্ভাব্য নিয়ম। নূতন প্রতিভাবান লেখকের প্রথম জীবনের রচনা যে প্রতিকূল সমালোচনার ইন্ধন জোগায় এটির কারণ এ নয় যে সমালোচক স্বভাবতই তাঁর প্রতি বিদ্বেষ বহন করেন। প্রকৃত কারণ হল নূতন প্রতিভাবান কবি ধরা-বাঁধা পথে প্রচলিত রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে কাব্য রচনা করেন না। নূতন শক্তির, নূতন শিল্পের, নূতন ভাবধারার তিনি প্রবর্তক। তার সঙ্গে সাধারণ সমালোচকের পরিচয় থাকে না। অপরিচিত বলেই তার গুণগ্রহণে সমালোচক অক্ষম হন এবং প্রথম দর্শনে তাঁকে সুনজরে দেখতে পারেন না।

তাই যদি হয়, তা হলে তার প্রতিকার কি? তার উত্তরও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নূতন লেখকেরই করতে হবে। তিনি যদি গতানুগতিক পথে চলতেন, তা হলে ত প্রতিকূল সমালোচনা ঘটত না। প্রতিকূল সমালোচনা ঘটে, কারণ নূতন প্রতিভাবান লেখক যে নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করেন তার সহিত সমালোচক পরিচিত নন। পুরাতনে অভ্যস্ত বলে তিনি নূতনের আস্বাদ গ্রহণে অসমর্থ। সুতরাং নূতনের আস্বাদ গ্রহণের উপযুক্ত রুচি যাতে গঠিত হয়, তার ব্যবস্থা সেই নূতন কবিকেই করতে হবে। তা সময়সাপেক্ষ, তবে কবি যদি সত্যই উৎকৃষ্ট কিছু দিতে পারেন, তা হলে তাঁর চেষ্টা সফল হবে. ভবিষ্যতে সমালোচকের হৃদয়

তিনি জয় করবেন। এই কথাগুলি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লেডি ব্যোমণ্ট্-কে লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করছেন। তিনি বলেছেন :

'আমার মনে হয় কোল্‌রিজ্ তোমার কাছে যে মন্তব্য করেছিলেন, সেটা তুমি ভুলে যাও নি যে প্রতি বিশিষ্ট এবং মৌলিক লেখকের, যে পরিমাণে তিনি বিশিষ্ট এবং মৌলিক, সেই পরিমাণে কর্তব্য এসে পড়ে, সেই রুচি গড়ে তুলতে যা দিয়ে তার আস্বাদ গ্রহণ করা যায়।'*

ঠিক এই কথাই আরও সংক্ষিপ্ত ভাষায় তাঁর 'লিরিক্যাল ব্যালাড' কবিতা-পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের স্বলিখিত ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন। লেডি ব্যোমণ্ট্-কে লিখিত চিঠির ভাষা হতে অনুমান করা যায় যে কোলরিজও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। এই দুই বিশিষ্ট কবির মত সম্ভবত ঠিক কথাই বলে। একথা বোধ হয় ঠিক যে সমালোচকের বিদ্বেষ ব্যক্তিগত কারণ প্রসূত নয়, বিদ্বেষের কারণ হল নূতন লেখক যা দেন তা তাঁর রুচিবিরুদ্ধ এবং সংস্কার-বিরুদ্ধ।

এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অংশে যে সকল প্রতিকূল সমালোচনা আংশিক-ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে তা আমাদের এই প্রতিপাদ্যটিকে সমর্থন করে। সমালোচকদের বিভিন্ন মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাদের প্রতিকূল আচরণের প্রেরণা দুটি। প্রথম, রবীন্দ্রনাথের রচনার রীতির নূতনত্ব তাঁদের রুচিকর ঠেকত না। দ্বিতীয়, তাঁদের নীতিবোধকে তাঁর রচনার বিষয়-বস্তু আঘাত করত।

প্রথমটির উদাহরণ দিতে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কিত মন্তব্যগুলির আলোচনায় আর একবার ফিরে যেতে হবে। এই কাব্যপুস্তকেই রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর কবিতা আছে যার নামটি হল 'যোগিয়া'। তার একটি স্তবক হল এই :

'বহু দিন পরে আজি মেঘ গেছে চলে
রবির কিরণ সুধা আকাশে উথলে।

* "Never forget what, I believe, was observed to you by Coleridge, that every great and original writer, in proportion as he is great and original, must himself create the taste by which he is to be relished."

(Letter to Lady Beaumont, 1807)

স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে
আলোক ঝলিয়া উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।"

এই কবিতাখানি 'কড়ি ও কোমল'-এর বর্তমান সংস্করণেও স্থান পেয়েছে। এখানে কবি একটি মধুর প্রভাতকে ঘিরে তাঁর মনে যে সুন্দর অনুভূতিটি গড়ে উঠেছে তার প্রকাশ দিয়েছেন। অবশ্য প্রকাশের রীতিটি নূতন। যে পুলকের অনুভূতি তাঁর মনে উদয় হয়েছে তাকে তিনি বিস্তৃত ক'রে দিয়েছেন প্রকৃতির বক্ষে। এর মাধুর্য অনুভব করতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে খানিকটা খর্ব ক'রে কল্পনাকে দৌড় দেবার সুযোগ দিতে হয়। কাব্যের রসাস্বাদ করতে সেটা অবশ্য-কর্তব্য রীতি। কারণ সাহিত্যে ত সত্য অবিমিশ্র সত্যরূপে অবিকৃত থাকতে পারে না। সত্যকে অবিকৃত আকারে প্রচারের কাজ হল দর্শন ও বিজ্ঞানের। কিন্তু সাহিত্য হল শিল্প এবং যে হেতু তা শিল্প তার লেনদেন বুদ্ধিবৃত্তির সহিত নয়, হৃদয়বৃত্তির সহিত। সেই কারণেই সত্যকে কল্পনায় রঙীন ক'রে দেখবার অধিকার কবির আছে। তাই জন্যই ত দেখা যায় কাব্যে এত উপমা ও রূপকের ছড়াছড়ি। কিন্তু কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কবিকে এই স্বাধীনতা দিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই যা অপরিচিত তার ভালমন্দ বিচার না করেই তাকে তাচ্ছিল্য করেছিলেন নিদারুণ উপহাস ক'রে। তাঁর প্রতিকূল মন্তব্য কবিতায় এই ভাবে প্রকাশ হয়েছিল :

'মানুষের মনে মনে
এতদিন ছিলে ভাল।
কেনরে পুলক আজ
তোমার এ দশা হল
নাচিতেছ কোন গাছে
কোথায় সে গাছ আছে ?
না জানি কেমন গাছ, হায়রে কপাল।'

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্যারডি-যোগে উপহাসও এই শ্রেণীতে পড়ে। তাঁর রুচিবোধে বাধে বলেই তাকে তিনি উপহাস করেছেন। এ বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে বলে এর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিকূল সমালোচনাগুলি কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তারা হল দ্বিতীয় প্রেরণার উদাহরণ। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির

প্রতিকূলতাও একই কারণ হতে উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথের রচিত কাহিনীতে বিভিন্ন সমাজনীতি লঙ্ঘিত হত, এই হল তাঁদের অনুযোগ। তাঁর রচনা সমাজকে নষ্ট করবে এই আশঙ্কায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর সমালোচনার অভিযান আরম্ভ করেছিলেন। উদাহরণ-স্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য-নাট্যের সমালোচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নাট্যের কাহিনীতে অর্জুনের কুমারী নায়িকার সহিত প্রণয়ের উল্লেখ আছে বলেই দ্বিজেন্দ্রলাল ভীষণ রুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন বরং রচনার অশ্লীলতাকে তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু দুর্নীতিকে কিছুতেই সহ্য করতে প্রস্তুত নন। গল্পে বর্ণিত এই আচরণটি যেহেতু সমাজনীতির বিরোধী সেই হেতু সাহিত্যে তার স্থান থাকা উচিত নয়, এই হল তাঁর যুক্তি।

দুঃখের বিষয় এই ধরণের সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যের গুণ গ্রহণে পাঠক বা সমালোচককে অনুপযুক্ত করে। এঁরা বুঝতে পারেন না যে সাহিত্যের জগত এবং দৈনন্দিন সংসারের জগত বিভিন্ন। প্রথমটি কল্পনার রচনা, দ্বিতীয়টি বাস্তব। প্রথমটির উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া, সত্য তথ্যের প্রচারও নয়, নীতির প্রচারও নয়। কাজেই সেখানে বাস্তব-অবাস্তবে যেমন ভেদ নাই, তেমন সুনীতি-দুর্নীতির ভেদ নাই। সংসারের জগতটা নিয়মের জগত। সেখানে আমরা নিয়মানুবর্তী হতে বাধ্য হই। যদি কল্পনা করি যে যেখানে ডোবা আছে সেটা রাজপথ, তা হলে তার ওপর হাঁটতে গেলে আমাদের জলে পতন অনিবার্য। সংসারে যদি অবৈধ প্রেম কেউ করতে যায়, সমাজ তার বিরুদ্ধাচরণ করবে। কিন্তু লেখকের জগত হল শিল্পীর জগত। তাই সেখানে নিয়মের রাজত্ব নেই। সেখানে কল্পনা ইচ্ছামত বিচরণ করবার অবাধ অধিকার পায়। সত্যাসত্য বিচারের তা উর্ধে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে প্রযোজ্য নয়। সেই রকম সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্নও সেখানে অবান্তর হয়ে পড়ে।

সমালোচক বলবেন, তা না হয় মানলাম, কিন্তু তা বলে তার বাস্তব জীবনের ওপর যে পরোক্ষ অবাঞ্ছনীয় প্রভাব বিস্তার হয়, তা কি প্রতিরোধ করা কর্তব্য নয়? সমাজের মানুষ হিসাবে এই ধরণের কর্তব্য তাঁর ওপর বর্তায় বটে, তবে তিনি যতটা আশঙ্কা করেন ততটা কুফল হয় না। সাধারণ মানুষ শিল্পীর জগত আর বাস্তব জগতকে পৃথক রাখতে জানে এবং শিল্পীর জগতের অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি যেমন বাস্তব জগতে আমদানী করে না, তেমন দুর্নীতিকে সঙ্গে আনে না। তা যদি না হত, বিভিন্ন ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে পাঠক

সমাজের এক বড় অংশ নরহত্যা করতে শিখত। অবশ্য তার ব্যতিক্রম আছে, সে কথা ঠিক।

আসল কথা হল সাহিত্যিকের রচনাটি দেখতে হবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। সমগ্রভাবে লেখক যে-কথা বলতে চেয়েছেন তা কী দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়, না দেয় না? পাঠকের মনের কাছে তার সামগ্রিক আবেদনটি সুন্দর, না অসুন্দর? যদি তা অসুন্দর হয়, তাহলে তা দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারে। আর তা যদি হয়, তাহলে সে সাহিত্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং সেই কারণেই বেশী দিন স্থায়ী হতেও পারবে না। যদি তা সুন্দর হয়, তা পরোক্ষভাবে কল্যাণধর্মী হতে বাধ্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'চিত্রাঙ্গদা'-নাট্য সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্যের কথা এই প্রসঙ্গে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। এখন 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রতিপাদ্য বিষয় কি? অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার কাহিনীর ভিতর দিয়ে তা সংক্ষেপে বলতে চেয়েছে যে, দেহের রূপভিত্তিক যে প্রেম তা কৃত্রিম এবং তাই তা অস্থায়ী হয়। আর চরিত্রগুণকে ভিত্তি ক'রে যে প্রেম জন্মলাভ করে তা স্থায়ী হয়। মদনের নিকট ভিক্ষা ক'রে পাওয়া দৈহিক রূপ নিয়ে কুরূপা চিত্রাঙ্গদা ছদ্মবেশে অর্জুনের মনকে মুগ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু সেই রূপভিত্তিক প্রেম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। শীঘ্রই অর্জুনের প্রেমে শিথিলতা এসেছিল, তাঁর মন অবসাদগ্রস্ত হয়েছিল। অপর পক্ষে চিত্রাঙ্গদার শৌর্য, প্রজাবাৎসল্য এবং সাহসিকতা অতি সহজেই তাঁর মনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। কুরূপ সত্ত্বেও এই প্রকৃত চিত্রাঙ্গদা তাঁর গুণের বলে অর্জুনের হৃদয়কে স্থায়ীভাবে জয় করতে পেরেছিল। এই ভাবে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে গ্রন্থখানির ওপর কি এমন দোষারোপ করা যায় যে, তা দুর্নীতি প্রচার করে? কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সংস্কারদুষ্ট মন তাঁকে নাট্যখানির সমগ্ররূপ দেখতে দেয় নি। যেহেতু তার কাহিনী তাঁর সংস্কারের সহিত সামঞ্জস্য রাখেনি, সেই হেতু তিনি তার ওপর বদ্ধমূল বিদ্বেষভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে দ্বিজেন্দ্রলালের মত গুণী সাহিত্যিকেরও সাহিত্যের রস গ্রহণের ক্ষমতা এক্ষেত্রে এমন ভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের মত অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরও এমন কঠিন, কঠোর ও হৃদয়হীন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এটি ক্ষোভের কারণ হতে পারে। তবে এই ভেবে আমরা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করতে পারি যে, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্য-শিল্পীর ভাগ্যে এমনটি ঘটে থাকে। অতীতেও

এমন ঘটেছিল, ভবিষ্যতেও এমন ঘটবে। এই প্রতিকূলতার বেষ্টনী খণ্ডন করবার ভার মূলত সাহিত্যিকের উপরেই পড়ে এবং যে পরিমাণে তাঁর রচনার স্বকীয় গুণ আছে সেই পরিমাণে তা খণ্ডন করা সহজ হয়।

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে

রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা গতিশীল; তার পরিবর্তন আছে। কবি স্বয়ং তার বিষয় অবহিত ছিলেন এবং বার বার স্বীয় কাব্যের ঋতু পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাব্য একটি স্রোতস্বিনীর ধারার মত। স্রোতস্বিনীর উৎপত্তি হয় গিরিগহ্বরে অবস্থিত কোনো গুহা হতে। তারপর তার যাত্রা সুরু হয় নানা ভূমিখণ্ডের মধ্য দিয়ে। এই যাত্রাপথে বিভিন্ন স্থানে পরিবেশ অনুসারে তার বিভিন্নরূপ। যেখানে তা পার্বত্য ভূমির মধ্যে প্রবাহিত, সেখানে তা খরস্রোতা ও চঞ্চলা, চড়াই হতে উতরায়ে যেতে কোথাও তা ঝরণার রূপ নেয়, কোথাও তা তীব্র স্রোতে উপলখণ্ডদের আঘাত হেনে প্রবহমান। যেখানে তা সমতল ভূমি দিয়ে বয়, সেখানে তা তুলনায় শান্ত মূর্তি ধরে। সেখানে তা ততখানি চঞ্চল নয়, যতখানি গভীর। তার আয়তন সেখানে প্রশস্তি লাভ করে, তার সমগ্র বক্ষ জুড়ে একটি প্রশান্তি বিরাজ করে।

রবীন্দ্র-কাব্যও এইরকম একটি স্রোতস্বিনীর ধারার মত। তা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। তার জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন সুর প্রাধান্য লাভ করেছে। তবু সকল অধ্যায় জড়িয়ে একটি মূল সুর বর্তমান, যেমন স্রোতস্বিনীর প্রবাহ সর্বত্র বর্তমান; তবে প্রবাহের ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়। রবীন্দ্র-কাব্যের সেই মূল সুর হল প্রীতি বা ভালবাসা। এই কাব্য-স্রোতস্বিনীর বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রীতির পাত্র পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু প্রীতিই সর্বত্র মূল অনুভূতি। কোথাও সে পাত্র প্রকৃতি, কোথাও ঈশ্বর, কোথাও বা বিশ্বমানব। এইভাবেই তাঁর কাব্য-স্রোতস্বিনী পাত্র হতে পাত্রান্তরে ধাবিত হয়ে তাঁর কাব্যজীবনের বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করেছে।

কবির সমগ্র কাব্যজীবন জুড়ে এইভাবে প্রেমাস্পদের পরিবর্তন হেতু যে বিভিন্ন অধ্যায় রচিত হয়েছে তাদের সবগুলির সঙ্গে বর্তমান প্রসঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন হবে না! আমাদের প্রাথমিক আলোচনা সম্পর্কে তার প্রথম দিকের দু'একটি অধ্যায়ের সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন হবে।

কবির কাব্যজীবনের প্রথম অংশে প্রেমাস্পদের পরিবর্তন হেতু দুটি মূল অধ্যায় সূচিত হয়। এই দুটি অধ্যায় তাঁর শৈশব হতে মধ্যবয়স পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত

ক'রে বিরাজমান ছিল। প্রথম অধ্যায়ে যা ছিল মূল প্রেরণা, তা হল প্রকৃতির সহিত কবির মিলন। এই অধ্যায়ে প্রকৃতিই তাঁর প্রীতির পাত্র এবং প্রধানত কবিতার বিষয়-বস্তু। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায় প্রীতির পাত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। সে অধ্যায়ে প্রেমাস্পদ আর প্রকৃতি নয়, তার স্থান নিয়েছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং মিলনের আনন্দই এখানে কাব্যের প্রেরণা। এ অধ্যায়ে যিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি, তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন ভক্ত কবিতে। প্রেমাস্পদের বিভিন্নতা হেতু এই দুই অধ্যায়ের মূল সুর বিভিন্ন। এই যে অধ্যায়ের পরিবর্তন ঘটেছে, তা ব'লে আকস্মিকভাবে হঠাৎ তা সংঘটিত হয়নি। তাদের মধ্যে একটি অপরটির কারণ, একটি যোগসূত্র উভয়কে সংযুক্ত করেছে। প্রথম অধ্যায়টি যেন তাঁর কাব্যজীবনকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। এই অধ্যায়-দুটির মধ্যে কোনো ছেদ নেই। তারা পরস্পর সংবদ্ধ এবং সংযুক্ত।

সেটি কেমন ক'রে সম্ভব হল তা বুঝতে হলে রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন সুরু হয় একরকম বাল্যাবস্থা অতিক্রম করবার পূর্ব হতেই। তাঁর প্রথম কাব্যপুস্তক 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স সতেরো বৎসর। তার অব্যবহিত পরে 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড' প্রভৃতি কাব্য-পুস্তক লিখিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে তাঁর কাব্য-জীবনের প্রস্তুতিপর্বের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। হাতের লেখা পাকাতে যেমন এক অবস্থায় শিক্ষার্থীর কপি বুকে লেখা অভ্যাস করতে হয় এও তেমনি। এখানে লেখা অপরিণত, তবে তার সার্থকতাও আছে এই হিসাবে যে তা তাঁর লেখনীকে শক্তিমান করেছে। সেই কারণে তাকে তিনি কপিবুকের যুগ নাম দিয়েছেন। কবিতা হিসাবে তাদের মূল্য নেই, কারণ তারা অপটু হস্তের রচনা, কিন্তু কাব্য-জীবনে তাদের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে কাব্যগ্রন্থকে তাঁর নিজস্ব রচনার প্রথম পরিচায়ক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তা হল 'সন্ধ্যাসংগীত'। এই গ্রন্থের রচনায় তাঁর মৌলিকতা সুস্পষ্ট। সেই কারণে তা বঙ্কিমচন্দ্রের বিচক্ষণ দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। সেইজন্য এই কাব্যের রচয়িতার মধ্যে বিরাট ভাবী সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখে তিনি তাঁকে রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহসভায় অভিনন্দিত করেছিলেন। সে গল্পের 'জীবনস্মৃতি'-তে উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের কবিতাকে আমের গুটির

সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব কাব্যবৃক্ষে শুধু ফুল ধরেনি, ফল ধরতেও সুরু করেছে।

তবু এই কবিতাগুলি তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। এই রচনাগুলির মধ্যে একটি অবসাদের ভাব বেশ সুস্পষ্ট। তার কারণ তিনি নিজেই বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ধারণায় তাঁর সাহিত্য-জীবনের এই পর্বে এক দিকে অবশ্য তাঁর রচনাশক্তি বল সঞ্চয় করেছে, কিন্তু অপর দিকে তাঁর প্রকৃতির সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রকৃতিকে ভালবেসেছিলেন শিশুকাল হতে। তাঁর শৈশবে ঠাকুরবাড়ির সহিত প্রকৃতির সংযোগ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। তার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ঘেঁষে একটি পুকুর ছিল। তার পূর্ব পাড়ে কিছু নারিকেল গাছ ছিল। তারই এক পাশে একটি চীনে বট গাছ ছিল। উত্তর ঘেঁষে ঠাকুরবাড়ির পূর্ব প্রান্তে একটি উদ্যানও ছিল। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রকৃতির যেটুকু রূপ, যেটুকু শোভা ফুটে উঠত তাই তাঁকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত। ভোর হলেই সেখানে একবার ঘুরে আসবার জন্য তিনি অস্থির হতেন। পুকুরে বৃষ্টির জল পড়লে তাঁর হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠত। শৈশবে প্রকৃতির লীলামাধুর্য তাঁকে এমন মুগ্ধ করেছিল বলেই তাঁর 'বর্ণপরিচয়' পড়া সহজ হয়েছিল। অক্ষরজ্ঞান করতে গিয়ে বিভিন্ন অক্ষরের বিভিন্ন রূপ এবং সংযুক্ত অক্ষরের ভিন্ন রূপ ধারণ ব্যাপারটা তাঁর কাছে একান্তই নীরস ঠেকত। কিন্তু যখন তিনি অক্ষরপরিচয় করতে গিয়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই কাব্যবদ্ধ পদটি পড়লেন, তখন বুঝলেন অক্ষরজ্ঞান অর্জনে সার্থকতা আছে। প্রকৃতির প্রতি নিগূঢ় ভালবাসাই তাঁর 'বর্ণপরিচয়'-এর মত নীরস পুস্তকপাঠ সহজ করেছিল।

কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর যুগে যখন তিনি কাব্যশক্তি অর্জন করলেন, তিনি আবিষ্কার করলেন যে তিনি প্রকৃতি হতে সরে এসেছেন, প্রকৃতির সহিত তাঁর সংযোগ ছিন্ন হয়েছে। ফলে তাঁর মন নিজের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ল। এই পরিবেশে নিজের মনগড়া বিষয়কে কল্পনায় রঞ্জিত ক'রে তিনি কবিতা রচনা করলেন। সেই কারণে তাদের ওপর একটি বিষাদের মলিন ছায়া পড়েছে। এই অবস্থাটির বর্ণনা কবি নিজেই এই সময়ে রচিত একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। তার সম্পর্কিত স্তবকটি এই :

তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস!

তুই শুধু ওরে করিস রোদন,
ফেলিস দুখের শ্বাস !
ভূমিতে পড়িয়া আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত
আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
সোহাগ করিস কত !

(প্রভাতসংগীত)

এই বহির্জগত হতে বিচ্ছিন্ন, আপনার কল্পনায় আপনি বদ্ধ থাকার দুর্বিষহ জীবন হতে তাঁর মুক্তিলাভ হয় একটি দিব্যদৃষ্টির ফলে। সেই দিব্যদৃষ্টিই হল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নামে বিখ্যাত কবিতাখানির প্রেরণা। তখন তিনি কলিকাতায় যাদুঘরের কাছে সদর ষ্ট্রীটে তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত বাস করতেন। একদিন প্রত্যুষে ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের বৃক্ষশ্রেণীর মাঝখানে প্রাতঃসূর্যের উদ্ভাসিত রূপখানি তাঁর অন্তর ভেদ করে প্রবেশ করল। তখন তাঁর মনে হল তাঁর সামনে হতে যেন একটা পর্দা সরে গেল এবং প্রকৃতির সুন্দর রূপখানি তাঁর নয়নে ধরা দিল। সুতরাং 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ যা বর্ণিত হয়েছে তা তাঁর কাব্যচেতনারই স্বপ্নভঙ্গ। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর যুগে নিজের কল্পনার মধ্যে তিনি যে স্বপ্নরাজ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন প্রভাত-রবির কিরণের স্পর্শ তাঁর সে স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিল। তাঁর অন্তর্মুখী কাব্যচেতনাকে বহির্মুখী ক'রে দিয়েছিল। ফলে প্রকৃতির সহিত তাঁর সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই কারণে কারাগারের বদ্ধ পরিবেশ ভেদ ক'রে তিনি বাহিরে এসেছিলেন। তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল 'কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া' প্রকৃতির গান গাইবার।

দেখতে গেলে এইভাবে 'প্রভাতসংগীত'-এই তাঁর কাব্য-স্রোতস্বিনীর প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়েছিল। তার পূর্বে যা কিছু ঘটেছে সবই প্রস্তুতিপর্বের অন্তর্ভুক্ত। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবি যেন নিজের কাব্যজীবন সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। নিজের অন্তরের বদ্ধপরিবেশ হতে মুক্তি লাভ ক'রে যখন তিনি বহির্জগতের সহিত নূতন ক'রে মিলিত হলেন, তাঁর কাব্য-স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হল পরিণতি ও সার্থকতার পথে। এই শুভ যাত্রাপথে প্রথম পরিচয় প্রকৃতির সঙ্গে। তার কত রূপ, কত বৈচিত্র্য, কত রঙের বাহার। তার সংস্পর্শে কবির লেখনীতে ছন্দে ভাষায় মনোহর, কত কবিতা আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সকল কবিতায় শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মনোরম বর্ণনা পাই না। তার অতিরিক্তও

কিছু পাই। সেই সৌন্দর্যের বিকাশ তাঁকে আনমনা করেছে, এক অব্যক্ত শক্তির প্রচ্ছন্ন উপস্থিতির কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ফলে সেই সর্বব্যাপী সত্তার সহিত মিলনের একটি আকুতিও মনে মনে তিনি অনুভব করেছেন।

পরে সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির রূপটি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে এসেছে। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে তার অপ্রকট ব্যাপ্তি তিনি অনুভব করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু যেন ধেনু, আর তাদের চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি। তিনি কোন্ অন্তরালে বসে তাঁর বেণু বাজান, তাই তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায় সেই বাঁশীর ধ্বনি শুনে। এই ভাবেই কবির মন ধীরে ধীরে বিভিন্ন উপলব্ধির ভিতর দিয়ে প্রকৃতি হতে সেই অদৃশ্য রাখালের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ফলে যিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি, তিনি হয়েছেন ভক্ত কবি, ঈশ্বরের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব।

তাঁর কাব্যজীবনের এই দুই অধ্যায়ের মাঝখানে কোথাও কোনো ছেদ নেই, যেখানে বলা যায় একটির শেষ এবং অপরটির সূত্রপাত হয়েছে। এখানে একটি যেন অপরে রূপান্তরিত হয়েছে। রাত্রি ও দিবসের সন্ধিক্ষণে যেমন আঁধার ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে এবং অবশেষে আলোকোজ্জ্বল উষায় পরিণত হয়, এও তেমনি। একটি যেন অপরটির মধ্যে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেছে।

এই কথাটি ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম করতে দু-একটি উদাহরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রকৃতির কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কবিতা লিখেছেন, তাতে প্রকৃতির মধ্যে যা সুন্দর, যা মনোরম, যা হৃদয়কে স্পর্শ করে তার অনবদ্য ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বর্ণনা ত পাই, তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে তার অতিরিক্তও কিছু পাই। প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত বিকাশ দেখেছেন বা যে মাধুর্যমণ্ডিত প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছেন, তার সঙ্গে আরও অনুভব করেছেন এক প্রচ্ছন্ন শক্তির উপস্থিতি, যার রূপ তাঁর কাছে প্রথমে ঠিক স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। একটি কাব্যাংশ ধরা যাক :

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা॥

(গীতাঞ্জলি)

শরতের এই সুন্দর বর্ণনায় ধরণীর বক্ষে এবং আকাশের গায়ে প্রাণ-চাঞ্চল্যের পরিচয় আছে। ধানের ক্ষেতে শস্যের শিরোভাগ যেমন বায়ুবেগে আন্দোলিত হচ্ছে, আকাশের গায়ে তেমন বায়ু ভর ক'রে শরতের সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। কবির মন এই প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে একটি অতিরিক্ত জিনিষ আবিষ্কার করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে তার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন শক্তি ক্রিয়া করছেন এবং তাঁকে জানবার জন্য তিনি কৌতূহলী হয়েছেন। তাই প্রশ্ন তুলেছেন, নীল আকাশে কে সাদা মেঘের ভেলা ভাসালেন?

তাঁর মন এই পথে গিয়ে শেষে এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছে যে জলে স্থলে, আকাশে ভূধরে, এই যে প্রকৃতির লীলাচাঞ্চল্য, তাদের সকলকে পরিব্যাপ্ত ক'রে এক প্রচ্ছন্ন শক্তি বিরাজ করছেন যিনি তাঁর সঙ্গে মিতালি করতে প্রস্তুত। তাঁর এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নীচের উদ্ধৃতির মধ্যে তিনি এই মন্তব্য করেছেন :

"না-ঝরা বৃষ্টির ভারে অবনমিত মেঘের পুঞ্জের বিস্ময়, হঠাৎ ঝড়ের ঝাপ্টায় নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর দেহে প্রবল আন্দোলন, প্রখর বৈশাখের মধ্যাহ্নের নিদারুণ নিঃসঙ্গতা, শরতের প্রাতে কুয়াসার পর্দার আড়ালে নীরব সূর্যোদয়—এরা আমার মনকে একটি সর্বব্যাপী সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করেছে।"

(রিলিজিয়ান অফ্ ম্যান)

এই উপলব্ধির ফলেই যিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি, তিনি ভক্ত কবিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই দেখি রবীন্দ্র-কাব্য-স্রোতস্বিনী তাঁর মধ্যজীবনে প্রকৃতির রাজ্য ত্যাগ ক'রে ভক্তির রাজ্যে প্রবাহিত হয়েছে। প্রথমে প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে বিশ্বদেবকে কবি আবিষ্কার করেছেন, এখানে তাঁকে তিনি হৃদয়ে স্থাপন ক'রে 'জীবনদেবতা' পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, তাঁর সহিত একক মিলনের সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। তাই রবীন্দ্র-কাব্যের সমগ্র মধ্যযুগকে পরিব্যাপ্ত ক'রে ত্রিভুবনেশ্বরের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সূত্রে বিরহ-মিলনের মাধুরী হয়েছে মূল প্রেরণা। এই যুগের কাব্যমালঞ্চে যত ফুল ফুটেছিল 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র সঙ্গীতে তা স্থান পেয়েছে। তাদের মূল সুর হল, সীমার মাঝে অসীমের মিলনের সুর।

তাঁর কাব্যজীবনে এই ভাবে যিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি, তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন ভক্ত কবিতে। কিন্তু এই রূপান্তরটি ঘটেছে ধীরে ধীরে। দুটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কোনো ছেদ নেই। একটি অন্যতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবু দেখা যায় এই দুই অধ্যায়ের মাঝখানে কিছু কালের জন্য ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে আর

একটি ছোট অধ্যায় কবির কাব্যজীবনে রচিত হয়েছিল। সে অধ্যায়টিকে প্রেমের অধ্যায় বলা চলে। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে. সে অধ্যায়টির সূত্রপাত হয়েছিল কবির মৃণালিনী দেবীর সহিত বিবাহের সঙ্গে এবং শেষ হয়েছিল তাঁর অকাল মৃত্যুর সঙ্গে। তাঁদের বিবাহ হয় ইংরাজি ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এবং কবিপত্নীর মৃত্যু হয় ২৩শে নভেম্বর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। এই উনিশ বৎসরব্যাপী বিবাহিত জীবনের মধ্যেই এই প্রেমের অধ্যায়টি সীমাবদ্ধ। সুতরাং এটি অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এটি দাম্পত্য-প্রেম। দাম্পত্য-জীবনে যে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার ছন্দমণ্ডিত দিনগুলি কেটেছে, তারাই এই অধ্যায়ের কবিতাগুলির প্রেরণা। তাদের প্রথম আবির্ভাব 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে। তার প্রকাশ তারিখ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের বিবাহের অল্পকাল পরেই। তাদের শেষ আবির্ভাব 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থে, যা কবিপত্নীর মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থখানি স্পষ্টতই মৃণালিনী দেবীকে উদ্দেশ ক'রে লেখা। গ্রন্থের প্রারম্ভে বাংলা পঞ্জিকার মৃত্যু দিন সেখানে উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট একটি কবিতার প্রথম লাইনটি হল এই :

'প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার'

এর থেকে যেন মনে হয় দাম্পত্য-জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তাঁর কাব্য জীবনের প্রেমের অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল এবং তার পরিসমাপ্তি কবিপত্নীর মৃত্যুর সঙ্গে ঘটেছিল। সুতরাং তার ব্যাপ্তি তাঁদের দাম্পত্য-জীবনকে জুড়ে।

এই অল্পকাল স্থায়ী প্রেমের অধ্যায়টি যেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের দুটি মূল অধ্যায়ের মাঝখানে একটি পর্দার মত দাঁড়িয়ে ছিল। সেই অধ্যায়-দুটির প্রথমটি হল প্রকৃতি-সম্পর্কিত কাব্যের এবং দ্বিতীয়টি হল ঈশ্বর-সম্পর্কিত কাব্যের। প্রকৃতির কবি ও ভক্ত কবির মধ্যেখানে একটি প্রেমের কবির অধ্যায় যেন অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে কবিপত্নীর আকস্মিক অকাল-মৃত্যুর ফলে তার ওপর হঠাৎ ছেদ পড়ে গিয়েছিল। সম্ভবত সেই অকাল-সমাপ্তির ফলে ভক্ত কবির আবির্ভাব ত্বরান্বিত হয়েছিল। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় হল এই মধ্যবর্তী কালীন প্রেমের অধ্যায়টি।

কবির কাব্য-স্রোতস্বিনীর এই প্রেমের অধ্যায়ের গতি বড় বিচিত্র পথে। তাতে যেমন প্রথম মিলনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস পাই তেমন প্রতিক্রিয়ার ফলে অবসাদের প্রমাণ পাই। তারপর প্রথম মিলনের মোহ অপসারিত হলে একটি ভুল বোঝাবুঝির পালাও পাই। দুজনে পরস্পরের কাছে যা চেয়েছেন তা পান

নি, এই ধরণের একটি অনুযোগের সুর তাতে রণিত। তারপর সেই স্থায়ী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি-ভিত্তিক প্রেমের সাক্ষাৎ হয় যা সংসারের নানা কাজে ব্যাপৃত কল্যাণী রূপিণী নারীর গলায় বরমাল্য দিয়েছে। এই হল সেই দুর্লভ প্রেম যার, ভবভূতির মতে, বার্ধক্যেও রসহানি হয় না।

তারপর পাই হঠাৎ-মৃত্যুর আঘাতের মর্মস্পর্শিতা। কিন্তু আমাদের কবি ত সাধারণ কবি নয়, তিনি অনন্যসাধারণ। তাই পরিণতিতে দুঃখের আঘাতে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া অনন্যসাধারণ রূপ নিয়েছে। তিনি দুঃখের অশ্রুসাগরে জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছেন নূতন লোকের সন্ধানে। সেই অভিযান পরিশেষে তাঁর জীবনে ভক্ত কবির অধ্যায়ের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করেছে। ফলে প্রেয়সীর সহিত বিরহ-মিলনের বিচিত্র ইতিহাসখানি নূতন আলোকে তাঁর কাছে নূতন রূপে ধরা পড়েছে। যে পরম-এক, আনন্দে উৎসুক হয়ে আপনাকে দুই ক'রে সুখলাভ করছেন তাঁদের এই যুগ্মজীবনে, কবির উপলব্ধিমতে, তারই কিছু পরিচয় তিনি লাভ করেছেন।

'কড়ি ও কোমল' ও 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থ-দুখানির কবিতাগুলির মধ্যে ব্যবধান উনিশ বছরের মত। এই উনিশ বছরে যে-কয়খানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তাতে এই প্রেমের কাব্যকাহিনীর বিচিত্র প্রকাশের পথটি চিহ্নিত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে এই প্রেমই ছিল অনেকগুলি কবিতার প্রেরণা। 'মানসী', 'চিত্রা' ও 'ক্ষণিকা' এই তালিকায় পড়ে। তাদের অবলম্বন ক'রে যুগলহৃদয়ের যে প্রেমখানি বিকাশলাভ করেছে, বিভিন্ন অবস্থায় তার মধ্যে বিভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়েছে। কোথাও পাই প্রথম অনুরাগের ভাবময় উচ্ছ্বাস। সেখানে দৈহিক সৌন্দর্যের আবেদন ও মাদকতা বিশেষ রকম প্রকট। কোথাও পাই অবসাদের মলিনতা। তখন দেখা দেয় মান, অভিমান এবং ভুল বোঝাবুঝির পালা। এই বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়ে শেষে দেখি এই প্রেম পরিণত আকারে একটি শান্ত সমাহিত রূপ ধারণ করেছে, যেখানে প্রেয়সীর কল্যাণময়ী মূর্তিখানিই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর হঠাৎ মৃত্যু এসে আচম্বিতে প্রেয়সীকে সরিয়ে নিয়ে দুর্বার অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়েছে কবির দু-নয়নে। এই হল সংক্ষেপে এই কাব্যকাহিনীর ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের অধ্যায়ের পূর্বে তার একটি ক্ষুদ্র প্রস্তুতিপর্বেরও পরিচয় আমরা আভাসে পাই। 'কড়ি ও কোমল'-এর পূর্বে রচিত 'ছবি ও গানে' তার প্রথম পরিচয় মেলে। বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন অনুরাগ ও মান-অভিমানের

পালার পূর্বে একটি পূর্বরাগের অবস্থা আছে, এটি অনেকখানি তার মত। তবে তার সঙ্গে কিছু পার্থক্যও আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্বরাগের যিনি কেন্দ্র, অর্থাৎ যিনি নায়িকা, তিনি পরিচিত ব্যক্তি। কিন্তু এই কাব্যকাহিনীতে যাঁর সহিত মিলনের জন্য প্রস্তুতিপর্ব বিরচিত হয়েছে সেই অবস্থায় তাঁর পরিচয় তখনও মেলেনি। সে অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছেন। এখানে কাব্য যাঁর উদ্দেশে রচিত, তিনি অজ্ঞাত-পরিচয় ভাবী জীবন-সঙ্গিনী।

সুতরাং রবীন্দ্র কাব্যের এই প্রেমের অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি সুর পাই। তারা সংক্ষেপে এই :

প্রথম—প্রস্তুতিপর্ব। এখানে প্রধান সুর অজ্ঞাত জীবন-সঙ্গিনীর সহিত মিলনের আকুতি।

দ্বিতীয়—প্রথম মিলনের উচ্ছ্বাস। তা দেহভিত্তিক, তা-বলে লালসা-মলিন নয়।

তৃতীয়—প্রথম মিলনের পর অবসাদের কালিমা এবং মান-অভিমান ও ভুল-বোঝাবুঝির পালা।

চতুর্থ—সময়ের অতিবাহনের ফলে প্রেম পরিণত আকার লাভ করেছে। এখানে প্রেয়সী, কল্যাণী গৃহিণীরূপে মহিমান্বিতা।

পঞ্চম—এখানে অকস্মাৎ মৃত্যু এসে প্রিয়াকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল এবং প্রেমের অধ্যায়ের উপর নির্মম হস্তে যবনিকা টেনে দিল।

আমরা এই পাঁচটি অঙ্কে বিকশিত প্রণয়ের অধ্যায়টির এখন একটু বিস্তারিত আলোচনা করবার প্রস্তাব করি। প্রথমে প্রস্তুতিপর্ব দিয়ে সুরু হক।

এই পর্বে প্রথমে দেখা যায় একটা নিঃসঙ্গতার ভাব কবির মনকে অবসাদগ্রস্ত করেছে। প্রকৃতির পরিবেশ এমন যা নিঃসঙ্গতাকে দুঃসহ ক'রে তোলে। তাই একাকিত্ব খণ্ডন করতে মনে হয় কেউ সঙ্গী হিসাবে কাছে থাকলে বেশ হত। এই মনোভাবের দৃষ্টান্ত হিসাবে নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে :

একেলা ঘরে বসে আছি, কেউ নেই কাছে,
সারা দিন মেঘ করে আছে।
সারাদিন বাদল হল,
সারাদিন বৃষ্টি পড়ে,
সারাদিন বইছে বাদল-বায় !

(ছবি ও গান, বাদল)

পরের অবস্থায় নিঃসঙ্গতার আক্ষেপ দিয়ে কবির মন ভরেনি; তিনি তখন সঙ্গিনীকে পাবার জন্য আকুল হয়েছেন। অভাবে আক্ষেপের স্থান নিয়েছে পাবার আকুতি। প্রকৃতির পরিবেশ মধুর হলে তাঁর মন এখন এক উপযুক্ত সঙ্গিনীর অভাব তীব্ররূপে অনুভব করে:

আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে,
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়॥

* *

আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!

(কড়ি ও কোমল, আকাঙ্ক্ষা)

এখানে যা পাই তা ঠিক পূর্বরাগ নয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের বর্ণনায় যাঁর জন্য পূর্বরাগ, তিনি পরিচিত ব্যক্তি। এখানে হৃদয়াসনে শূন্যতার উপলব্ধি হয়েছে, তাকে পূর্ণ করবার আকাঙ্ক্ষাও মনে জেগেছে, কিন্তু কাকে স্থাপন ক'রে পূর্ণ করবেন নায়ক এখনও জানেন না। এক অজানা অনির্দিষ্ট সঙ্গিনীর উদ্দেশ্যেই এই আকুলতা নিবেদিত হয়েছে।

ক্রমশ সে আকুলতা তীব্র হয়ে উঠেছে। কবি এক সময় ভাবেন শুধু আকুলতা নিবেদন ক'রে সেই অজ্ঞাতপরিচয় ভাবী সঙ্গিনীর আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকবেন না, তাঁকে খুঁজতে তিনি বেরিয়ে পড়বেন। সে ইচ্ছাটি তিনি এইভাবে প্রকাশ করেছেন:

সাধ যায় বাঁশি করে বন হতে বনান্তরে
চলে যাই আপনার মনে,
কুসুমিত নদীতীরে বেড়াইব ফিরে ফিরে
কে জানে কাহার অন্বেষণে।

(ছবি ও গান, মধ্যাহ্নে)

আবার কখনো জীবন-সঙ্গিনীর অভাববোধ তাঁর মনকে ভীষণ অবসাদগ্রস্ত করে। তাঁর বাসনা অপূর্ণ থেকে যায় বলে তিনি একান্ত হতাশ হয়ে পড়েন। তার একটি সুন্দর করুণ ছবি নীচের কটি লাইনে ফুটে উঠেছে। অজানা জীবন-সঙ্গিনী যেন তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে দর্শন না দিয়ে হতাশ

করেছেন :

এই বাঁশি-স্বর তার আসে বার বার
সেই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয় আসন শূন্য যে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।

(কড়ি ও কোমল, বিরহ)

এমন সময় কবির জীবনে সেই অজানা সঙ্গিনী আবির্ভাব হলেন। কবির সহিত মৃণালিনী দেবীর বিবাহ সম্পাদিত হল ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। তার তিন বছরের মধ্যেই 'কড়ি ও কোমল' কবিতা-পুস্তকখানি প্রকাশিত হল। মনে হয় এই কাব্যসংকলনের মধ্যে কিছু কবিতা মিলনের পূর্বের কথা বলে এবং কিছু কবিতা মিলনের পরের কথা বলে। যা পূর্বের কথা বলে মনে হয়েছে তার কিছু উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। যা মিলনের পরে লেখা হয়েছে তাতে প্রেমিক-যুগলের নূতন মিলনের উন্মাদনার ছাপ সুস্পষ্ট।

এই কবিতাগুলির মধ্যেই দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে মনে হয়। এখানে তাই প্রথম মিলনের উদ্দাম উচ্ছ্বাস। তা দেহভিত্তিক। প্রিয়ার তনুখানি যেন কবির চোখে অপার বিস্ময়ের আধার। তার প্রতি অঙ্গটি সুন্দর, তার প্রতি অঙ্গটি মনোহর, প্রতি অঙ্গটি কবির হৃদয়কে আলোড়িত করে। প্রিয়ার রাঙা চরণ-দুটিতে বসন্তের স্মৃতি জড়ান, শত লক্ষ কুসুমের স্পর্শ বুলানো, এমনই তা কোমল :

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়—
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শত লক্ষ কুসুমের পরশস্বপন।

(কড়ি ও কোমল, চরণ)

প্রিয়ার প্রতি অঙ্গ ঘিরে কি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বিকাশ, কত বিস্ময়! প্রিয়ার বাহু ত বাহু নয়, তা প্রণয়ের ডোর। প্রিয়ার স্তন ত স্তন নয়, তা হৃদয়ের অভ্যন্তরে গোপনে লালিত প্রেম, বাহিরে এসে লজ্জায় অধোমুখী হয়েছে। প্রিয়ার চুম্বন ত ঠিক চুম্বন নয়, প্রেমের তরঙ্গ দেহের প্রান্তে এসে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ভেঙে পড়েছে।

এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এই কবিতাগুলির বর্ণনীয় বিষয় হল দেহভিত্তিক প্রেম। প্রেয়সীর নানা অঙ্গের চিত্তহারী বর্ণনা এখানে আছে।

তাদের সব থেকে বড় গুণ হল যে তা-সত্বেও বর্ণনাগুলি সম্পূর্ণ লালসামুক্ত এবং সেই কারণেই অশ্লীলতা-দোষ-স্পৃষ্ট হয় নি। অথচ বিষয়গুলি এমন যে সাধারণ বর্ণনাকে লালসাসিক্ত করবার সম্ভাবনা থাকে। এখানে সেটি না ঘটবার কারণ হল কবির স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। কবি এখানে প্রেয়সীর দেহকে লোভীর মন দিয়ে দেখেন নি, দেখেছেন প্রেমিকের মন দিয়ে। তাই তাতে ফুটে উঠেছে অন্তহীন মমতাবোধ। তিনি সে দেহকে দেখেছেন সৌন্দর্যের পূজারীর নয়ন দিয়ে, তাই তার সুন্দর বস্তু-রূপে নন্দন করবার শক্তিটি প্রকট হয়েছে, দৈহিক কামনাকে প্রাধান্য দেয় নি। তা আকর্ষণ করেছে প্রেমকে এবং সৌন্দর্যবোধকে, লালসাকে নয়।

উপরে দুখানি চরণ সম্পর্কে যে স্তবকটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাই বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক না কেন। চরণ দুখানির কোমলত্ব প্রকট করে কবির মমতাবোধ। তাদের সৌন্দর্য কবির মনে শত কুসুমের স্বপ্নের মাধুর্যের স্মৃতি উদ্রেক করে, তা শত বসন্তের স্মৃতি একসঙ্গে জাগায়, সৌন্দর্যে তা এমনি অতুলনীয়। মহৎ সাহিত্যের গুণই হল তাই। তা দেহ হতে মনকে দেহাতীতে নিয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। সেখানে তিনি ঠিক এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন যে লোভকে সংযত ক'রে প্রেমের নয়নে দেহকে দেখাতে পারলে, তা লালসা জাগায় না, নন্দিত করে। তাঁর মন্তব্যটি নীচে উদ্ধৃত করা হল :

"মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্য-প্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, আত্ম পরিচয়)

এই দৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই কবির নয়নে প্রেয়সীর দেহ ত দেহ নয়, তা যেন থরে থরে সাজান ফুলে-ভরা লতা। তার রূপমাধুর্যই তার বিশেষ আকর্ষণ :

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী
শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।

(কড়ি ও কোমল, তনু)

সকল মহৎ সাহিত্যই অনুরূপ-ধর্মী হয়ে থাকে। প্রেমের নয়নে দেখলে দেহ আর দেহ থাকেনা, তা পুষ্পভূষিত লতার রূপ নেয়। প্রেমিক তখন শিল্পীর দৃষ্টি পায়। তাই কালিদাসের রচনায়ও অনুরূপ বর্ণনা দেখি। কথের আশ্রমে আশ্রমতরুগুলির আলবাল-পূরণে নিযুক্ত শকুন্তলা দুষ্মন্তের চোখে ঠিক এমনি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর দেহকান্তির তিনি এই বর্ণনা দিয়েছেন :

অধরে তাহার কিশলয় রাগ,
কোমল বিটপ যেন বাহুপাশ,
প্রতি অঙ্গ ঘেরি যৌবন-মাধুরী
কুসুমের রূপে হয়েছে প্রকাশ !*

তা-সত্ত্বেও প্রথম মিলনের উচ্ছ্বাসের পর একটি অবসাদ আসে। প্রতিক্রিয়া হিসাবে তা অবশ্যম্ভাবী, আদর্শ প্রণয়িযুগলের মিলনও তাকে প্রতিরোধ করতে পারে না। সুতরাং বাহু কোমল বিটপের মত মনে হলেও তা পাশের মতই অসহনীয় হয়ে ওঠে। চুম্বনমদিরার মাদকতা সত্ত্বেও তার ওপর বিতৃষ্ণা আসে। অঙ্গে অঙ্গে কুসুমের বিকাশ ঘটলেও দেহ কারাগারের মত ঠেকে। তখন প্রেমিক এ মিলনকে পরিহার করতে চায়। নীচের কাব্যাংশটির এই ধরণের অনুভূতি হল প্রেরণা :

দাও খুলে দাও, সখি, ওই বাহুপাশ।
চুম্বনমদিরা আর করায়োনা পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।

(কড়ি ও কোমল, বন্দী)

মন এই ভাবে অবসাদে আক্রান্ত হলে প্রথম মিলনের উচ্ছ্বাসপূর্ণ মাধুর্য্য মোহ বলে মনে হয়। তার ওপর একটা অশ্রদ্ধা আসে। তা অস্থায়ী জিনিস, তা দুদিনে ফুরিয়ে যায়। কবির অবসাদগ্রস্ত মন তাই তার প্রতি প্রতিকূল উক্তি ক'রে এই বলে :

এ মোহ ক দিন থাকে ! এ মায়া মিলায়।
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।

---

* অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সংনদ্ধম্॥

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।

(কড়ি ও কোমল, মোহ)

এই নূতন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে এল ভুল বোঝাবুঝি ও মান-অভিমানের পালা। তার একটি কারণ হল, অবিচ্ছিন্ন ভোগের পর প্রতিক্রিয়া হিসাবে অবসাদের আবির্ভাব। কিন্তু সেটাই সমগ্র কারণ নয়। তার আরও একটা বড় কারণ আছে। তা হল প্রেমিকের মনের অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। তরুণ জীবনে প্রথম মিলনের সময় সংসার সম্বন্ধে প্রণয়িযুগলের বড় একটা অভিজ্ঞতা থাকে না। প্রথম প্রেমের মাদকতা তাদের নয়নে যে মায়া-অঞ্জন এঁকে দেয়, তাতে প্রেম সম্বন্ধে এবং পরস্পর সম্বন্ধে প্রণয়ী নানা অবাস্তব কল্পনাকে সত্য বলে গ্রহণ ক'রে বসে। উদাহরণ-স্বরূপ, প্রথম প্রণয়ের উচ্ছ্বাসভাবের স্থায়িত্ব তারা কামনা করে। কিন্তু তা ত হবার নয়। সংসারের অমোঘ নিয়ম অনুসারে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। অতি ভোজনে আসে অরুচি, অতি ভোগে আসে বিতৃষ্ণা। দৈহিক প্রণয়ের মাদকতা স্থায়ী হয় না। অথচ প্রণয়িযুগল ধরে নেয় তা স্থায়ী জিনিস। কাজেই তাদের আঘাত পেয়ে হতাশ হতে হয়। এই মোহ হতে মুক্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা আসে নিদারুণ আঘাতের বেদনার মধ্য দিয়ে।

কবির প্রেমকাব্যের ইতিহাসের এই পর্বের সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রেমের উচ্ছ্বাস যখন শিথিল হয়ে যায়, তখনও প্রেমিক তার কল্পনাবিলাস ত্যাগ করতে চায় না। ভুলটা না ভাঙলেই যেন ভাল হয়, তাই তাকে আরও কিছু দিন ঠেকিয়ে রাখতে চায়। তাই অবসাদের ছায়াপাত ঘটলেও প্রেমিক প্রেমাস্পদের কাছে আবার যায় দেখতে, মিলনে পুরাতন মাধুর্য আবার অনুভবে আসে কিনা। এই মনোভাব নিয়ে প্রেমিক বলছেন :

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,

সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে।

(মানসী, ভুলে)

কিন্তু ভুল ত ভাঙতে বাধ্য, তাকে ত ঠেকান যায় না। তা হতে প্রেমিকের অব্যাহতি নেই। কাজেই কঠিন আঘাত হেনে যা বাস্তব তা স্বপ্নবিলাসকে ভেঙে দেয়। সেই মোহভঙ্গের পর প্রেমিকের মনের অবস্থার করুণ ছবিটি সুন্দর ফুটে উঠেছে নীচের কবিতা-স্তবকের মধ্যে :

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া—
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশে
বাহুতে মোর।

(মানসী, ভুল ভাঙা)

প্রেমিকের মনের অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় তার জন্য আরও একটি কঠোর আঘাতের পথ প্রস্তুত ক'রে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রেমের আতিশয্য-হেতু প্রেমাস্পদের ওপর এমন অনেক গুণ আরোপ করা হয় যা তাঁর বাস্তবে নেই। এও আর এক ধরণের কল্পনাবিলাস, কাজেই এখানেও মোহ-খণ্ডন দারুণ আঘাত হেনে আসে। যিনি প্রেমাস্পদ তিনি মানবী, তিনি দোষ-গুণের মানুষ। তাঁর ওপর যা নেই এমন গুণ আরোপ করলে, সে ধারণার সহিত সংগতি রক্ষা করে এমন আচরণ প্রেমিক তাঁর কাছে আশা করেন। কিন্তু যখন তিনি তা পান না সেটা তাঁর নিদারুণ দুঃখের কারণ হয়। আমরা দেখতে পাই যে কবির কাব্যের ইতিহাসে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। প্রেমাস্পদের ওপর দেবীত্ব আরোপ ক'রে তিনি কল্পনা করে-ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ শুধু পাবার, দেবার নয়। কারণ, যিনি দেবতা তাঁর ত কোনো অভাবই থাকতে পারে না। প্রেমাস্পদও যে তাঁরই মত মানুষ, তিনিও যে প্রেমিকের কাছে পেতে চান, সে কথা প্রেমিক ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ

যে শুধু পাওয়া নয়, এ যে দেওয়া-নেওয়ার খেলা। কাজেই ভুল ভাঙতে দেরী হয় না। প্রেমিক দেখেন যে দেবী জ্ঞান ক'রে যাঁর কাছে তিনি ভিক্ষার্থী হয়েছিলেন তিনিও যে নিজেও ভিক্ষার্থী। তখন তাঁর দুঃখের অবধি থাকে না। নিচের কাব্যাংশে মোহ-খণ্ডনের সেই আঘাতের মর্মস্পর্শী রূপটি সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে :

আমি চাই তোমারে যেমন
তুমি চাও তেমনি আমারে।
কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে,
তুমি এসে বসে আছ আমার দুয়ারে।
সৌন্দর্যসম্পদ-মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা!
ভিক্ষা, ভিক্ষা সব ঠাঁই—তবে আর কোথা যাই
ভিখারিনী হল যদি কমল-আসনা!

(মানসী, পুরুষের উক্তি)

এই ভুল বোঝাবুঝির পর্বের ফলে যেমন দুঃখ আছে তেমন একটা পুরস্কারও আছে। সেটা হল প্রথম-মিলন-হেতু-সঞ্জাত মোহ হতে মুক্তিলাভ। কল্পনাবিলাস-খণ্ডনে যে দুঃখ তা যেন এই মুক্তিরই মূল্য। ফলে যে মায়া-অঞ্জন নয়নে মেখে প্রেমিক যুগল পরস্পরকে দেখেছিলেন তা নয়ন হতে মুছে যায়। সহজ দর্শনে যে রূপটি দেখা যায় সেই রূপেই উভয়ে উভয়ের নয়নে ধরা পড়েন। আর তাকে ভিত্তি ক'রে যে প্রেম গড়ে ওঠে, তা হয় স্থায়ী জিনিস, কারণ তা বাস্তবধর্মী, তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। প্রেমিক তখন আবিষ্কার করেন প্রথম প্রেমের মায়াজাল সরে গিয়ে থাকলেও তার পরিবর্তে যা পাওয়া যায় তা কম মধুর নয়।

যিনি প্রেমাস্পদ তিনি দেবী নন, তিনি মানবী। কিন্তু মানবী হয়েও তাঁকে অবলম্বন ক'রে এমন কতকগুলি গুণ বিকাশ লাভ করে, যা কবির মনে শান্তি আনে, যা তাঁর প্রতি কবিকে শ্রদ্ধাবিষ্ট করে। তাঁর কল্যাণরূপ, তাঁর একনিষ্ঠ সেবা প্রেমিককে এক নূতন সাম্রাজ্যের অধীশ্বরপদে অধিষ্ঠিত করে। তা তখন প্রেমিকের হৃদয় হতে আকর্ষণ করে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ। কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হয়ে প্রেমিকের হৃদয় তখন বলে :

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর ; তব রাজটিকা

দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি।

(চিত্রা, প্রেমের অভিষেক)

তাঁর কল্যাণরূপের মাধুর্যের পরিপূর্ণ শোভা তখন তাঁর মায়া-অঞ্জনহীন নয়নেও ধরা পড়ে। প্রেমিক আবিষ্কার করেন প্রেয়সীর দেহের শোভা হতে এই চারিত্রিক শোভা কম হৃদয়গ্রাহী নয়। তিনি দুঃখ-দৈন্যে-ভরা মানবের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হতে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছেন, তাই তাঁর হাতে কঙ্কনবলয়। সীমন্তসীমায় সিন্দুরবিন্দু ত তাঁর মঙ্গলময় রূপের প্রতীক। এ প্রেম দেহভিত্তিক নয়, তাই স্থায়ী এবং অচঞ্চল ; তাই এতে মাদকতা নেই, আছে প্রশান্তি। প্রেয়সীর পরিণত প্রেমের এই রূপটি কবির চোখে সুন্দরতর ঠেকেছিল, তাই তাঁকে প্রশস্তি জানিয়েছিলেন সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ গানটি নিবেদন ক'রে :

বিরল তোমার ভবনখানি
পুষ্পকানন-মাঝে,
হে কল্যাণী, নিত্য আছ
আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি
আকুল হর্ষভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে ॥

(ক্ষণিকা, কল্যাণী)

পরিণতরূপের প্রেমের এই ছবিটি যে কবির হৃদয়কে মুগ্ধ করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রথম মিলনের উচ্ছ্বাসের পর যে ভুল-বোঝাবুঝির পালা এসেছিল, তার কারণ সে প্রেম দেহভিত্তিক, তার সর্বগ্রাসী মাদকতা প্রেমিক-যুগলকে পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। সে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জগতের প্রেমে দীর্ঘকাল স্থায়ী তৃপ্তি দেবার মত স্থায়ী সম্পদ থাকে না। তাই উন্মাদনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আসে অবসাদ এবং অতৃপ্তি। কিন্তু কালের অতিবাহন-হেতু এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির রঙীন কাচ যখন নয়নের সম্মুখ হতে অপসারিত হয় তখন নূতন ভিত্তিতে প্রেম রচনা হয়। সে প্রেম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেমাস্পদের সঙ্গে বোঝা-

পড়া তার মূল ভিত্তি। প্রেমাস্পদের কল্যাণরূপ এবং চরিত্রগুণ তার অবলম্বন। তাই তা স্থির এবং স্থায়ী। সাধে কি কবি তাঁর সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ গানটি এই পরিণত রূপের প্রেমের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন ?

এ প্রেম প্রাচীন ভারতের আর এক কবিরও বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তিনি হলেন কবি ভবভূতি। তিনি তাকে ভদ্র প্রেম বলে অভিহিত করেছেন। তা ভদ্র এই অর্থে যে, তা অকৃত্রিম। অর্থাৎ, তা কেবল চরিত্রগুণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে দেহভিত্তিক প্রেমের উন্মাদনা নেই বলেই তা স্থায়ী, তাই বার্ধক্যেও তার রসহানি হয় না। দীর্ঘকাল ধরে ঘনিষ্ঠভাবে নিকটে থেকে উভয়েরই দোষ-গুণ উভয়ের নিকট প্রকট হয়ে গেছে এবং পরস্পরের সম্বন্ধটি নিগূঢ় অহৈতুকী প্রীতিতে পরিণত হয়েছে। এ প্রেম সুখে-দুঃখে সমান, অবস্থার পরিবর্তন তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। তাই তা হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল। ভবভূতি বলেন যে, প্রেমের এমন মহিমা সেই কারণেই তা সংসারে সহজে মেলে না। যা মনোরম বস্তু, তা দুর্লভ। কবি ভবভূতির প্রশস্তিটির অনুবাদ নীচে দেওয়া হল :

সুখে-দুখে যার নাহি কোনো ভেদ
সকল দশায় সমান জানি,
হৃদয়ের যাহা বিশ্রাম-ভূমি
জরায় যাহার নাহি রস-হানি,
আবরণ ত্যজি পরিণতি লভি
শুধু স্নেহরূপে হয় যার স্থিতি,
ভাগ্যেতে মেলে কভু দেখা যার
তারে কহা যায় বিমলা-প্রীতি।

(ভবভূতি, উত্তররাম চরিত)*

কিন্তু হঠাৎ একদিন এই সোনার সংসার আকস্মিক ভাবে ভেঙে গেল। অকালে কবিপত্নী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। চিকিৎসক তাঁকে রোগমুক্ত করতে পারলেন না। কবিপত্নীর ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সনে) মৃত্যু হয়। কবির জীবনে সে দিন একান্ত দুঃখের বলে

* অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥

একান্ত স্মরণীয় হয়ে রইল। তাই প্রেয়সীর উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'স্মরণ' কোনো উৎসর্গ দ্বারা চিহ্নিত হয় নি, কেবল এই তারিখটি পুস্তকের প্রথমে উদ্ধৃত হয়েছে।

কবির প্রেম-কাব্যের ইতিহাসের এই শেষ অধ্যায়টি 'স্মরণে'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। প্রেয়সীর মৃত্যুর প্রথম আঘাত যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি প্রচণ্ড। সেই নিদারুণ শোকের মর্মস্পর্শিতার পরিচয় পাই নিচের কাব্যাংশে :

আজিকে আমার সব বাতায়ন
রয়েছে, রয়েছে খোলা।
বাধাহীন দিন পড়ে আছে আজ,
নাই কোনো আশা, নাই কোনো কাজ—
আপনা-আপনি দক্ষিণবায়ে
দুলিছে চিত্তদোলা।
শূন্য ঘরের সব বাতায়ন
আজিকে রয়েছে খোলা।

(স্মরণ)

কিন্তু এই নিদারুণ আঘাতের প্রতিক্রিয়া কবির হৃদয়ে স্বতন্ত্র, অনন্যসাধারণ রূপ নিল। প্রিয়ার জন্য বিলাপ স্থায়ী হল না, বা মৃত্যুর আঘাত সত্ত্বেও প্রবোধ-বাক্য দিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা করবার চেষ্টাও বিশেষ পরিলক্ষিত হল না। এ কবির মন গতিশীল। যা চলে গেছে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় না। তাই প্রতিক্রিয়ার রূপ গতানুগতিক পথে না গিয়ে ভিন্ন আকার ধারণ করল।

মৃত্যুর আঘাতে কবির চিত্তে দুঃখের জোয়ার এসেছে। তা বাধা মানে না, তা কবির নয়নে অশ্রুর বন্যা এনেছে। তাই বলে অশ্রুমোচন করেই কি দিন যাবে? কবির মন বলে, না। তা'বলে দুঃখে অবসাদগ্রস্ত হলে সে ত হল ঘুমিয়ে পড়ার সামিল। তা চলবে না, জাগতে হবে। জেগে নূতন কূলে ভিড়বার জন্য সাগরে পাড়ি দিতে হবে। তাই নিজেকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বলছেন :

জাগো রে, জাগো রে চিত্ত, জাগো রে।
জোয়ার এসেছে অশ্রু-সাগরে।
কূল তার নাহি জানে,
বাঁধ আর নাহি মানে,

তাহারি গর্জনগানে জাগো রে।
তরী তোর নাচে অশ্রু-সাগরে।
(স্মরণ)

বন্যার স্রোতে জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়ে সাগরে পাড়ি দেবেন কেন? তার উত্তর এই কবিতারই অন্য অংশে কবি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মৃত্যু এসে নির্দয় আঘাত হেনে যে খেলার আসর ভেঙে দিয়ে গেল, সেখানে কিছু অবলম্বন ক'রে পড়ে থাকবার ত কিছু নেই। সেখানে ত সবই শূন্য হয়ে গিয়েছে। সেখানে পাখীর সঙ্গীত নেই, জনমানব নেই, আছে শুধু বালুকারাশির বিস্তার। বন্যার প্লাবন এসে তাকে এখন ঢেকে দিয়েছে :

শূন্য মরুময় সিন্ধু-বেলাতে
বন্যা মাতিয়াছে রুদ্র খেলাতে।
হেথায় জাগ্রত দিন
বিহঙ্গের গীতহীন,
শূন্য এ বালুকালীন বেলাতে,
এই ফেনতরঙ্গের খেলাতে।
(স্মরণ)

সে ক্ষেত্রে জোয়ারের জলে তরী ভাসিয়ে দেওয়াই ত ভাল। এমনও ত হতে পারে, ভেসে চলতে চলতে জীবনতরী ভিড়বে এমন এক নূতন স্বর্ণময় কূলে যা জীবনকে আবার সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই আকুল শোককে বক্ষে সংহত ক'রে অকূলে তরী ভাসিয়ে দিতে হবে নিরুদ্দেশ যাত্রায় :

দুলে রে দুলেরে অশ্রু দুলে রে।
আঘাত করিয়া বক্ষ-কূলে রে।
সম্মুখে অনন্ত লোক,
যেতে হবে যেথা হোক—
অকূল আকুল শোক দুলেরে,
ধায় কোন দূর স্বর্ণ-কূলে রে।
(স্মরণ)

মনে হয় সত্যই কবির নূতন স্বর্ণ-কূলের সন্ধান মিলেছিল। মৃত্যুর আকস্মিক আঘাত যখন এই প্রেমের অধ্যায়ের ওপর যবনিকা টেনে দিল, তখন কবির মন

ছুটল ভিন্ন দেশে। সেখানে প্রেয়সীর স্থান নিলেন 'জীবনদেবতা'। তখন প্রেমিক-কবি রূপান্তরিত হলেন ভক্ত-কবিতে। সীমার মাঝে অসীমের বিরহ-মিলন-মাধুরী প্রবাহিত করল নূতন কাব্যস্রোত। তাই বুঝি রচনা করেছিল সেই ত্রিবেণী-সঙ্গমকে, যা কবির কাব্যজীবনের পরবর্তী অধ্যায়কে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। তাই ত হল গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালির কাব্যসঞ্চয়.

তাই মনে হয় মৃত্যুর এই আকস্মিক আঘাত যেন কবির কাব্যজীবনের পরবর্তী অধ্যায়টিকে ত্বরান্বিত করেছিল। প্রকৃতির কবি ও ভক্ত-কবির মাঝখানে যে ক্ষীণ পর্দাটি কিছুকাল তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল, তা সরে যেতেই কবির প্রেমাস্পদ রূপে দেখা দিলেন ঈশ্বর। প্রেমের কবির মধুময় কাকলী আচম্বিতে নীরব হয়ে গেল।

দুঃখের সেই চরম আঘাতের দিনে কবি খেদ ক'রে বলেছিলেন :

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার,
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার,
তারি সাথে শেষ চেনা।
(স্মরণ)

সে অতিথিটি ছিল মরণ। কিন্তু সে ত দুঃখের আতিশয্যে আক্ষেপের কথা। আর এক অতিথি ঠিক এসেছিলেন তিনি হলেন প্রকৃতির নানা সৌন্দর্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি ইঙ্গিতে তাঁর উপস্থিতি কবিকে জানিয়ে দিতেন সেই বিশ্বদেব। কবির শূন্য হৃদয়-আসন দীর্ঘকাল অপূর্ণ থাকে নি, বিশ্বদেব জীবনদেবতা-বেশে মনের মানুষ হয়ে তাঁর হৃদয়ের গোপন আঁধার ঘরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর সুরু হয়েছিল সেই অরূপরতনকে নিয়ে নূতন গানের পালা। তাই কি কবি গেয়েছিলেন :

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক॥

ওহে অন্তরতম

'জীবনদেবতা'-তত্ত্ব রবীন্দ্রসাহিত্যকুঞ্জে একটী বিশিষ্ট লতা। তার পত্র-পুষ্পের শোভা সে কুঞ্জকে বিশেষভাবে শ্রীমণ্ডিত করেছে। কিন্তু সে লতাটির প্রকৃত পরিচয় কি, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট তথ্য বিশেষ পাওয়া না। ফলে দেখা যায় বিভিন্ন সমালোচক তার পরিচয় দিতে গিয়ে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ তাকে একটি দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদা দিয়ে তার দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। কেউ বা তাকে কবির কাব্যপ্রতিভা বলে অভিহিত করেছেন। ফলে তত্ত্বটি রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তাঁর একাধিক রচনায় তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টির দুরূহতার জন্য নিজেও যা বলেছেন তা রহস্যের জাল ছিন্ন করতে পেরেছে কিনা, তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। তাই এক জায়গায় স্পষ্ট ভাবেই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে পাঠক হয়ত তাঁকে ঠিক বুঝতে না পেরে রহস্যবিলাসী ভাববেন।

অথচ 'জীবনদেবতা'-তত্ত্বটি রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংগ। তা মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তি নিয়েই কবির মধ্যজীবনে উদয় হয়েছিল এবং তাঁর জীবনকে আনন্দসিক্ত করেছিল। সে আনন্দানুভূতি তাঁর সমকালীন রচনায় প্রতিফলিত হয়ে তাকে বিশেষভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিল। এ-হেন তত্ত্বটির পরিচয় ভাল রকম না পেলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মাধুর্যের পূর্ণ-আস্বাদ গ্রহণে আমরা বঞ্চিত হব। এই প্রবন্ধে তারই চেষ্টা করা হবে।

পথ দুর্গম হলেও সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে বিক্ষিপ্ত নানা মন্তব্য এখানে আমাদের কাজে লাগবে। অন্ধকার পথে আলোকবর্তিকার মত তা আমাদের ঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে। তার থেকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আর কিছু ত পাওয়া যাবে না। যিনি সূত্রকার তাঁর ভাষ্যই যদি মেলে, তার উপর নির্ভর করাই সব থেকে যুক্তিসঙ্গত। আমরা সেই পথ অবলম্বন করবার প্রস্তাব করি।

গোড়াতেই একটা বিষয় পরিষ্কার ক'রে নেওয়া যেতে পারে যে, 'জীবন-দেবতা'-তত্ত্বটি দার্শনিক তত্ত্ব নয়। তা কবির জীবনে আবির্ভাব হয়েছিল একটি উপলব্ধি হিসাবে। যুক্তি-তর্কের পথে তিনি তাকে পান নি, তিনি তাকে পেয়েছিলেন

হৃদয়বৃত্তি দিয়ে উপলব্ধি ক'রে। তিনি ছিলেন মূলত কবি। তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কবির দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর মানসিক গঠন সেই ধরনের যা কবির দেখা যায়। তা ভাবপ্রবণ, তা অনুভূতিপ্রধান, তা শুষ্ক-নীরস, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বিতর্কমূলক বিচারে পরাঙ্মুখ। দার্শনিক যুক্তি দ্বারা সমর্থিত বলে তিনি কোনো তত্ত্বকে গ্রহণ করেন না। হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রে ভাল লাগলে তিনি সে তত্ত্বের গলায় বরমাল্য দেন। মোটামুটি বলা যায়, তাঁর উপলব্ধি হৃদয়বৃত্তি দিয়ে, মননশক্তির সাহায্যে নয়। 'জীবনদেবতা'-তত্ত্বটিও যে হৃদয়বৃত্তি দিয়ে অনুভব-করা-তত্ত্ব একথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। তিনি বলেছেন :

'ঈশ্বর বিষয়ক এই তত্ত্ব কোনো দার্শনিক যুক্তির মধ্য দিয়ে আমার মনে গড়ে ওঠেনি। বরং শৈশব হতেই আমার স্বভাবের গতি যে পথে সেই পথে প্রবাহিত হয়েছে এবং একদিন হঠাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধিরূপে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।' (রিলিজিয়ান অফ্ ম্যান)

সুতরাং দার্শনিক আলোচনার পথ এড়িয়ে আমরা যে পথে স্বভাবত কবির মন আকৃষ্ট হয়েছিল সেই পথেই এই তত্ত্বটির অনুসন্ধান করব। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব ছিল প্রধানত অনুভূতিপ্রবণ। তাই তিনি মননশক্তির সাহায্যে জানাকে কোনো দিন আমল দেন নি। তাঁর মতে তা বস্তুর বাহিরের পরিচয় এনে দেয় মাত্র, তার অন্তরে প্রবেশ করতে তা অক্ষম। অপরপক্ষে হৃদয়বৃত্তির মধ্য দিয়ে যে পরিচয়, তাঁর মতে তা আরও সমৃদ্ধ। প্রথমটি জানা মাত্র আর দ্বিতীয়টি পাওয়া, তা পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত করে। তিনি বলেছেন : 'অবিমিশ্র সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান বা নিছক যুক্তির আবিষ্কার বাহিরের বস্তু, তারা সত্তার অন্তরের নাগাল পায় না।'

(রিলিজিয়ান্ অফ্ ম্যান্)

কবি তাই বাল্যকাল হতেই অনুভূতির পথে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে নানা সৌন্দর্যের আবিষ্কার করেছেন। তাদের বিষয়বস্তু ক'রে কবিতা লিখেছেন। তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন, তিনি ঈশ্বরকে ভালবেসেছেন। এদের নিয়েই তাঁর কাব্যজীবন প্রবাহিত হয়েছে। আবার এদের নিয়েই তাঁর ধর্ম-জীবনও গড়ে উঠেছে। এই ভাবে অনুভূতির পথে তাঁর কাব্যজীবন তথা ধর্মজীবন ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে গেছে। কবি স্বয়ং বলেছেন যে এই ভাবে তাঁর এই দুটি ভাবধারা যে শৈশব হতেই পরস্পরের বাগদত্ত হয়েছিল তা দীর্ঘকাল তাঁর অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা যখন আবিষ্কার করলেন তখন তারা উদ্বাহবন্ধনে পরস্পর বদ্ধ হয়ে গেছে। এই যুগ্ম অনুভূতির পথেই কবির জীবনে

একদিন 'জীবনদেবতা'-তত্ত্ব হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই আত্মপ্রকাশের পূর্বে একটি প্রস্তুতিপর্ব ছিল। সেই প্রস্তুতিপর্বের ইতিহাসটি আমাদের প্রথম আবিষ্কার করা প্রয়োজন।

কবি-প্রতিভার উন্মেষের পর কবির প্রথম রাখীবন্ধন প্রকৃতির সংগে। প্রকৃতির বক্ষে নানা সৌন্দর্য ও শক্তির সমাবেশ সেই যুগে তাঁর কবিমনকে আকৃষ্ট করেছিল। নারিকেলশ্রেণীর উপর বাতাসের খেলা, সজল কালো মেঘের সুদূরে বিলম্বিত দেহ, উদয়-আকাশে উষার ভালে রাঙা টিপটি—এরাই তাঁর হৃদয়কে প্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রশস্তি রচনা ক'রে বিশ্লিষ্টভাবে তাদের তিনি বরমাল্য অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু কেবল তাদের সৌন্দর্য-মাত্র তাঁকে আকৃষ্ট করেনি, তাদের অন্তর্নিহিত এক নিগূঢ় সত্তার অস্তিত্বের ইংগিতও তিনি তাদের মধ্যে পেয়েছিলেন। শরতের আকাশের বুকে ইতস্তত সঞ্চরমাণ মেঘখণ্ডগুলি শুধু তাঁর নয়নরঞ্জন করেনি, যিনি তাদের ভাসিয়েছেন তাঁর কথাও তাঁর মনে উদয় হয়েছে। তাছাড়া গগনে নীল নবঘন বিস্তৃত হয়ে যখন তিল ঠাঁই আর রাখে না, তখন কার জন্য তাঁর যেন মন কেমন ক'রে ওঠে। অবশেষে তিনি বৈদিক যুগের ঋষির মত একদিন আবিষ্কার করলেন যে, প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁর আভাসে-প্রকাশ তিনি লক্ষ্য ক'রে আসছেন, তিনি এক সর্বব্যাপী সত্তা। তিনি প্রকৃতি এবং বিশ্ব, সব কিছু জড়িয়ে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। প্রকৃতির মধ্যে বৃক্ষে, লতায়, পত্রে, পুষ্পে যে প্রাণস্পন্দন আমাদের নয়নরঞ্জন করে তারা আলোর-চরা ধেনু। আর গগনে যে অগণিত নক্ষত্ররাজি নিশার আকাশ আলোকিত করে, তারা সব আলোকধেনু। তারা প্রকট, কিন্তু যিনি তাদের চরিয়ে বেড়ান সেই রাখালরাজাটিকে কোথাও দেখা যায় না, কেবল তাঁর বেণু শোনা যায় :

এই ত তোমার আলোকধেনু
সূর্য তারা দলে দলে—
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু,
চরাও মহাগগনতলে ॥

(গীতিমাল্য)

তার পরের অবস্থায় 'চিত্রা'র যুগে আমরা দেখি কবির একটি নূতন উপলব্ধি লাভ হয়েছে। তা হল নিজের মধ্যেই একটি যুগ্মসত্তার আবিষ্কার। তারা উভয়েই তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত। একটি আকর্ষণ বোধ করে পরমসত্তার বহির্জগতের প্রকাশের প্রতি। সেখানে কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর আহ্বান আসে। তাই তাঁর

ব্যক্তিসত্তার সেখানে প্রকাশ বহু ও বিচিত্ররূপে। অপর পক্ষে, তাঁর আরও একটি আকুতি জাগে অন্তর্জগতে, একাকী পরমসত্তার একক প্রকাশের কাছে পূজা দিতে। 'চিত্রা' কাব্য-পুস্তকে এই দুই আকর্ষণের বিভিন্ন সুর প্রথম ধরা পড়েছে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি বহু-বেশে বহির্জগতে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। আবার 'আবেদন' কবিতায় তাঁর আকুতি জেগেছে দেবতাকে একক ভাবে নিভৃতে রেখে তাঁর সেবা করবার। তিনি হতে চেয়েছেন নিভৃতে তাঁর মালঞ্চের মালাকর। জীবনের দুই ভিন্ন মহলে কবির আকুতির বিভিন্নতা অনুসারে কবির দুই ভিন্ন রূপ।

এই কথাটি 'চিত্রা'-শীর্ষক প্রথম কবিতাটিতেই কবি বোঝাতে চেয়েছেন। বাহিরে যিনি বহু ও বিচিত্র, অন্তরে তিনিই একাকী। এ-দুটিই কবির ভিন্ন জগতে ভিন্ন প্রকারের রূপ। কবি নিজেই বলেছেন 'তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাহিরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থলাভিষিক্ত নয়।' দুটিই তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ। এই যুগ্মসত্তায় মিলে পরমদেবতার জন্য অর্ঘ্য রচনা হয়েছে। বহির্জগতে প্রকৃতির কবি হিসাবে বহু ও বিচিত্র বেশে যাঁর প্রকাশ তাঁর জন্য তিনি অর্ঘ্য রচনা করেছেন। আর অন্তর্লোকে জীবনের নিয়ন্তা হিসাবে কল্পনা ক'রে কবি তাঁর প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন মনের নিভৃত মন্দিরে। এর সমর্থনে তাঁর নিজের এই উক্তিটি উল্লেখযোগ্য :

'চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম, যেন যুগ্ম-নক্ষত্রের মত সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল।···পরমদেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরের কর্মযোগে তার প্রকাশ।'

('চিত্রা'র সূচনা)

এই যুগ্ম উপলব্ধির মধ্যেই যেন 'জীবনদেবতা'-তত্ত্বের বীজটি নিহিত রয়ে গেছে। কবির যুগ্মসত্তার দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকর্ষণ। একটি ক্ষেত্র বাহিরের জগতে প্রকট। সেখানে পরমসত্তা বহু ও বিভিন্নরূপে তাঁকে বৈচিত্র্যময় জীবনের আস্বাদ দিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। সেখানে বিশ্বদেবতার জগত-জুড়ে আসন পাতা। আর একটি ক্ষেত্র তাঁর অন্তর্লোকে। সেখানে তিনি একাকী থেকে একক ভক্তের নিভৃত পূজা পেতে উৎসুক। এই ঔৎসুক্যই যেন 'জীবনদেবতা'কে স্থাপনের আসনটি তাঁর হৃদয়মন্দিরে রচনা ক'রে দিয়েছিল। এই সম্পর্কে এটিও লক্ষ্য করবার বিষয়

যে, এই 'চিত্রা' কাব্যেই তাঁর 'জীবনদেবতা'-শীর্ষক কবিতাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। যে-দেবতা তাঁর হৃদয়ে বসে তাঁর কাব্য তথা জীবনতরীকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন, যিনি তাঁর মুখ হতে ভাষা কেড়ে নিয়ে কবিতায় নিজের কথা কইছেন, যিনি অন্তর্যামী হয়ে তাঁর সুখ-দুঃখে সমবেদনা জানিয়ে তাঁর জীবনকে আস্বাদ করছেন, তাঁকে তিনি এই কবিতায় প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন করেছেন এই যে, সেই মনের মানুষটিকে তিনি পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পেরেছেন কিনা।

এই সম্পর্কে আর একটা প্রশ্ন আসে। প্রকৃতির নিবিড় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মধ্যে কবি এক সর্বব্যাপী-সত্তার প্রচ্ছন্ন অবস্থিতির উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁকে তিনি কোথাও 'নিত্যকালের মায়াবী' বলেছেন, কোথাও 'নটরাজ' বলেছেন। তিনি কল্পনা করেছেন, বিশ্ব জুড়ে তাঁর নৃত্য চলেছে। সে নৃত্যের প্রেরণা হল আনন্দ। সে নৃত্যের তাল রক্ষা করে জন্ম-মৃত্যু, ভাঙা-গড়া, হাসি-কান্না, ভালো-মন্দ। নটরাজের সেই নৃত্যের ছন্দ কবির চিত্তে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ছন্দভরা তাঁর সেই তালে তালে নৃত্য নিত্য তাঁর চিত্তকে ছন্দিত করে। তাঁর সেই নৃত্যের উন্মাদনা পৃথিবীর বক্ষে ছড়িয়ে পড়ে ছয় ঋতুর নৃত্য লীলারূপে :

সেই আনন্দ-চরণ-পাতে,
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বয়ে যায় ধরাতে
বরন-গীতে, গন্ধে রে।

(গীতাঞ্জলি)

সেই সর্বব্যাপী সত্তাকে তিনি বিশ্বদেবও বলেছেন। তিনি বিশ্ব জুড়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্তমান। কবি এইভাবে প্রকৃতির সহিত পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এক বিশ্বব্যাপী সত্তার পরিচয় পান। তাঁর অভিজ্ঞতায় সর্বেশ্বরবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তাঁর দৃষ্টিভংগি কবির দৃষ্টিভংগি, তিনি ত বিশ্বব্যাপী সত্তার শুধু অস্তিত্ব জেনে তৃপ্তি পান না। তিনি তাঁকে প্রীতির সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে পেতে চান। কারণ তাঁর ধারণায় জানা-বস্তুটি বাহিরের, তা অন্তরের পরিচয় এনে দিতে পারে না। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম পরিচয়, যা একমাত্র সম্ভব হৃদয়ের সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, যিনি বিশ্বের সর্বত্র প্রচ্ছন্নরূপে বর্তমান তিনি কত বিরাট, তিনি কাজ করেন সবার অলক্ষ্যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের সহিত প্রীতির সম্পর্ক পাতানো তাঁর পক্ষে কি সম্ভব? যিনি এত বিরাট, যাঁর ধীশক্তি সূক্ষ্ম হতে

সূক্ষ্মতর, তিনি সম্ভবত নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। কাজেই তাঁর সংগে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করবার সম্ভাবনা কোথায়? প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে যে প্রয়োজন দুটি ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ সত্তার। প্রীতি জ্ঞাপন করা আর প্রতিদানে প্রীতি পাওয়া না হলে ত হৃদয়বৃত্তির সংযোগ সম্পূর্ণ হয় না।

মনে হয় কবির মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল এবং তার একটি সন্তোষজনক মীমাংসাও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই বিরোধের সমন্বয় তিনি করেছিলেন এইভাবে। তাঁর ধারণা হয়েছিল বিশ্বসত্তার প্রকাশ দুই বিভিন্ন পর্যায়ে হয়। একটি পর্যায়ে তিনি অপরিসীম ধীশক্তি দিয়ে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন। সেটিকে তিনি কাজের প্রকাশ বলেছেন। সেখানে তাঁর নিয়ম অমোঘ, সেখানে তাঁর নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মত কাজ করেন। পরমসত্তার আর এক পর্যায়ে প্রকাশ আছে যেখানে তিনি ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট হয়ে প্রীতির আদান-প্রদান করতে পারেন। এটিকে তিনি ভাবের বা আনন্দের প্রকাশ বলেছেন। সুতরাং কাজের জগতে যে প্রকাশ, সেখানে তিনি সর্বেশ্বরবাদের দার্শনিক সত্তা, আর ভাবের জগতে যে প্রকাশ, সেখানে তিনি ভক্তের ভগবানরূপে উদিত হন, প্রেম দেওয়া-নেওয়ার লীলা করতে।

এই কথাটি তিনি নানা ভাবে তাঁর প্রবন্ধে, তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যানমূলক ভাষ্যে, এবং কবিতার মধ্যে নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের উপরের প্রতিপাদ্যের সমর্থন হিসাবে তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে এই সম্পর্কে স্থাপন করা যেতে পারে।

প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত উদাহরণ হিসাবে এই সম্পর্কে তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে 'সৌন্দর্য'-শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি সেখানে সৌন্দর্যের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মোটামুটি বলতে চেয়েছেন যে, প্রকৃতির বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে এত যে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি তার ব্যবস্থা শুধু আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুরঞ্জনের জন্য নয়, তার আরও গভীর তাৎপর্য আছে। এই সৌন্দর্যের প্রকাশ আসলে হল পরমসত্তার ব্যক্তিবিশেষের নিকট পাঠান প্রেম-লিপি। তাঁর এই উপলব্ধি কি ক'রে হল তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি পরম-সত্তার দুই বিভিন্ন প্রকাশের কথা উত্থাপন করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে পরমসত্তার একটা প্রকাশ আছে যেখানে তিনি বিশ্বের নিয়ামক। তাঁর এই প্রকাশকে তিনি সত্যরূপে প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। এখানে নিয়মের রাজ্য। এ ভিন্ন তাঁর এক স্বতন্ত্র প্রকাশ আছে যেখানে তাঁর ইচ্ছা মেনে

চলা না চলা মানুষের ইচ্ছাধীন। সেটিকে তিনি আনন্দরূপে প্রকাশ বলেছেন। আনন্দের ক্ষেত্রে তিনি জগত জুড়ে নানা সৌন্দর্যের নিদর্শন স্থাপন ক'রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলতে চেয়েছেন, আমার প্রেম তোমায় দিচ্ছি, তোমার প্রেম আমায় দাও। এখানে তিনি প্রতি মানুষের প্রেমের কাঙাল, কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে, প্রত্যাখ্যান করতেও পারে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলে সে পরমসত্তার আনন্দরূপের পরিচয় পায় না। এই সম্পর্কে তাঁর নিম্নে উদ্ধৃত উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য :

'আমাদের অন্তরাত্মার আমি-ক্ষেত্রের একটা সৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে জগত জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে।··· সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন তা হলে জোড়হাত করে তাঁকে মানতুম; কিন্তু, তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে কেউ আসে না···।'

(শান্তিনিকেতন, সৌন্দর্য)

তিনি পদাতিকদের সঙ্গে নিয়ে আসেন না কারণ, তিনি এখানে মানুষের প্রেমের ভিখারী। জবরদস্তি ক'রে কি প্রেম পাওয়া যায়? তাই তাঁকে গ্রহণ করা বা না করা মানুষের ইচ্ছাধীন। এটি ত নিয়মের প্রকাশ নয়, কাজেই বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু গ্রহণ না করলে একটা মস্ত ক্ষতি আছে বৈকি, পরমসত্তার আনন্দময়-রূপের পরিচয় হতে আমরা বঞ্চিত হই। তিনি তাই বলেছেন :

'এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে। এই জন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশক, আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে।'

(শান্তিনিকেতন, সৌন্দর্য)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়ে' তাঁর কাব্যজীবনের মধ্য দিয়ে কি ভাবে এই 'জীবনদেবতা'-তত্ত্বটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। তা সংক্ষেপে এই। তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্যে বিভিন্ন অনুভূতি খণ্ড-আকারে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেলেও তিনি পরবর্তী জীবনে উপলব্ধি করেছেন যে, তাদের মধ্য দিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্যের যোগসূত্র প্রবাহিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রথমে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন পরে তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট

হয়। তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর মুখ হতে ভাষা কেড়ে নিয়ে অপর কে একজন তাঁর নিজের কথা বলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতির ভিতর দিয়ে কে একজন এক অখণ্ড তাৎপর্য গড়ে তুলছেন। তিনি কবির প্রবৃত্তিকে দুঃখ দিয়ে আঘাত হেনে প্রেয়ের পথ হতে টেনে শ্রেয়ের পথে, কল্যাণের পথে প্রবর্তিত করছেন। যে অপ্রত্যক্ষ শক্তি তাঁর অন্তরের মধ্যে থেকে তাঁর জীবনকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে গড়ে তুলছেন তাঁকেই তিনি 'জীবনদেবতা' নামে অভিহিত করেছেন। কবি বলেছেন :

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।"

(আত্মপরিচয়)

এই তত্ত্বটি যে ধীরে ধীরে প্রথম জীবনে আভাসে তার পরিচয় দিয়ে পরে একদিন হঠাৎ একটি দিব্যদৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতায় তার বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ 'দি রিলিজিয়ান অফ ম্যান'-এ তা লিপিবদ্ধ আছে।

সেখানে তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, এই তত্ত্বের আত্মপ্রকাশ সুরু হয় তাঁর প্রথম জীবন হতেই, তাঁর নিজের মতিগতির পথে। তা কোনো দার্শনিক চিন্তাধারার পরিণতি নয়। পরে একদিন হঠাৎ তা আবিষ্কৃত হয় একটি দিব্যদৃষ্টির ভিতর দিয়ে। সেই দিব্যদৃষ্টিখানি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' যে অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত তারই অনুরূপ এক অভিজ্ঞতার ফল। এই পুস্তকে তিনি তার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটির সময় তিনি উত্তরবঙ্গে পৈত্রিক জমিদারীর তত্ত্বাবধানের কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। সেদিন সকালে প্রাতঃকালীন কাজকর্ম শেষ হয়ে গিয়েছে, তিনি আশ্রয়স্থানে ফিরে এসেছেন। স্নানের পূর্বে তিনি জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। জানালার সামনে আছে বাজার। বাজারের অব্যবহিত পাশে অবস্থিত একটি মরা নদীতে প্রথম বর্ষণের জল সবে নেমে আসতে সুরু করেছে। হঠাৎ তাঁর অন্তর উদ্ভাসিত ক'রে একটি উপলব্ধি জাগল। তিনি যেন কুয়াসার মধ্যে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, তিনি নিজের বাড়িতেই এসে গেছেন। তিনি আবিষ্কার করলেন, তাঁর সমগ্র জীবনের খণ্ড-অভিজ্ঞতাকে ব্যাপৃত ক'রে একটি

সামগ্রিক তাৎপর্য বর্তমান। তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁরই অন্তরের একটি ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট সত্তা তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করছেন। তাঁর উক্তিটি এই :

"সে দিন প্রাতে সেই গ্রামে আমার জীবনের ঘটনাগুলি হঠাৎ একটি সত্য-মণ্ডিত ঐক্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মত বোধ হয়েছিল তারা আমার মনে একটি অনন্ত সমুদ্রে রূপান্তরিত হল। আমার নিশ্চিত প্রতীতি হল যে একটি বিশেষ সত্তা আমাকে এবং আমার বিশ্বকে ব্যপ্ত ক'রে আছেন এবং আমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর পূর্ণতম প্রকাশের সন্ধান করছেন।"

(দি রিলিজিয়ান অফ ম্যান)

সুতরাং 'জীবনদেবতা' তত্ত্বটি দার্শনিক চিন্তার ফল নয়, এটি কবির ব্যক্তিগত জীবনের একটি উপলব্ধি। বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর তা স্থাপিত নয়, তা কবি-হৃদয়ের একটি অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তা কবির হৃদয়কে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছিল, তাঁর জীবনকে মাধুর্যে ভরে দিয়েছিল।

পরমসত্তাকে 'জীবনদেবতা' রূপে প্রকাশ নিতে হলে তাঁকে ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট হতে হবে। সীমার বন্ধনে বদ্ধ হতে হবে, তবেই ত ব্যক্তিবিশেষের সহিত তাঁর প্রীতির যোগ সম্ভব। তবেই ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গী হয়ে তাঁর জীবনকে তাৎপর্যের পথে পরিচালিত করবেন। এই সম্পর্কেই প্রশ্ন জাগে, যিনি বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তিনি ত নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, তাঁর এই ভাবে ব্যক্তিবিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন কি ক'রে সম্ভব? এই প্রশ্নের সমাধান কবি করেছেন একটি অভিনব পথে। তিনি বলেন, পরমসত্তার প্রকাশ দুই পর্যায়ে; একটি কাজের প্রকাশ, অপরটি ভাবের প্রকাশ। এ বিষয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা যে সম্ভব তার পক্ষে যুক্তি হিসাবে তাঁর একটি সুন্দর কবিতা পাওয়া যায়। সেটির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আকাশের সূর্য এত বিরাট, তা এমন বিপুল শক্তির আধার যে আকাশের মতই বিরাট বস্তু চাই তাকে ধারণ করবার জন্য। যা এত বিরাট, যার জ্যোতি কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম ক'রে মহাকাশের এক বিশাল অংশ উদ্ভাসিত করে, তার কাছে পৃথিবীর বক্ষে অবস্থিত ক্ষুদ্র বস্তুগুলি উপেক্ষণীয়। এখন তাদের মধ্যে কোনোটি যদি সূর্যের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে উদ্‌গ্রীব হয়, তাকে বাতুলতা বলে পরিহাস করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু কবি বলেন তাও

সম্ভব কেন, তা ঘটে। এই দেখো না ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু। সে স্বপ্ন দেখে তপনের সংগে মিতালি করবার, কারণ সে জানে সে এত ক্ষুদ্র আর তপন এত বড় যে বাস্তব জগতে তাদের মিতালি অসম্ভব। তাই সে দুঃখ ক'রে বলে

"হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা
ওগো তপন তোমার দেখি যে স্বপন
করিতে পারি নে সেবা।"

(উৎসর্গ)

কিন্তু তপন ত বাস্তবিক তাকে উপেক্ষা করে না। তা বিরাট হলে কি হবে, ক্ষুদ্র শিশির বিন্দুর সংগে মিতালি করতে সেও ত উদ্গ্রীব। তা যদি না হবে, তা হলে তার রশ্মি শিশিরবিন্দুর বুকে প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করে কেন? তপন তাই উত্তরে বলে,

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।"

(উৎসর্গ)

এখানে তপনের সহিত যদি পরমসত্তার তুলনা করি এবং শিশিরবিন্দুর সহিত ব্যক্তিবিশেষের তুলনা করি, তা হলে কবি ইংগিতে যা বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সূর্যের যেমন বিপুল কিরণে মহাকাশকে উদ্ভাসিত করবার শক্তি আছে, তেমন শিশিরবিন্দুর সংগে মিতালি করবারও শক্তি আছে। পরমসত্তারও তেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষমতার প্রকাশ। বিশ্বনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বব্যাপী মহাশক্তি, প্রচ্ছন্নভাবে সর্বভূতে, সর্বলোকে কাজ করছেন। আবার হৃদয়-বিনিময়ের ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিত্বের রূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে, প্রতি মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান নিয়ে তার সংগে প্রীতি বিনিময় করবার ক্ষমতা রাখেন। কবির 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের মূলে রয়েছে এই প্রতীতি। তিনি তাই বলেছেন :

"বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারায়। জীবন-দেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলে মনের মানুষ।"

(মানুষের ধর্ম)

এই সম্পর্কে বাউল সম্প্রদায়ের সাধনমার্গ যে রবীন্দ্রনাথের মনে এ বিষয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উপরে উদ্ধৃত

উক্তি হতেই তার সমর্থন পাওয়া যাবে। বাউলসম্প্রদায় পরমসত্তাকে ব্যক্তিত্বে ভূষিত ক'রে, মানুষরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ক'রে তাঁর পূজা করেন। তাঁকে তাঁরা 'মনের মানুষ' বলেন; কারণ হৃদয়মন্দিরেই, তাঁদের বিশ্বাস, তাঁর উপস্থিতি। তাঁকে তাঁরা 'নরনারায়ণ'ও বলেন, কারণ তিনি দেবতা হয়ে মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে মানুষরূপে দেখা দেন। এটি শুধু তাঁদের বিশ্বাস নয়, তাঁদের উপলব্ধি-করা তত্ত্ব। মধ্যযুগের এক কবি-বাউল এ বিষয় এইরূপ লিখেছেন,

"তুমি হলে নরনারায়ণ।
এটা ভ্রান্তি নয়, এ কথা সত্য।
তোমার মধ্যে অসীম সীমাকে খোঁজে,
পরিপূর্ণ জ্ঞান খোঁজে প্রেমকে।
আর যখন রূপের সঙ্গে অরূপ
প্রেমের বন্ধনে সংযুক্ত হয়
তখন প্রেম ভক্তিরূপে সার্থক হয়ে ওঠে।"

(রিলিজিয়ান অফ ম্যান)

এখানে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের সহিত বাউলের সাধনতত্ত্বের আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য দেখা যায়। বাউলের উপলব্ধিতেও যে জীবনদেবতা আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ তৃপ্তির কারণ। তিনি তাই তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

"যে মানুষ সকল মানুষে অবস্থিত, বিশেষ বিশেষ দেহধারী মানুষের মধ্যে যে অরূপ মানুষের প্রকাশ, তাঁর সহিত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় এঁদের (বাউলদের) জীবনরীতিতে পাওয়া যায়।"

(রিলিজিয়ান অফ ম্যান)

উপনিষদে একটি শ্লোক আছে যার বাংলা অনুবাদ এইরূপ দাঁড়ায়: "দুটি পাখী আছে, তারা পরস্পরের সখা এবং এক সংগে একই বৃক্ষের আশ্রয়ে আছে। তাদের একটি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করছে, অপরটি ভক্ষণ না ক'রে বসে রয়েছে।"* এটির একটি রূপক অর্থ আছে। দুটি পাখীর একটি হল জীবাত্মা

---

* দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি
অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

এবং অপরটি পরমাত্মা। জীবাত্মা ভোগী, সে সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করে আর পরমাত্মা বিকারহীন চিত্তে তার সাক্ষ্য হয়ে বসে থাকেন। সীমার মাঝে অসীমের এই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের সমর্থন করে।

কবি নিজেও সেটা নজর করেছিলেন এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমর্থনে ব্যবহার করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি এই মন্তব্য করেছেন :

"উপনিষদে একটি রূপক গল্পে বলা হয়েছে যে দুটি পাখী একই ডালে বসে রয়েছে, তাদের একটি খাচ্ছে, অপরটি তাকিয়ে রয়েছে। অসীমের সংগে সীমাবদ্ধ ব্যক্তির পরস্পর সম্বন্ধের এটি একটি চিত্র। যে পাখী শুধু চেয়ে থাকে, তার আনন্দের সীমা নাই, কারণ তা হল শুদ্ধ এবং মুক্ত আনন্দ। মানুষের মধ্যে এই দুটি পাখীই আছে ; একটি হল বাস্তব যা সংসার করে, অপরটি হল মানসিক যা আনন্দরূপকে অনুভব করে।"

(রিলিজিয়ান অফ ম্যান)

উপনিষদের এই উক্তি এবং বাউলের সাধনজীবনের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের সাধনায় কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিজের অভিজ্ঞতার সমর্থন অন্যত্র পেলে খানিকটা বল পাওয়া যায় বৈকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা' তত্ত্ব তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব, তা আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর মতি-গতি, তাঁর অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে। তা ব্যাপ্ত করেছে শুধু তাঁর কাব্যজীবনকে নয় তাঁর কর্মজীবন ও ধর্মজীবনকেও। 'জীবনদেবতা' তত্ত্ব যখন উপলব্ধি হিসাবে তাঁর নিকট আত্মপ্রকাশ করেছিল, তিনি তখন উচ্ছ্বসিত চিত্তে বলে উঠেছিলেন, এত দিনে তাঁর নিজস্ব ধর্মকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। এই তত্ত্ব তাঁর জীবনের কতখানি অংশ পরিব্যাপ্ত করেছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত তাঁর উক্তি হতে বেশ বোঝা যাবে :

"আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে—আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে 'যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্যসাধনার গণ্ডিকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ।"

(আত্মপরিচয়)

এখন এই 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যার সময় হয়েছে। 'জীবন-

দেবতা' কোনো দার্শনিক তত্ত্ব নয়। তা কবিহৃদয়ের উপলব্ধি হতে লব্ধ বস্তু। তার কোনো দার্শনিক সমর্থনমূলক যুক্তির প্রশ্ন ওঠে না। তা হল কবির অনুভবের বিষয়। কাজেই তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। তা এক গভীর উপলব্ধি হিসাবে একদিন কবির হৃদয়ে উদয় হয়েছিল। তা তাঁর কর্মজীবন, ধর্মজীবন এবং সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এইটিই হল এখানে সবার বড় কথা। আরও বড় কথা এই যে, তা তাঁর জীবনকে আনন্দ-সিক্ত করেছিল। আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই তত্ত্বকে বিচার করতে হবে।

'জীবনদেবতা' তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এখানে কবি একটি দোটানার মধ্যে পড়েছেন। তাঁর মন তাঁকে এক সিদ্ধান্তে টানতে চেয়েছে, আর হৃদয়বৃত্তি টানতে চেয়েছে অন্য সিদ্ধান্তে। এই দোটানার সংঘাতের মধ্যে পড়েই যেন তার সমাধানের জন্য কবি 'জীবনদেবতা'কে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মনে যিনি দার্শনিক আছেন তিনি আবিষ্কার করেছেন সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এক অবিচ্ছিন্ন সত্তার প্রচ্ছন্ন অবস্থিতি। এই সত্তা সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে বর্তমান। তারই জন্য তাঁর কোনো বিচ্ছিন্ন প্রকাশ নেই। তিনি সব কিছু নিয়ে, সব কিছু জড়িয়ে অপ্রকটরূপে বর্তমান। একেই বলে সর্বেশ্বরবাদ। উপনিষদের ঋষি এই সর্বেশ্বরবাদের গলায়ই বরমাল্য দিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর অন্তরে যিনি কবি আছেন তাঁর এই উপলব্ধিতে স্বীকৃতি নেই। তিনি প্রেমের কাঙাল, তিনি মননের থেকে অনুভূতিকে সম্মান দেন বেশী। যিনি সবকিছু জড়িয়ে আছেন, যাঁর বিশেষ আকার নেই, যিনি ব্যক্তিত্বের রূপ ধরেন না, তাঁর সঙ্গে ত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। তাঁর অন্তরের কবিটি বলেন, সে কথা আমার বিশ্বাস হয় না। পরমসত্তা হতে পারেন বিরাট, কিন্তু তিনিও ব্যক্তিরূপে আমার সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন। শুধু কি পারেন, তিনি প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে একান্ত আগ্রহশীল। তা না হলে, প্রেমের গীতি-কাব্য রচনা হয় না যে। তা না হলে সকল আকাশ, সকল ধরণী জুড়ে এত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি যে বৃথা হয়। কবির ভাষায় বলা যায়:

"নানা ছলে, নানা কলায়, বিশ্বের সর্বত্র আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্ছেন কেন? এই ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন, তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমাকে দাও।"

(শান্তিনিকেতন, সৌন্দর্য)

কাজেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে একটা মীমাংসার। সেই পথেই কবি 'জীবনদেবতা'কে আবিষ্কার করেছেন। সর্বেশ্বরবাদের যিনি ছিলেন 'বিশ্বদেবতা' তিনি ব্যক্তিত্বের সীমায় চিহ্নিত হয়ে 'জীবনদেবতা' রূপে আবির্ভূত হলেন। বহির্বিশ্বে তিনি অপ্রকট, তাঁকে বিশেষরূপে পাওয়া যায় না। অন্তর্লোকে তিনি একাকী, তিনি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট। তিনি সেখানে আমার বন্ধু, তিনি সেখানে আমার প্রেমিক। তিনি সেখানে বসে আমার ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, অথচ আমার সকল ভালো লাগা মন্দ লাগা, সুখদুঃখের অংশী হয়ে থাকেন। তিনিও আমারই মত ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট মানুষ। কিন্তু মনের মধ্যে থাকেন। কাজেই তাঁকে 'মনের মানুষ' বলা যায়। তিনি সকল মানুষের মনে থাকতে পারেন। কাজেই তিনি 'বিশ্বমানব'ও বটেন। এই ভাবেই এই দোটানার খণ্ডন হল। যিনি অসীম ছিলেন তিনি সীমার মাঝে ধরা দিলেন, আমাকে গোপনে ভালোবাসবার জন্য। কবি তাই তাঁর এই বর্ণনা দিয়েছেন :

যে জন দেয় না ধরা যায় যে দেখে
ভালোবাসে আড়াল থেকে
আমার মন মজেছে সেই অরূপের
গোপন ভালোবাসায়।

(অরূপরতন)

যেখানে তিনি অসীম সেখানে তিনি বিশ্বদেব, তিনি উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের ব্রহ্ম। তাই বলে তিনি ব্যক্তিবিশেষের সহিত প্রীতির বন্ধনে ধরা দিতে অসম্মত নন, বরং উদ্‌গ্রীব। তিনি ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসেন, কিন্তু আড়াল থেকে ভালবাসেন। তাঁর সংগে ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় হৃদয়ের নিভৃত আসনে, তাঁকে 'জীবনদেবতা' রূপে প্রতিষ্ঠিত করলে। এখানে তিনি যেমন বাউলের 'মনের মানুষ' তেমন কবির 'জীবনদেবতা'। এইভাবে দেখা যাবে এই 'জীবনদেবতা' তত্ত্বটিতে দুটি বিভিন্ন তত্ত্ব যেন একীভূত হয়ে গেছে। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ যেন বাউলের 'নরনারায়ণ' বা বৈষ্ণবের 'ভক্ত-ভগবান' তত্ত্বের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। ফলে অদ্ভুতভাবে উভয়ের সহাবস্থিতি শুধু নয়, মিলন সম্ভব হয়েছে।

এই বিশ্লেষণটি, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের নিজের মনেও উদয় হয়েছিল। অধ্যাপক টমসন তাঁকে 'জীবনদেবতা' তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তার ব্যাখ্যান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্য-সম্পর্কিত তাঁর ইংরাজি পুস্তকে

তিনি তা উদ্ধৃত করেছেন। সেই মন্তব্যটি এই সম্পর্কে আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করা করা যেতে পারে। সেই চিঠিতে তিনি বলেছেন :

"এই তত্ত্বটির দুটি ধারা আছে। একটি হল বৈষ্ণব দ্বৈতবাদ যা জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন, অপরটি হল উপনিষদের অদ্বৈতবাদ। ঈশ্বর প্রতি ব্যক্তি-বিশেষের প্রেমের ভিখারীও বটে এবং বৈদান্তিক একীকরণের আদর্শে সকল বস্তুর ধারক-সত্তাও বটে।"*

মনে হয় 'জীবনদেবতা' তত্ত্বটি তাঁর কাছে এত মধুর লেগেছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের রচনায় তা এমন বিরাট অংশ দখল ক'রে বসে আছে। শুধু কি তাঁর কাব্য? তাঁর প্রবন্ধ, তাঁর আত্মপরিচয়-কাহিনী, শান্তিনিকেতন গ্রন্থে ছড়ান তাঁর বহু প্রার্থনা সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা, এই তত্ত্বের নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস করেছে। তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ ইংরাজি 'রিলিজিয়ান অফ ম্যান' ত একরকম এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা।

তার প্রভাব তাঁর জীবনে এত গভীর ও এত ব্যাপক যে, রূপকে লেখা একাধিক নাটকের মধ্য দিয়েও এই 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের ব্যাখ্যা তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রণীত 'রাজা' নাটক ও 'অরূপরতন' নাটকের বিষয়বস্তু এক। উভয়েরই নায়িকা রাণী সুদর্শনা, উভয়ই রূপকে লিখিত নাটক। যিনি দেখা দেননা অথচ রাণীর সঙ্গে অন্ধকার ঘরে মিলিত হন, এমন এক মানববেশী নায়কের কাহিনী অবলম্বন ক'রে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা এই 'জীবনদেবতা' তত্ত্বই। তিনি নিজেই লিখেছেন যে 'রাজা' নাটকটিকে গুছিয়ে নিয়ে নূতন পরিপাটি রূপ দিয়ে তারই তিনি নাম দিয়েছেন 'অরূপরতন'। আমাদের এই প্রতিপাদ্যটিকে 'অরূপরতন' হতে বচন উদ্ধৃত ক'রে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

'অরূপরতনের' মুখবন্ধেই কবি এই রূপক নাটকখানির বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন :

"যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে—আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

কাজেই আলোচনার বিষয় হলেন পরমসত্তা, তিনিই ত সকল কালে, সকল

---

* "The idea has a double strand. There is the Vaisnava dualism always keeping the separateness of the self and there is the Upanishadic monism. God is wooing each individual and God is also the ground reality of all as in the Vedantist unification." (Tagore's letter to Thompson).

রূপে আছেন। তিনিই উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের ব্রহ্ম। তিনি শুধু নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম নন, তিনি প্রভু ; তাঁকে বিশেষ ক'রে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তা সম্ভব বহির্বিশ্বে নয়, কারণ সেখানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ নেই। সে উপলব্ধি সম্ভব অন্তরের মধ্যে। এই কথাগুলিই এই রূপক নাটকের চরিত্রগুলি ও ঘটনাসংঘাতের মধ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। গ্রন্থে স্বয়ং কবি এই মন্তব্য করেছেন।

এই প্রভুকে কোথায় পাওয়া যায় তার আভাসে একটি ইঙ্গিত পাই, নাটকের প্রথম অংশে একটি গানের ভিতর দিয়ে। তা বলে প্রভু আমাদের প্রীতির পিয়াসী হয়ে আমাদের হৃদয়ের দরজার কাছে এসে আনাগোনা করেন। না ডাকলে ফিরে যান, কারণ প্রীতির ক্ষেত্রে ত বল প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে না। যে ভাগ্যবানের দরজায় তাঁর আনাগোনা চলেছে তারই সে বিষয় অবহিত হতে হবে, তাকেই ত আহ্বান জানাতে হবে। তবেই তিনি আসবেন। দক্ষিণ বায়ু ত সেই উপদেশই দিচ্ছে :

"চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়—
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিনবায়।"

(অরূপরতন)

নাটকের নায়িকা সুদর্শনার রাজার সঙ্গে মিলন হয় অন্ধকার ঘরে। সেখানে তাঁর প্রীতির স্পর্শ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। রাণী কিন্তু তাঁর আড়াল হতে ভালবাসা পেয়ে সন্তুষ্ট নন। যাঁর প্রীতি এত স্নিগ্ধ তিনি না জানি কত সুন্দর। তিনি তাঁকে আলোকের জগতে এনে আর পাঁচজনের মাঝখানে দেখতে চান। তাঁকে যতই বোঝান হয় সেই রাজাকে বাহিরে খুঁজতে নেই, খুঁজতে গেলে মেকি রাজাকে ভুল ক'রে রাজা বলে ধরে বসবার সম্ভাবনা আছে, তিনি শুনলেন না, তাঁকে বাহিরে দেখতে চাইলেন। তখন তার আয়োজন হল। যেমন আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তিনি এক মেকি সুদর্শন রাজার গলায়ই মাল্য দান ক'রে বসলেন। কারণ, তিনি তাঁর রাজাকে সুন্দর বলে কল্পনা করেছিলেন।

শেষে অনেক দুঃখের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যখন তাঁর ভুল ভাঙল, তিনি তখন রাজাকে দেখলেন কালো রূপে। সুদর্শনা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা ক'রে বলছেন,

"ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো কালো···আমার মনে হলো ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো

…কালো—ঝড়ের মেঘের মতো কালো,—কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো…”

(রাজা)

তিনি ত কালো হবেনই, কারণ তাঁর যে বিশেষ কোনো রূপ নেই, তিনি অরূপরতন। রূপের কালি যতক্ষণ চোখে লেগে থাকবে ততক্ষণ ত তাঁকে পাওয়া যাবে না, আর তাঁকে দেখবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই সুরঙ্গমা তাঁকে বলছেন,

“সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে। সেই আমার রাজার সকল-রূপ-ডোবানো রূপের মধ্যে। রূপের কালী যা-কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।”

তারপর রাজার সঙ্গে যখন তাঁর অন্ধকার ঘরে আবার দেখা হল রাণী তাঁকে বললেন, “তুমি সুন্দর নও প্রভু, অনুপম।” রাণী আরও উপলব্ধি করলেন যে যিনি অসীম, যিনি সর্বত্র প্রচ্ছন্নরূপে বর্তমান তাঁর ত বিশেষ কোনো রূপ নেই, তাই তাঁর রূপের ছায়াও নেই। তবে যিনি স্বভাবত কায়াহীন তিনি ব্যক্তিগত সম্বন্ধে ভক্তের সহিত প্রীতির বন্ধনে বদ্ধ হলে ভক্তের মধ্যে তিনি কায়া পান। সেখানে তাঁকে দেখা যায় না, পাওয়া যায়। আর তাঁকে পেলে ত আনন্দের অবধি থাকে না। এই হল সীমার মাঝে অসীমের মিলনের রহস্য। তাই সুদর্শনা বলছেন, “আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও। সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।”

এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই কবিরচিত গীতাঞ্জলির একটি কবিতায়:

তোমার আলোয় নাই ত ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া—
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।

যে ভাবে পরম এক

মহামনীষী শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের সহিত আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। তাঁর প্রচারিত দর্শনকে আমরা মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলে জানি। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেছে। মায়াবাদ বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে, এ হল সেই দার্শনিক তত্ত্ব যা প্রচার করে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।'

কিন্তু শঙ্করাচার্য যে মায়াবাদ প্রচার করে গেছেন, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার সঠিক পরিচয় দেয় না। তিনি ঠিক এমন কথা বলেন না যে, আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয় বহু বস্তুসমন্বিত বৈচিত্র্যময় যে জগতের পরিচয় দেয়, তা মিথ্যা। তিনি বরং বলেন যে তাও সত্য, তাও ব্রহ্মেতেই অধিষ্ঠিত। তবে তাকে দেখার ভুলে আমরা বহু ও বিচিত্ররূপে দেখি। জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্ম ও জগৎ একই, তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জগৎ সম্বন্ধে ঠিক পরিচয় আমাদের এনে দেয় না।

কথাটা বোঝা বড় শক্ত হয়ে পড়ছে। অন্য ভাবে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। বিশ্ব কি বহুবিশ্লিষ্ট সম্পর্কহীন বস্তুর সমষ্টি, না একই সত্তার প্রকাশ? এটি হল দর্শনের একটি মূল সমস্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, বিশ্ব অসংখ্য বিশ্লিষ্ট বিক্ষিপ্ত বস্তুর সমষ্টি মাত্র। আমাদের দেশে বৈশেষিক দর্শনের স্থাপয়িতা কণাদ তাই বলেছিলেন। তিনি বহু কণার সমষ্টির ভিত্তিতে বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর দর্শনকে তাই কণাবাদ বলা যায়। গ্রীস দেশের দার্শনিক ডিমোক্রাইটাসও এক অনুরূপ মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে বহুবিশ্লিষ্ট অণুর সমষ্টি নিয়ে বিশ্ব রচিত।

কিন্তু মানুষের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লক্ষ্য করেছে যে, বিশ্বে ঠিক বিশ্লিষ্ট নানা বস্তুর সমাবেশ নেই। যাকে বহু ও বিচিত্ররূপে আপাতদৃষ্টিতে দেখি তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যধারা লক্ষ্য করা যায়। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দার্শনিক চিন্তাধারা এক নূতন পথে যায়। ফলে একটি নূতন তত্ত্বের জন্ম হয়, যা বলে বিশ্ব বহুকে নিয়ে এক। বিশ্ব সরল ভাবে একক বস্তু নয়, তা জটিল ভাবে এক। তার মধ্যে বিভাগ আছে, কিন্তু সেই বিভাগগুলির মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের বহুত্বকে ব্যাপ্ত ক'রে একত্ব প্রকট।

শঙ্করাচার্য এই দুই দার্শনিক মতের কোনোটিকেই গ্রহণ করতে পারেন নি। বহুবাদকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ত বটেই, এমন কি বহুবিশিষ্ট জটিল একবাদকেও তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বিশ্ব একটি অখণ্ড সত্তাস্বরূপ। তার মধ্যে বহুর স্থান নেই। তার মধ্যে বিভাগের অবকাশ নেই। তাকে তিনি ব্রহ্মন্ বা আত্মন্ বলেছেন। তার প্রকৃতি হল চৈতন্যস্বরূপ। তাই তাকে তিনি 'নির্বিশেষ চিন্মাত্রম্' বলেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, তাঁর প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপ, যেমন লবণখণ্ডের প্রকৃতি, তা লবণের আস্বাদময়। সাধারণ ক্ষেত্রে চিৎশক্তিবিশিষ্ট সত্তার চিৎশক্তি প্রকাশ হয় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে। জানবার বস্তু একটা থাকবে তবেই ত চিৎশক্তি-বিশিষ্ট সত্তার প্রকাশ প্রকট হবে জানবার বস্তু কিছু না থাকলে আমার মন জানবে কি? কিন্তু তাঁর মতে ব্রহ্ম সম্পর্কে এ কথা খাটে না। জ্ঞেয় বস্তু থাক বা না থাক এই চিৎশক্তি নিত্য-বিরাজমান। তিনি বলেন মহাশূন্যে কিরণ গ্রহণ করবার জন্য বস্তু থাক বা নাই থাক সূর্য যেমন কিরণ বর্ষণ করে, ব্রহ্মের সেইরূপ জ্ঞেয় বস্তু না থাকলেও জ্ঞাতৃরূপ নিত্যপ্রকট। তিনি জ্ঞেয়বিহীন জ্ঞাতৃগুণবিশিষ্ট সত্তা।

যিনি চিন্ময় ও অবিভাজ্যরূপে একক সত্তা, তাঁকে তবে কেন আমরা বহু, বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপে দেখি? তিনি বলেন তার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি খানিক পরিমাণে দায়ী। তারা তাঁর যে পরিচয় আমাদের এনে দেয় তা ভুল পরিচয়। যার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই, যা সম্পূর্ণ অলীক অথচ দেখি, তাকে আমরা ভ্রান্তি বলতে পারি। যার বাস্তব ভিত্তি আছে অথচ আমরা যাকে তার প্রকৃত রূপ হতে ভিন্ন আকারে দেখি তাকে আমরা মায়া বা মতিভ্রম বলি। স্বপ্নে যা দেখি তা প্রথমটির উদাহরণ, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। মরুভূমির তপ্ত বালুস্তরে আমরা জল দেখি। তাকে বলে মরীচিকা। এটি মতিভ্রমের উদাহরণ। তপ্ত বালুকাস্তরের ওপরের বায়ু কাঁপে। তার সেই কম্পনকে আমরা জলের আকারে দেখি। তা ভ্রান্তি নয়, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়, তা হলে তাকে কেবল তপ্ত বালুর ওপর না দেখে যেখানে সেখানে দেখতাম। শঙ্করের মতে যা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে এক, তাকে যে আমরা বহুরূপে দেখি তাও মতিভ্রমের মত জিনিস। তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, তা মিথ্যা নয়, তা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা তার অপব্যাখ্যা করি। যেমন তপ্ত বায়ুস্তরের কম্পনকে আমরা মরীচিকা বলে ভুল করি।

কেন এমন দেখি? তারও তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে

একটি বিশেষ শক্তি ক্রিয়া করে, তাই নিরবচ্ছিন্নভাবে একরূপী ব্রহ্মকে বহুরূপে বিকৃত বা বিবর্তিত করে—বালুর তাপ যেমন বালুকান্তরের কম্পনকে বিবর্তিত ক'রে মরীচিকার রূপ দেয়। একটা সোজা লাঠির খানিক অংশ জলে ডুবিয়ে রাখলে তাকে বাঁকা দেখাবে। এখানে জলের সূর্যকিরণকে আংশিক ভাবে বাঁকা দেখাবার শক্তি তার রূপকে বিকৃত করে। জলের বিকৃত করবার শক্তি এখানে দৃষ্টিভ্রম ঘটায়। অপব্যাখ্যাই এই ভ্রান্ত উপলব্ধির কারণ। যে শক্তি একক ব্রহ্মকে বহুরূপে বিকৃত করে তাকে তিনি মায়া বলেছেন।

শঙ্কর-প্রচারিত এই মায়াবাদ বিশ্বের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব। তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি, তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তিপ্রয়োগ এবং স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ভাষা তাঁর নৈসর্গিক মনীষার পরিচয় দেয়। এমন বিশিষ্ট দার্শনিকের হাতে যার প্রতিষ্ঠা, সেই মায়াবাদ কিন্তু সোজাসুজি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। তাঁর নিজের ধারণা এই যে তার উৎপত্তি তিনি আবিষ্কার করেছেন উপনিষদের বচন হতে। উপনিষদের দর্শনকে একটি সমগ্র রূপ দেবার জন্য মহর্ষি বদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। শঙ্করাচার্য এই উপনিষদগুলির এবং তথা ব্রহ্মসূত্রের ওপর ভাষ্য লেখেন। এই ভাষ্যগুলির ওপরেই তিনি মায়াবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই পরোক্ষভাবে ভাষ্যের মধ্যে তার জন্ম। উপনিষদে প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে তাকে তিনি প্রবর্তিত করেন।

এখন প্রাচীন উপনিষদগুলি মায়াবাদ সমর্থন করে কি না, এ নিয়ে বিশেষ বিতর্ক আছে। অনেক মনীষী স্বীকার করতে প্রস্তুত নন যে তা সমর্থন করে। বাংলার শ্রীচৈতন্যদেব তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে কেমন ক'রে মায়াবাদ সম্পর্কে বিতর্কে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। একবার এক মায়াবাদের সমর্থক পণ্ডিতের দল তাঁর ভক্তি-রসামৃত প্রচারের নিন্দা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে তা বেদান্তের পরিপন্থী। এই নিয়ে তাঁদের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়েছিল। এই বিতর্কের বিষয় ছিল, প্রাচীন উপনিষদগুলি মায়াবাদ সমর্থন করে কি না। শ্রীচৈতন্যের মতে তা করে না; তিনি এই সম্পর্কে এই অনুযোগও করেছেন যে শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে উপনিষদের ঠিক ব্যাখ্যা করেন নি।

এই অনুযোগের কি সত্যাই কোনো ভিত্তি আছে? আমরা প্রথমে এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে চেষ্টা করব। আমরা দেখতে চেষ্টা করব, প্রাচীন উপনিষদ

মায়াবাদকে সমর্থন করে কিনা। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ এই মায়াবাদ-তত্ত্বটির সহিত বিশেষরকম জড়িত হয়ে পড়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা কি সেটিও সেই সূত্রে আলোচনার বিষয় হয়ে পড়বে।

উপনিষদে প্রত্যক্ষভাবে মায়াবাদের সমর্থক কোনো বাণী পাওয়া যায় না। তবে পরোক্ষভাবে মায়াবাদের সমর্থক কিছু বাণী পাওয়া যায়। আমরা প্রথমে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করব।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে নারদ ও সনৎকুমার ঋষির গল্প আছে। তাতে আছে নারদ তাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থী হয়ে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সনৎকুমার এই উক্তিটি করেছিলেন,

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা॥ অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পম্ ॥" (ছান্দোগ্য ॥৭॥২৪॥১॥)

যেখানে অন্যে দেখে না, অন্যে শ্রবণ করে না, অন্যে জানে না, তাই ভূমা; আর যেখানে অন্যে দেখে, অন্যে শ্রবণ করে, অন্যে জানে, তাই অল্প।

অনুভূতিকে সম্ভব করতে হলে দুটি বিভিন্নধর্মী সত্তার প্রয়োজন। একটি জানবার ক্ষমতা রাখে এবং অন্যটি তার জ্ঞানের বস্তু হবার ক্ষমতা রাখে। এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের ভিত্তিতেই বহু ও বিচিত্র বস্তুর সমষ্টি এই বিশ্ব প্রকট হয়। যেখানে এই দ্বৈতবোধ নেই সেখানে এই বিচিত্র বিশ্বের প্রকাশ নেই। দ্বৈতের ভিত্তিতে যার প্রকাশ তার সীমা আছে, কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পরের সীমা টেনে দেয়। দ্বৈতের বাহিরে যা প্রকাশ তা সীমাহীন। তাই তা ভূমা। এখানে দ্বৈতের ভিত্তিতে যে প্রকাশ, তা যে মিথ্যা সে কথা বলা হয় নি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে কিন্তু সে কথা বলা হয়েছে। সেখানে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে এই কথাগুলিই একটু ভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। তা এইরূপ:

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি ইতর ইতরং পশ্যতি ইতর ইতরং শৃণুতে···যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং শৃণুয়াৎ···বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ॥" (বৃহদারণ্যক ॥২॥৪॥১৪)

যেখানে দ্বৈতের মত হয় সেখানে একজন অপরকে আঘ্রাণ করে, একজন অপরকে দেখে, একজন অপরকে শোনে, কিন্তু যেখানে আত্মা ভিন্ন অপর কিছু থাকে না সেখানে কে কাকে আঘ্রাণ করবে, কে কাকে দেখবে, কে কাকে শুনবে, বিজ্ঞাতাকে কে জানবে?

এখানে 'দ্বৈতমিব' কথাটির তাৎপর্য খুব গভীর। 'দুয়ের মত হয়' বলতে মনে হয় যেন যাজ্ঞবল্ক্য বলতে চেয়েছেন দ্বৈতভাবটা ব্রহ্মের প্রকৃত ভাব নয়, তা একটি কৃত্রিম অবস্থার মত। তা যদি হয় তা হলে দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে ব্রহ্মের যে বহু দ্বারা খণ্ডিত ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত বিশেষ রূপের পরিচয় আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় তা যেন ব্রহ্মের ঠিক রূপটি প্রকাশ করে না। শুধু তাই নয়, দ্বৈতহীন অবস্থায় ব্রহ্মের যে রূপটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাকে তিনি 'বিজ্ঞাতা' বলে বর্ণনা করেছেন। তা হলে বিশ্লেষণ করলে তাঁর বচনগুলির মধ্যে ব্রহ্মের প্রকৃত রূপের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাই। প্রথম, তিনি অখণ্ডভাবে এক, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিতরূপ তাঁর প্রকৃত পরিচয় নয়। দ্বিতীয়, তাঁর যা অখণ্ডরূপ তা জ্ঞাতৃরূপী।

এই বাণীগুলির মধ্যেই শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের সহিত অনেকখানি মিল পাওয়া যায়। মায়াদের দুটি বৈশিষ্ট্যের এখানে সমর্থন আছে—ব্রহ্মের অখণ্ডতা ও চিন্ময়তা। বাকি যে বৈশিষ্ট্যটুকু রইল, ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বের যে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ তার অসারতার এখানে যেন পরোক্ষভাবে সমর্থন জুটে যায়, 'দ্বৈতমিব' এই উক্তিটির মধ্যে।

অপরপক্ষে, উপনিষদের বচনগুলির মধ্যে এমন একটি ভাবধারা পাওয়া যায়, যা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বিচিত্র জগতকে ব্রহ্মের নিজস্ব প্রকাশ বলেই গ্রহণ করা হয়েছে। তা যে দেখার ভুল বা ভ্রান্ত ধারণা বা ব্রহ্মের অপ্রকৃত রূপ, এ ধরণের কোন ইঙ্গিত করা হয় নি। নীচে উদ্ধৃত উপনিষদের বাণীগুলি এই উক্তিকে সমর্থন করবে।

ঈশ উপনিষদের প্রারম্ভেই বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত জগতকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রকাশ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ॥" (ঈশ॥ ১॥) বিশ্বে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত।

ছান্দোগ্য উপনিষদের আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম। তা বলে,

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতে॥" (ছান্দোগ্য॥ ৩॥ ১৪॥ ১॥) এই যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, ব্রহ্মেই তাদের অবস্থিতি এবং ব্রহ্মেই তাদের লয়। এখানে বহু ও বিভিন্ন বস্তুর জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুকে জড়িয়ে নিয়ে ব্রহ্মকে পাই। এখানে খণ্ডকে অস্বীকার করা হয় নি, তাকে খণ্ডরূপেই

ব্রহ্মের কোলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

এই বাণীরই প্রতিধ্বনি আরও একাধিক উপনিষদের বচনে পাওয়া যায়। সেখানে বহুকে বাদ দিয়ে নয়, বহুকে জড়িয়ে সর্বব্যাপী সত্তারূপেই ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই। সব জড়িয়ে, সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন বলেই ত তিনি ব্রহ্ম। তাদের কয়েকটি বচন এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্যই বলেছেন,

"অয়ং ব্রাহ্মণ ইদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি

ভূতানি ইদং সর্বং যদয়মাত্মা॥" বৃহদারণ্যক ॥ ২।৩।৬

এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই বিভিন্ন লোক, এই দেবতারা, এই বিভিন্ন জীব, এই সব কিছুই সেই আত্মা বা ব্রহ্ম। বহুর মধ্যে বহুকে জড়িয়ে নিয়েই ব্রহ্ম বিরাজমান।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তাঁকে সর্ববস্তুতে বিরাজমান দেবতা বলে প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে :

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ ॥ য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥" শ্বেতাশ্বতর ॥ ২ ॥ ১৭ যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, ওষধি ও বনস্পতিতে বিরাজমান, যিনি সমগ্র বিশ্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন তাঁকে প্রণাম জানাই।

যে তত্ত্ব বলে বিশ্ব বহুকে জড়িয়ে একই পরমসত্তার প্রকাশ, একই মহাসত্তা সকল বস্তু, সকল প্রাণী, সকল লোক ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজমান তাকে সর্বেশ্বর-বাদ বলা হয়। কারণ, তা পরমসত্তাকে সকল বস্তুর মধ্যে অপ্রকটরূপে বিরাজমান বলে প্রচার করে। তাঁর অবস্থিতি সৃষ্টির মধ্যে বিশিষ্ট আকারে কোথাও নাই। সর্বত্র ছড়িয়ে তিনি আছেন। উপরের বচনগুলি এই সর্বেশ্বর-বাদের সমর্থন করে। তা রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের জগতকে পরমসত্তার সহজ প্রকাশ বলেই গ্রহণ করে, তাকে বিবর্তিত রূপ বলে অস্বীকার করে না।

উপনিষদে প্রচারিত এই তত্ত্বটিকে তার মূল ভাবধারা বলে গ্রহণ করবার একাধিক সঙ্গত কারণ দেখা যায়। এবার সেই কারণগুলির উল্লেখ করবার সময় হয়েছে।

উপনিষদের দর্শনের যে পরিবেশে জন্ম তার ফলে সর্বেশ্বরবাদই তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা সমর্থনযোগ্য কিনা বিচার করতে

হলে উপনিষদের দর্শনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উপনিষদ্‌গুলিতে আমরা প্রথম যুগের ভারতীয় চিন্তাধারার পরিণত রূপটি দেখতে পাই। সে চিন্তাধারার সূত্রপাত হয় বেদের যুগে। বেদের শেষ অংশটি জুড়ে অবস্থিত বলেই সম্ভবত উপনিষদের নাম উপনিষদ্। তার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থও তাই। বেদের শেষে বেদের অংশ হিসাবে স্থান পেয়েছিল বলে তাকে বেদান্তও বলা হয়। যে দার্শনিক চিন্তাধারা বেদে অঙ্কুরিত হয়ে বেদে বিকাশ লাভ করেছিল তাই উত্তরকালে উপনিষদের বক্ষে পরিণত রূপটি পেয়েছিল। বেদে যার উৎপত্তি উপনিষদে তার পূর্ণতালাভ সংঘটিত হয়েছিল।

সেই ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি বড় বিচিত্র। প্রকৃতির বক্ষে যেখানে শক্তির বা সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখা গিয়েছে সেখানেই বেদের ঋষি দেবতার অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছেন। এইভাবে দেবতার পদে সূর্য অধিষ্ঠিত হয়েছেন, অগ্নি অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এইভাবে আকাশের দেবতা দ্যৌ এসেছেন, বায়ু এসেছেন। সকালে পূর্বদিকের আকাশ রাঙিয়ে যে সুষমা ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে উষা আবিষ্কৃত হয়েছেন। এইভাবেই বৈদিক যুগে দার্শনিক চিন্তাধারা তথা ধর্মের যুগপৎ বিকাশ সুরু হয়েছে। এই দেবতারা কিন্তু পরস্পর বিশ্লিষ্ট, তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বলবান, কিন্তু কারও মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এইভাবে প্রথম দৃষ্টিতে ঋষির নয়নে বিশ্ব বহু-বিচ্ছিন্ন শক্তির অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলে প্রতিভাত হয়েছে।

পরের অবস্থায় দেখা যায়, এই বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট দেবতা-সমষ্টি বেদের ঋষিকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। তাঁরা প্রকৃতির বক্ষে শৃঙ্খলার রাজত্ব দেখেছেন। সে উপলব্ধির সঙ্গে এই অবস্থার ত খাপ খায় না। তাই এমন এক বিশেষ দেবতার সন্ধান করেছেন যিনি বহু বিভিন্ন দেবতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন ক'রে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারেন। তিনি শুধু শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন না, তাঁর অতিরিক্ত কাজ হবে ধর্মের পথে সকলকে পরিচালিত করা। এই বিশেষ দেবতার অনুসন্ধানের চেষ্টায় শেষে বরুণের মধ্যে এই প্রয়োজনীয় গুণগুলি আবিষ্কৃত হল। তাঁকে তাই অতিদেবতার পদে অধিষ্ঠিত করা হল। তিনি সকল দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাই তাঁকে বলা হল 'ধৃতব্রত'। তিনি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করেন। তাই তাঁর নাম হল 'ধর্মস্য গোপ্তা'। এইভাবে বহুবিশ্লিষ্ট দেবতা হতে এক অতিদেবতার উপলব্ধি এল। একেশ্বরবাদ জন্ম লাভ করল।

বেদের যুগের উত্তরকালে এই চিন্তাধারা আরও বিকাশলাভ করেছিল।

একেশ্বরবাদের ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি হতে স্বতন্ত্র, সৃষ্টির বাহিরে তাঁর আলাদা প্রকাশ। এই অবস্থা পরবর্তী যুগের ঋষির মনে সন্তোষজনক ঠেকে নি। তিনি আরও গভীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হলেন। তিনি প্রশ্ন তুললেন :

ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুত আবভূব ॥

এই সৃষ্টি কোথা হতে হল? তাঁর সন্দেহ হল স্বর্গে যিনি ঈশ্বর আছেন তার ভাগ্যনিয়ন্তারূপে, তিনিই হয় ত বা তা জানেন না।

যোঽস্য ধাতা পরমে ব্যোমন্
স বায়ং বেদ যদি বা ন বেদ ॥
যিনি এর স্রষ্টা ঊর্দ্ধতম আকাশে আছেন,
তিনিই হয় ত বা জানেন না।

এই প্রশ্নের ফলে গভীরতর অনুসন্ধান সুরু হল। তার সমাপ্তি হল এক নূতন উপলব্ধিতে যা বলল ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বস্তু হতে স্বতন্ত্র নন, তাঁর আলাদা প্রকাশ নেই, বিশ্বই তার প্রকাশ, বিশ্বই তাঁর দেহ। ঋগ্বেদের শেষের অংশে বিশেষ ক'রে দশম মণ্ডলে এই প্রশ্ন ও তার অনুসন্ধানের পরিণতির কথা লেখা আছে। পরিণতিতে পরমসত্তা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলেন। তাঁকে নাম দেওয়া হল 'পুরুষ' এবং বলা হল বিশ্বের সব কিছু জড়িয়ে তাঁর প্রকাশ। ঋষি গাইলেন :

পুরুষ এবেদং সর্বম্ ॥ ঋগ্বেদ ॥ ১০॥৯০॥২
এইসব কিছুই পুরুষ।

বৈদিক যুগে যে দার্শনিক চিন্তাধারা অঙ্কুরিত হয়েছিল তা এইভাবে ক্রত বিকাশ লাভ করেছিল। প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির বহুবিস্লিষ্ট শক্তির মধ্যে বহু দেবতার আবিষ্কার, দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁদের মধ্যে সংযোগ ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে এক-দেবতা-বাদের জন্ম এবং তৃতীয় অবস্থায় সেই দেবতার সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট বিশ্বের নিগূঢ় সম্বন্ধের ভিত্তিতে সর্বেশ্বরবাদের আবির্ভাব। ঋগ্বেদের চিন্তাধারায় এই ভাবে সর্বেশ্বরবাদের মূল রূপটি ধরা পড়ে গিয়েছিল।

এই পরিবেশের মধ্যেই উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ। অপরিণত রূপে সর্বেশ্বরবাদকে উপনিষদ্ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গিয়েছিল। এই সর্বেশ্বরবাদ উপনিষদের আলোচনার মধ্যে আরও বিকাশ লাভ ক'রে পরিণত রূপটি পেয়েছে। ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে সে ক্ষেত্রে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে সর্বেশ্বরবাদই উপনিষদের মূল চিন্তাধারা।

শুধু তাই নয়। উপনিষদের আলোচনার মধ্যেই আমরা আরও দেখি যে, যে অবিমিশ্র একসত্তাবাদ শঙ্করাচার্য প্রচার করেছেন তার সম্ভাবনার কথাও আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনার ফলে উপনিষদের ঋষির মনে এই উপলব্ধি এসেছে যে পরমসত্তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যহেতুই তিনি অবিমিশ্র একত্ব পরিহার ক'রে দ্বৈতের ভিত্তিতে বহু ও বিচিত্রের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে পরমসত্তার সব থেকে প্রকট রূপটি হল তাঁর আনন্দরূপ। ব্রহ্মকে সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে :

আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি ॥ ঐতরেয় ॥
যিনি আনন্দরূপ এবং অমৃতরূপে প্রকট।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে পরম-সত্তাকে রসস্বরূপ বলা হয়েছে :

রসো বৈ সঃ ॥ রসং হ্যেবায়ং লব্ধা-
নন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরীয় ॥২॥২৭
তিনি রস স্বরূপ। রস উপলব্ধি ক'রে
তিনি আনন্দ পান।

এখন রস উপলব্ধি হয় কি ক'রে? অবিমিশ্র একত্বের মধ্যে ত রস উপলব্ধির অবকাশ নেই। রসের ধারা বইতে হলে চাই দু'এর প্রয়োজন। দু'এর জানাজানি, দু'এর পরিচয়, দু'এর প্রীতি—এদের অবলম্বন ক'রেই ত রসের ধারা বয়। যেখানে একমাত্র দ্বৈতবিহীন সত্তা বর্তমান সেখানে রস বয় না, সেখানে আনন্দ-উপলব্ধির অবকাশ নেই।

এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই উপনিষদের ঋষি একদিন বলেছিলেন ব্রহ্ম একদা সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠরূপেই এক ছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি রস পেলেন না। সেইজন্য নিজের প্রকৃতিগত বৃত্তির বিকাশের গরজেই তিনি বহু হলেন। তা না হলে তাঁর আনন্দরূপটি প্রকাশ হয় না যে।

সে কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে প্রথম অবস্থায় ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় রূপেই ছিলেন।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ বৃহদারণ্যক ॥১॥৪॥৩
এই ব্রহ্ম একাই পূর্বে ছিলেন।

কিন্তু এক থাকলে যে তাঁর রসোপলব্ধি হয় না, তাঁর আনন্দরূপ প্রকট হয় না।

তাই ঋষি বললেন :

স বৈ নৈব রেমে ৷ বৃহদারণ্যক ৷৷১৷৪৷৩

একা একা তাঁর ভালো লাগল না।

সেই কারণে তিনি দু'এর ভিত্তিতে প্রকাশ নিতে চাইলেন। ঋষি বলেছেন :

স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ৷ বৃহদারণ্যক ৷৷১৷৪৷৩

তিনি দ্বিতীয়কে ইচ্ছা করলেন।

তখন তিনি নিজেকে দুই করলেন। তখন জ্ঞাতা এল জ্ঞেয় এল, দ্রষ্টা এল দৃশ্য এল, শ্রোতা এল শ্রোতব্য এল, ঘ্রাতা এল ঘ্রাতব্য এল—এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে-ভরা বিচিত্র বিশ্ব এল।

ব্রহ্মের স্বকীয় তৃপ্তির জন্যই এমন ঘটল। তা না হলে তাঁর আনন্দরূপটি প্রকাশ হত না যে। তখন বিশ্ব জুড়ে দ্বৈতসঙ্গীতের ধারা ছড়িয়ে পড়ল। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভিত্তিতে বিশ্বসত্তা আপন চক্ষে আপনি ধরা পড়লেন। তখন আনন্দের উৎস উৎসারিত হল। বিশ্বের সবকিছু মধুসিক্ত হল। তাই উপনিষদের ঋষি গাইলেন :

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু ৷

অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু ৷ বৃহদারণ্যক ৷৷২৷৫৷১

এই পৃথিবী সকল জীবের নিকট মধুস্বরূপ।

এই পৃথিবীতে সকল জীব মধুস্বরূপ।

এই পৃথিবী যেমন সকল প্রাণীর নিকট মধুস্বরূপ, সকল প্রাণীও তেমনি পৃথিবীর নিকট মধুস্বরূপ। সেই দ্বৈতসঙ্গীতের আনন্দবন্যায় প্লাবিত হয়েই এরা সব মধুময় হয়ে উঠল। উপনিষদের ঋষি গেয়ে উঠলেন :

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ৷ বৃহদারণ্যক ৷৷৬৷৩৷৬

বাতাস মধু ছড়াচ্ছে, নদীর বক্ষে মধুর ধারা

চলেছে, রাত্রি ও উষা মধু দিয়ে ভরা,

পৃথিবীর ধূলি মধুময়।

এই বাতাস, এই নদী, এই রাত্রি, এই উষা, এই পৃথিবীর মাটি—এই সব কিছু জড়িয়ে, সব কিছুকে মধুসিক্ত ক'রে যে-সত্তা প্রকাশ হয়েছেন তাঁকে উপনিষদের ঋষি অভিবাদন জানালেন "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" বলে।

আমাদের উপরের আলোচনার ফল কি দাঁড়ায় তা বিবেচনা করবার সময়

হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন ছিল উপনিষদের বচনে কি শঙ্করাচার্য-প্রচারিত মায়াবাদের সমর্থন আছে? এবিষয়ে আমরা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। আমরা উপরের আলোচনা হতে যা পাই তা সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই। উপনিষদে এমন কতকগুলি বচন আছে যা শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত মায়াবাদকে সমর্থন করে। অপর পক্ষে, উপনিষদ্ যে পরিবেশে বিকাশ লাভ করেছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গেলে দেখা যায় যে সেখানে এমন একটি মূল ভাবধারা গড়ে উঠেছে যা বহুকে জড়িয়ে নিয়ে পরমসত্তার একত্ব প্রচার করে। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ অবিমিশ্র একবাদের পক্ষপাতী। কিন্তু এই মূল ভাবধারাটি সর্বেশ্বরবাদের পক্ষপাতী। সব দিক বিবেচনা করলে মনে হয়, এই সিদ্ধান্তই যেন যুক্তিসঙ্গত হবে যে মায়াবাদের বীজ উপনিষদে আছে, কিন্তু উপনিষদ্ বরমাল্য দিয়েছে সর্বেশ্বরবাদের গলায়।

এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের মন্তব্যই যেন সমর্থিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের সপ্তম পরিচ্ছেদে তাঁর সহিত অদ্বৈতবাদীদের বিতর্কের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাঁর এই মন্তব্যের সমর্থনে তিনি যে মূল যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন তা সেখানে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে:

উপনিষদ্ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যাবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।
গৌণবৃত্তে যেবা ভাষ্য করিলা আচার্য।

ব্রহ্মসূত্র হল বেদান্তদর্শনের সঙ্কলন-গ্রন্থ। তার প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে হবে উপনিষদের বচনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে। শুধু তাই নয়, বেদান্তদর্শনের সঠিক ব্যাখ্যা করতে হলে আরও একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। উপনিষদে যে চিন্তাধারা মুখ্যস্থানীয়, যে ভাবধারা মূল স্থান অধিকার ক'রে আছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাতেই ব্যাখ্যা সঠিক হবে, তার উৎকর্ষ বাড়বে। অপরপক্ষে যদি গৌণ ভাবধারাই ব্যাখ্যার মূল অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে তা সঠিক ব্যাখ্যা হবে না। এই হল মোটামুটি শ্রীচৈতন্যের মত। তাই তিনি খেদ ক'রে বলেছেন যে দুর্ভাগ্যক্রমে শঙ্করাচার্য,

গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া।

শঙ্করাচার্যের সহিত শ্রীচৈতন্যের এই মতানৈক্য ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়। বর্তমান যুগের আর এক মনীষী, মনে হয়, খানিকটা প্রত্যক্ষভাবে খানিকটা পরোক্ষভাবে এই বিতর্কে যোগ দিয়ে ফেলেছিলেন। ইনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। এই বিতর্কের বিষয়টির দুটি দিক্ আছে। একটি হল

উপনিষদের ব্যাখ্যার সম্পর্কে, অপরটি হল দার্শনিক প্রতিপাদ্য হিসাবে। উপনিষদের মূল ভাবধারা মায়াবাদকে সমর্থন করে কিনা এইটি হল প্রথম দিক্। মায়াবাদ যুক্তিসম্মত মত কিনা, এইটি হল দ্বিতীয় দিক্। শ্রীচৈতন্য তাঁর নিজস্ব যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা প্রথম দিক্টি সম্বন্ধে এবং সে সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মত হল উপনিষদের ভাবধারা মায়াবাদকে সমর্থন করে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এই প্রশ্নের দুটি দিক্ সম্পর্কেই। উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর অভিমত শঙ্করাচার্যের মত হতে বিভিন্ন। আমাদের এই প্রতিপাদ্যটি এইবার বিস্তারিত ভাবে দেখাবার সময় হয়েছে।

বেদে যে-চিন্তাধারা দেবতার সন্ধানে প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে ঘুরে এক মহাসত্তার আবিষ্কার করেছিল তাই উপনিষদে বা বেদান্তে সর্বেশ্বরবাদে পরিণতি লাভ করেছিল। বেদে যে-সর্বব্যাপী সত্তা আবিষ্কৃত হয়েছিলেন বেদের ঋষি তাঁকে 'পুরুষ' বলেছেন। পুরুষ-সূক্তে তাঁর বর্ণনা আছে। সেখানে কল্পনা করা হয়েছে যে, তিনি আকারে এত বিরাট যে সমস্ত বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রেও তাকে ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন। বেদের পুরুষ-সূক্তের এই ঈশ্বরই উপনিষদে 'ব্রহ্ম' বা 'ভূমা'তে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি সব কিছু জড়িয়ে আছেন বলেই তিনি ব্রহ্ম, তিনি সবার থেকে বড় বলেই তিনি ভূমা। একটা কথায় সর্বত্র জোর দেওয়া হয়েছে যে বিশ্বের মাঝখানে, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেই তাঁর প্রকাশ, কারণ তাদের পরিব্যাপ্ত ক'রেই ত তিনি বিরাজমান। শঙ্করাচার্য কিন্তু সেই ব্রহ্মকে বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁর উপর অবিমিশ্র একত্ব আরোপ করেছেন। এই ব্যাখ্যাকে শ্রীচৈতন্য যেমন সমর্থন করেন নি, রবীন্দ্রনাথও তেমন করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁকে এক এবং দ্বিতীয়-বিহীন রূপে দেখা মানে তাঁর প্রকৃত রূপকে গ্রহণ না ক'রে তার এক বিমূর্ত রূপ গ্রহণ করা। বস্তুময় বিশ্বকে যেমন বৈজ্ঞানিক গণিতশাস্ত্রের সূত্রে রূপান্তরিত করেন, এও তেমনি জিনিষ। এ ব্যাখ্যা বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় দেয় না। তিনি তাই বলেছেন :

"এই সর্বব্যাপী দেবতা পরিণত হলেন একটি নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বতে; যা ছিল বাস্তব তা রূপান্তরিত হল একটি দার্শনিক সংজ্ঞায়, যেমন বর্তমান কালের বিজ্ঞানে বস্তু গণিতের মধ্যে অন্তর্ধান করে। এঁদের মতে ব্রহ্মকে মন দিয়ে জানা যায় না, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, ঠিক যেমন চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বস্তুর দশা হয়।"

(রিলিজিয়ান্ অব্ ম্যান্)

রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস এটি অপব্যাখ্যা। যে সত্তা সর্বব্যাপী, যাঁর প্রকাশ সব কিছুর মধ্য দিয়ে, তাঁকে ত ধ্যান বা চিন্তার একটি মানসিক সংজ্ঞায় পরিণত করা যায় না। তাঁর প্রকাশ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। উপনিষদের বাণীতেই আছে তিনি ঊর্ধ্বে-অধে, পশ্চাতে-সামনে, দক্ষিণে-উত্তরে সর্বত্রই সব কিছুর মধ্যে প্রকট হয়ে রয়েছেন। তিনি তাই বলেছেন :

"প্রকাশ কোন্‌খানে? এই-যে চারি দিকে যাহা দেখিতেছি তাহাই যে প্রকাশ। এই-যে সম্মুখে, এই-যে পার্শ্বে, এই-যে অধোতে, এই যে ঊর্ধ্বে—এই-যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ-যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ-যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে।—স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। এই ত প্রকাশ, এ ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?"

(ধর্ম)

যেহেতু তিনি শঙ্করের ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারেন নি ঠিক সেই হেতু তিনি মায়াবাদকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় তাই তার প্রতিকূল অনেক উক্তি পাওয়া যায়। সেই উক্তিগুলিতে যেমন মায়াবাদের যুক্তি প্রয়োগ হয়েছে, তার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে, তেমন সোজা-সুজি তাকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলে প্রত্যাখ্যানও করা হয়েছে। এখানে দু-একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

গৌড়পাদই মায়াবাদের স্থাপয়িতা। তাঁর কাছে তার সপক্ষে যে যুক্তিটি বেশ প্রবল বোধ হয়েছিল তা হল আমাদের স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। স্বপ্নের অবস্থায় যে মন স্বপ্ন দেখে সেই মনই যা দেখে তা সৃষ্টি করে; স্বপ্নে দেখা জগতের বাস্তব রূপ নেই, তা কল্পনা-স্থানীয়। স্বপ্নাবস্থার এই বৈশিষ্ট্যই মায়াবাদের মূল প্রেরণা। তার ভিত্তিতেই গৌড়পাদ সিদ্ধান্ত করেছিলেন জাগ্রত অবস্থার জগতও স্বপ্নাবস্থার জগতের মত অলীক এবং মায়ার রচনা। তাঁর কারিকা হতে উদ্ধৃত নীচের বচনটি তার সমর্থন করবে। তিনি বলেছেন :

"যেমন স্বপ্নে দ্বৈত ভাবাপন্ন হয়ে মন মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমন জাগ্রত অবস্থাতেও মন মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি সন্দেহাতীত যে, মন একক হয়েও স্বপ্নে দ্বৈতভাবাপন্ন হয়। তেমনি এও সন্দেহাতীত যে, জাগ্রত অবস্থায় যা অদ্বয় তা দ্বৈতভাব-সংযুক্ত হয়।"

(গৌড়পাদ কারিকা ॥ ৩ ॥ ৪০)

এই যুক্তির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে প্রশ্ন তুলেছেন :

তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে, থাকে,
আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে
আর নাই ?

* * *

চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশি শুনি চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা
অভিসার ?
ব'লো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ
মায়ার ছলন,
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন
কাহার স্বপন ?

(কড়ি ও কোমল)

বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপ্ন ত বিশ্বসত্তারই স্বপ্ন। তা হলে কি আর তা স্বপ্ন থাকে, তাই ত বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

তাই কবি শুধু প্রশ্ন ক'রেই ক্ষান্ত হননি। এ তত্ত্বকে ভ্রান্ত ধারণা বলে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ধারণা পরমসত্তার কোনো স্বার্থ নেই একটি মায়া রচনা ক'রে মানুষকে প্রবঞ্চনা করার। তিনি তাই খেদোক্তি ক'রে বলেছেন :

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে—
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে !
লয়ে কুশাঙ্কুরবুদ্ধি শাণিতপ্রখরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে
মিথ্যা ব'লে জানিয়াছ বিশ্ববসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।

(সোনার তরী)

রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় ঋতুর সাজি নিয়ে প্রকৃতি এই যে আমাদের নয়ন রঞ্জন করছে, মহত্ব নীচতা হাসিকান্না জড়িয়ে মানুষ যে আমাদের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করছে, এর মধ্যেই তিনি পরমতম প্রকাশের আস্বাদ পেয়েছিলেন বলেই

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির পথ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর ধারণা সংসার তাঁকে বদ্ধ করছে না, মুক্ত করছে। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে, প্রিয়জনের প্রীতির মধ্য দিয়েই ভগবানই আমাদের আকর্ষণ করছেন। এই অর্থেই তিনি সন্ন্যাসমার্গের প্রতি আকৃষ্ট হন নি। ভোগাসক্তি তাঁর প্রেরণা নয়। এই ইন্দ্রিয়গোচর ধূলির পৃথিবীর মধ্যেই পরমসত্তার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ তাঁর প্রেরণা। এই অর্থেই তিনি বলেছিলেন :

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা-বর্ণ-গন্ধময়।

(নৈবেদ্য)

উপনিষদে একটি বচন আছে যা বলে, ব্রহ্মের দুটি অবস্থা আছে। একটি দ্বৈতবিহীন এক অবস্থা যেখানে ব্রহ্ম একাই বিরাজ করেন একমাত্র চিন্ময় সত্তা রূপে। সে অবস্থায় প্রীতি করবার কেউ নেই, জানবার কেউ নেই, দেখবার কেউ নেই। বলা হয়েছে এই নিঃসঙ্গ একাকিত্ব ব্রহ্মের ভালো লাগল না। 'স একাকী ন রেমে'। তাই তিনি ঠিক করলেন 'আমি বহু হব'। তখন তিনি নিজেকে বহু করলেন। তখন জ্ঞাতা এল জ্ঞেয় এল, দ্রষ্টা এল দৃশ্য এল, শ্রোতা এল শ্রোতব্য এল, ঘ্রাতা এল ঘ্রাতব্য এল, এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে-ভরা বিচিত্র বিশ্ব এল। এই ভাবেই বিশ্বসত্তার আপন মাধুরী আপন চক্ষে ধরা পড়ল। তখন পান্নার রঙ হল সবুজ, চুনির রঙ হল রাঙা, মেঘে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের কিরণ সাত রঙে রঙীন হল। তখন বাতাসের স্পর্শ ঠেকল মিষ্টি, রজনীগন্ধার সুবাস লাগল ভাল। তখন পাখীর গান কানে লাগল মধুর। তখন মানুষের চোখের সামনে বিশ্বের সুন্দর রূপটি ধরা পড়ে সার্থক হয়ে উঠল। তখন বিশ্বদেবকে মানুষ অভিবাদন জানাল 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' বলে। আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যাকে দেখি তাই ব্রহ্মের আনন্দময় ও অমৃতরূপ।

দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে ব্রহ্মের এই মূর্ত অবস্থার মনোহরণ রূপটি উপনিষদের ঋষিকে যেমন আকৃষ্ট করেছিল রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়কেও তেমনি মুগ্ধ করেছিল। তার প্রশস্তি রচনা ক'রে তিনি একটি কবিতা লিখেছেন। এই সম্পর্কে সেটির

কিছু অংশ উদ্ধৃত ক'রে পাঠকদের উপহার দেওয়া যেতে পারে।

ব্রহ্মের যে অবস্থায় নিঃসঙ্গ একাকিত্ব বিরাজমান সেখানে তিনি শান্ত, নিঃসঙ্গতা-হেতু তিনি রসভোগে বঞ্চিত। অপর পক্ষে, যে রূপটি দ্বৈতবোধের দ্বারা খণ্ডিত সেখানে তা মধুসিক্ত, বৈচিত্র্যে ভরা এবং রসমণ্ডিত। সেই কারণে ব্রহ্ম রসের সন্ধানে দ্বৈতভাবে প্রকাশ নেবার জন্ম স্বভাবতই উন্মুখ। অদ্বৈতবাদী দার্শনিক কিন্তু তা বোঝেন না, তিনি তাঁকে রূপহীন, অব্যয় সত্তার পোষাক পরিয়ে রাখতে উন্মুখ হন। কবি তাই বলছেন :

তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না—
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়।

(শ্যামলী)

যিনি অসীম তিনি মানুষের সীমানায় সাধনা করছেন তার কারণ আছে। কারণ হল সম্পূর্ণ একাকিত্ব তাঁর ভালো লাগল না। তাই যিনি অসীম, যিনি ব্রহ্ম, তিনি সাধনা ক'রে দ্বৈতবোধ স্থাপন করলেন। উপনিষদেও আছে তিনি এই কারণে তপস্যা করেছিলেন।

দ্বৈতবোধ স্থাপন করতে তপস্যা করতে হয় বৈকি! তা যে দুর্লভ সম্পদ, তাই তা সাধনার জিনিস। সেই তপস্যার ফল কি হল? তা উপরে উদ্ধৃত কবিতার পরের অংশে কবি বলেছেন :

সেই আমির গহনে আলো-আঁধারে ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস ;
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে, সুখে দুঃখে।

কারণ, দ্বৈতভাবের মধ্যেই পরমসত্তার রসের রূপটি প্রকাশ পায়। সেই অবস্থাতেই বর্ণ ও বৈচিত্র্যে ভরা, বহুকে জড়িয়ে নিয়ে এই স্থূল বিশ্বের অভ্যুদয় হয়। তা স্থূল বলে কিন্তু অবহেলার বস্তু নয়, তা বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সেইজন্যই পরমসত্তার তাকে পেতে সাধনা করতে হয়। তবেই ত এই বহু দ্বারা খণ্ডিত বিশ্বের বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশের পথ পায়। এই দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতা ও

আন্তব্য সমন্বিত দ্বৈতবোধ দ্বারা খণ্ডিত বিশ্বের মাহাত্ম্যের বর্ণনায় তাই আমাদের কবির রচনা মুখর হয়ে উঠেছে। এই কবিতারই অন্য অংশে তিনি তাই বলেছেন :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।

দ্বৈতভাবে যে প্রকাশ তা কতখানি ঐশ্বর্যমণ্ডিত তা খুব ভালো রকম বোঝা যায় অদ্বৈত অবস্থার সহিত তার তুলনা করলে। কথায় বলে, দাঁত থাকতে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। এও সেই রকম। দ্বৈতবিহীন রূপটি তুলনায় কত হীন তা বোঝাতে কবি দ্রষ্টারূপী মানুষকে বিশ্বের বক্ষ হতে সরিয়ে নিলে পরমসত্তার কি করুণ দশা হয় তা দেখিয়েছেন। সে অবস্থায় পরমসত্তা তাঁর নিঃসঙ্গ একাকিত্ব নিয়ে শুষ্ক গাণিতিক তত্ত্বে পরিণত হবেন :

মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।

(শ্যামলী)

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের দ্বৈতরূপটির গলায় বরমাল্য দিয়েছেন। তা না হলে ব্রহ্মের আনন্দরূপটি প্রকাশ হয় না যে। দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে পরস্পরের সংঘাতে যে দ্বৈতসঙ্গীত রূপ নেয় তাই ত রূপ, রস, বর্ণ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের সম্মিলিত রসপ্রবাহ বিশ্বকে আনন্দসিক্ত করে। উপনিষদে যাঁকে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' বলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই বিশ্বসত্তার প্রকৃত প্রকাশরূপে গ্রহণ করেছেন।

তাঁর বর্ণাঢ্য ভাষায় তার সুন্দর বর্ণনা তাঁর রচিত কবিতার মধ্যে। সেটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা"

(স্মরণ)

এ বিষয় রবীন্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্যের সহিত একমত। তার কারণ উভয়েই ছিলেন হৃদয়বৃত্তির উপাসক। শ্রীচৈতন্য ছিলেন ভক্ত। অদ্বৈতবাদের একাকী ঈশ্বরকে ত তিনি ভক্তি নিবেদন করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে প্রকৃতির প্রেমিক এবং ঈশ্বরের সহিত মধুর সম্বন্ধ স্থাপনে উৎসুক। বিশ্বদেবতাকে তিনি হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত করে 'জীবনদেবতা' রূপে অর্ঘ্য দিয়েছিলেন। এই ভাবে উভয়েই সমধর্মী। তাই উপনিষদের মূল ব্যাখ্যাটিকে উভয়েই গ্রহণ করেছিলেন। উভয়েই সেই 'পরম-এক আনন্দে উৎসুকের' আনন্দভাগী হতে চেয়েছিলেন।

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো

মানবিকতা কথাটির গায়ে বিদেশী গন্ধ আছে, কিন্তু তা যা নির্দেশ করে তার সহিত আমাদের সাহিত্য বহু দিন পূর্ব হতেই পরিচিত। বাংলার কবি চণ্ডীদাসের রচনায় তার আস্বাদ আমরা পাই। তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গিতে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। মানবিকতা কথাটির তাৎপর্যও অনেকটা তাই। যিনি মানবিকতাবাদী তাঁর কাছে দেবতা ততখানি আকর্ষণের বস্তু নয়, যতখানি মানুষ। তাঁর নিকট মানুষের প্রতি আকর্ষণ ব্যক্তি হিসাবে নয়, সমষ্টি হিসাবে। চণ্ডীদাসও গেয়েছেন, 'শুন হে মানুষ ভাই।' কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের বা বিশেষ দেশের মানুষ নয়, সারা বিশ্বের সমগ্র মানুষজাতি হল তাঁর ভাই। বাংলার আদিকবির বাণীতে যে সুর ধ্বনিত হয়েছিল, বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির রচনায়ও তার প্রতিধ্বনি পাই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবিকতাবোধ কিন্তু বিকাশ লাভ করেছিল একটি বিচিত্র পথে। তাঁর কাব্যসাহিত্যের দুটি সমান্তরাল চিন্তাধারা আছে। এক সাথেই তাদের জন্ম। এই যুগ্ম-চিন্তাধারার একটি হল তাঁর ধর্মসম্পর্কিত চিন্তা এবং অপরটি হল সেই ভাবধারা যা তাঁর কাব্যে আত্মবিকাশ লাভ করেছে। তিনি নিজেই বলেছেন যে, এই যুগ্ম-চিন্তাধারা প্রথম জীবনে তাঁর অজ্ঞাতে পরস্পরের সহিত বাগ্‌দত্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনে ঘনিষ্ঠ উদ্বাহের সম্বন্ধে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর কাব্য এবং ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা একই পথে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি নিজেই সে কথা লিখে গেছেন এই ভাবে :

"আমার ধর্মজীবন সেই রহস্যময় পথেই বিকাশ লাভ করেছিল যে পথে আমার কাব্যজীবন প্রবাহিত হয়েছে। তারা পরস্পরের সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়েছিল এবং যদিও তাদের মধ্যে বাগ্‌দান দীর্ঘকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা আমার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছিল।"

(রিলিজিয়ান্ অব্ ম্যান্)

কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে যে মানবিকতা গড়ে উঠেছে তার সহিত ভালো রকম পরিচিত হতে হলে এই যুগ্ম-ভাবধারার ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই ইতিহাসের কাহিনী তিন অধ্যায়ে রচিত হয়েছিল। প্রথম অধ্যায়ে দেখি, কবির মন আকৃষ্ট হয়েছে প্রকৃতির প্রতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকৃতির স্থান নিয়েছেন ভগবান, তিনি 'জীবনদেবতা' রূপে কবির হৃদয়ের অধীশ্বর

হয়ে বিরাজ করছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি, ঈশ্বর বিশ্বমানবের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে কবির সেবার পাত্র হয়েছেন। এইবার এই বিভিন্ন অধ্যায়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আবশ্যক।

কাব্যজীবনের প্রথম অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল প্রকৃতি। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন যে তাঁর কবিমানস 'তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর বৈদিক পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করেছিল এবং গ্রীষ্মের আকাশের এক অতি সুদূরের পিপাসা তার প্রেরণা যুগিয়েছিল'। (রিলিজিয়ান্ অব্ ম্যান্)। এই অধ্যায়ে তিনি ছিলেন প্রধানত প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির বক্ষে নানা সৌন্দর্য বা শক্তির আবিষ্কার তখন তাঁর মনকে আন্দোলিত করত। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-গীতে বিচিত্র তার হৃদয়রঞ্জন রূপ তাঁর মনে শুধু পুলক সঞ্চার করত না, আরও একটি অতিরিক্ত উপলব্ধি এনে দিত। বৈদিক ঋষির মতই প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে তিনি এক প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী সত্তার অস্তিত্বের ইঙ্গিত পেতেন এবং তার নাগাল পাবার জন্য ব্যাকুল হতেন। সেই প্রচ্ছন্ন সত্তা যেন কোন অন্তরালে লুকিয়ে বসে বেণু বাজান আর তাঁর ধেনুরা বিশ্বে নানা স্থানে চরে বেড়ায়। আকাশের নক্ষত্রদল যেন তাঁর আলোক-ধেনু। প্রকৃতির বুকে রঙের বাহার ছড়িয়ে যে অজস্র ফুল ফোটে, তারা যেন তাঁর আলোয়-চরা ধেনু:

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্যতারা দলে দলে—
কোথায় বসে বাজাও বেণু,
চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে॥

(গীতিমাল্য)

যে-মহাশক্তি প্রকৃতির মধ্যে এই ভাবে বিরাজ করছেন তাঁকে তিনি অভিবাদন জানালেন 'নিত্য কালের মায়াবী' বলে, 'নটরাজ' বলে। তিনি এক চঞ্চল, বৈচিত্র্যময়, নৃত্যপর সৃষ্টিপ্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সে নৃত্যের তাল রক্ষা করে ভালো ও মন্দ, হাসি ও কান্না, যৌবন ও জরা, ভাঙা ও গড়া, জন্ম ও মৃত্যু! তাঁর পদক্ষেপের ধ্বনি কবির চিত্তে ধরা পড়েছে। নিত্য যিনি তাঁর চিত্তে নাচেন তাঁর:

হাসি-কান্না হীরা-পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে—
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

(অরূপরতন)

এই বিশ্বব্যাপী সত্তাকে আবিষ্কার ক'রে তিনি চাইলেন তাঁকে প্রেমাস্পদরূপে পেতে। শুধু জানা নয়, তাঁকে পেতে হবে। এই পাওয়ার সাধনাই তাঁর কাব্যে ও ধর্মজীবনের যুগ্ম-ধারার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা করে। কিন্তু প্রশ্ন হল যিনি অতি বিরাট, যিনি সর্বব্যাপী এবং যাঁকে কোনো বিশেষ স্থানে বিশিষ্ট আকারে পাওয়া যায় না, তিনি কি ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে ভক্ত-বিশেষের সহিত প্রীতির সম্বন্ধে বদ্ধ হতে পারেন? আমাদের কবির মতে তিনি তা পারেন, কারণ এই পরম-সত্তার দুটি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের প্রকাশ আছে। নিয়মের রাজ্যে তিনি যেখানে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ। কিন্তু প্রীতির পর্যায়ে তিনি যখন প্রীতির সম্বন্ধে ধরা দিতে উন্মুখ হন তখন তিনি ব্যক্তিত্বের বন্ধনে নিজেকে বাঁধেন বৈকি। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এইভাবে প্রীতির মিলন সম্ভব। এ যুক্তি-তর্কের বিষয় নয়, এটি তাঁর কবি-হৃদয়ের উপলব্ধি। এটি শুধু উপলব্ধি নয়, বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রতীতি-রূপে তা রবীন্দ্রনাথের মনে গড়ে উঠেছিল।

তাঁর এই প্রতিপাদ্যটি বোঝাবার জন্য তিনি একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করেছেন। সূর্য এক বিরাট জ্যোতিষ্ক, আর বিপুল কিরণরাশি মহাকাশকে প্লাবিত ক'রে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র শিশিরকণা ভাবে এই বিরাট সূর্যের সঙ্গে তার কি প্রীতির সম্বন্ধ সম্ভব? সূর্য কত বড়, আর তৃণের আগায় লম্বমান শিশিরকণা কত ছোট। শিশিরকণার মনে তাই তার সম্ভাবনা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ আসে। তাই সে আক্ষেপ ক'রে বলে:

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা!
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে,
করিতে পারি নে সেবা।

(উৎসর্গ)

কিন্তু সূর্য শিশিরবিন্দুর সে সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দেয় তার আচরণ দিয়ে। হোক না বিরাট, সে কি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুকে ক্ষুদ্র বলে অবহেলা করে, সে কি তার আহ্বানে সাড়া দেয় না? তা হলে ভোরের আলোয় শিশিরবিন্দুর বুক

হীরকখণ্ডের মত ঝলমল করে কেন? সূর্য তাই উত্তরে বলে:

আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।'

(উৎসর্গ)

কাজেই কবির কাব্য তথা সাধন-জীবনের এই অধ্যায়ে পরমসত্তার সহিত মিলনের আকুতিই মূল বিষয় হয়ে পড়েছিল। তাঁকে পাবার জন্ত তীব্র আকুলতা, তাঁকে না পাওয়ার প্রাণান্ত বেদনা এবং অবশেষে তাঁকে পাওয়ার চরম আনন্দ তাঁর এই যুগে রচিত কবিতার মূল প্রেরণা। তাঁর 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র এই অনুভূতিগুলিই হল বিষয়বস্তু। কবি বাংলার বাউল-সাধকদের মত পরমসত্তাকে আবিষ্কার করলেন নিজের হৃদয়ের মধ্যে। তিনি তখন গাইলেন:

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি,
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানে চাই নি।

(গীতিমাল্য)

তাঁদের মতই তিনি তাঁকে ডাকলেন 'মনের মানুষ' বলে। তাঁকে হৃদয়ের মন্দিরে স্থাপন ক'রে তাঁর নাম দিলেন, 'জীবনদেবতা'। তাঁর রূপ নেই, তাই তাঁকে দেখা যায় না। তিনি আড়াল থেকে ভালবাসেন। কাজেই হৃদয়ের মন্দিরে অন্ধকার গহনেই সেই অরূপরতনকে বরণ করতে হয়। কবি তাঁকে অন্তরতম রূপে পেয়ে তাঁর চরণপ্রান্তে তাঁর বক্ষ, দলিত দ্রাক্ষাসম নিঙড়ে প্রীতির অর্ঘ্য দান করলেন। এই মিলনে তিনি হলেন অনন্ত আনন্দের অধিকারী।

পরমসত্তার সহিত এই মধুর প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে তুলেও কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্তি পাননি। এতে হৃদয়বৃত্তি তৃপ্তি পেয়েছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু 'জীবনদেবতা'কে সেবা করবার আকুতি তাঁর অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। কারণ বাস্তবরূপে ত সেই পরমসত্তার নাগাল তিনি পান নি। তাঁর ধর্ম ও কাব্যজীবনের শেষ অধ্যায়ে তাই দেখি, এই সেবার আকুতিই তাঁকে অন্তরের মিলনক্ষেত্র হতে সংসারে বিশ্বমানবের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে এনেছিল। পরমসত্তাকে সেবা করবার আকুতিকে ভিত্তি করেই রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা-বোধ গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু যাঁকে সেবা করব তাঁর একটি বিশেষ প্রকট রূপ না হলে ত তাঁকে সেবা করা যায় না। অথচ বাহিরের বিশ্বে পরমসত্তার বিশেষ আকারে প্রকাশ নেই, তিনি যে সবাইকে নিয়ে সবার মাঝখানে লুকিয়ে আছেন। সেই কারণেই ত কবি তাঁকে 'অরূপরতন' বলেছেন। তিনি অন্ধকার ঘরের রাজা, তাই দৃশ্যমান জগতে, প্রকাশ্য আলোকে তাঁকে দেখতে চাইলে মেকি রাজাকে মানুষ দেখে বসে। 'অরূপরতন' ও 'রাজা' এই রূপক-নাট্য দু'টির নায়িকা সুদর্শনার ভাগ্যে তাই ঘটেছিল।

সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল কোন্ রূপে তাঁকে সেবা করব। কবি বললেন, এই পরিস্থিতিতে তাঁকে সেবা করতে হবে সেই রূপে যে রূপে তিনি মানুষের নিকট ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ হয়েছেন। সে রূপটি হল তাঁর মতে মানুষের রূপ, কোনো বিশেষ মানুষ নয়, সমগ্র মানবজাতির রূপ। বিশ্বের মানবের মধ্যেই আমাদের নিকট পরমসত্তার ঘনিষ্ঠতম ভাবে প্রকাশ। এই কথাটি বোঝাবার জন্য তিনি একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেন, নারীর নানা ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা ভাবে প্রকাশ। কোথাও নারী কন্যা, কোথাও সখী, কোথাও মাতা; কিন্তু সন্তানের নিকট তাঁর ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ মাতা রূপেই। এখানেও সেই রকম বিশ্বসত্তার নানা রূপে প্রকাশ, কিন্তু বিশ্বমানব-রূপে তাঁর প্রকাশই মানুষের নিকট ঘনিষ্ঠতম। তাঁর কাছে সেবা পৌঁছে দিতে হলে বিশ্বমানব-রূপেই তাঁর সেবা করতে হবে। সুতরাং বিশ্বমানবের মধ্যে তাঁর যে রূপ প্রকট সেখানেই আমাদের সঙ্গে তাঁর সেবার ক্ষেত্রে মিলন সম্ভব—মন্দিরে নয়, বিজনে নয়, আপন মনে নয়। কবি তাই অন্তরতমের সহিত সেবার সম্বন্ধে মিলনের জন্য বিশ্বের বুকে ফিরে এলেন, এসে মানুষের মধ্যে তাঁকে ঘনিষ্ঠতম রূপে খুঁজে পেলেন। তাই তিনি গাইলেন :

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার'
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

(গীতাঞ্জলি)

এই ভাবেই মানুষের বিজয়সঙ্গীত ঘোষিত হল। কবি বললেন, পরমসত্তাকে সেবা করতে হবে বিশ্বমানবের মাঝে। বিশ্বমানবের সেবা, বিশ্বমানবের কল্যাণ

৬

সাধন, এই ও হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এইভাবেই তাঁর কাব্য ও ধর্ম-জীবনের যুগ্ম ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা জন্মলাভ করেছিল।

তাঁর মানবিকতা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নয়, তাঁকে স্বীকার ক'রে নিয়েই গড়ে উঠেছে। তাঁকে সেবা করবার আকুতি হতেই তার জন্ম। তাঁর মানবরূপে সেবাই তার আদর্শ। তিনি তাই আমাদের বলেছেন, আমাদের সকলের কর্তব্য 'বিশ্বকর্মা' হওয়া। পুরাণের গল্পের বিশ্বকর্মা হলেন স্বর্গের চীফ্-ইঞ্জিনিয়ার। এখানে সে অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হয় নি। যে কর্ম স্বার্থ-প্রণোদিত নয়, যে কর্ম সকল মানুষের কল্যাণ আনে, তাই হল বিশ্বজনীন কর্ম। এই বিশ্বজনীন কর্ম যে মানুষ করে সেই হল বিশ্বকর্মা। যে মানবিকতার আদর্শ অন্তরে পোষণ করে এবং কর্মে প্রতিফলিত করে সেই বিশ্বকর্মা।

এই চিন্তাধারাই আর একটু পরিবর্তিত হয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যে আরও সুন্দর রূপ নিয়েছিল। তা বলে সার্বজনীন কর্ম ত মানুষের ধর্ম বটেই, কিন্তু যে কর্ম দলিত অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের কাজে লাগে, তা আরও উৎকৃষ্ট। কারণ, তাদের মধ্যে পরমসত্তার বিশেষ প্রকাশ। তাঁকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সেবা করা বৃথা, কারণ তিনি ত মন্দিরে নেই, তিনি আছেন দরিদ্র শ্রমজীবীর মধ্যে, কঠোর হাড়ভাঙা পরিশ্রমে যার দিন কাটে :

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।

(গীতাঞ্জলি)

শুধু দরিদ্র শ্রমজীবী নয়, ঈশ্বর বিশেষ ক'রে স্থান নিয়েছেন যারা সব-হারা তাদের মাঝখানে। কারণ তিনি যে দীনের সঙ্গী। রিক্ত, ভূষণ-হীন, দীন-দরিদ্রের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। তাই ধনে, মানে যারা সুখে আছে তাদের মাঝখানে তাঁর সন্ধান করা বৃথা। কবি তাই গেয়েছেন :

ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি—

সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

(গীতাঞ্জলি)

সেই জন্ম সার্বজনীন কর্মের প্রশস্ত ক্ষেত্র হল দরিদ্র ও অবহেলিত মানব যারা পড়ে রয়েছে, তাদের মাঝখানে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত এই মানবিকতা এমন ক্ষেত্র নির্বাচন ক'রে নেয় যেখানে বিশ্বজনীন কল্যাণকর্মের সর্বাপেক্ষা সার্থক পরিণতি ঘটে।

এই হল রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্মবাণী তথা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের ধর্মসাধনার চরম উপলব্ধি। যে যুগ্ম-ভাবধারার কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে যাত্রা সুরু হয়েছিল, পরিণতিতে তা অর্ঘ্য রচনা শেষ করেছিল বিশ্বমানবের সেবার বাণী শুনিয়ে।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি আর শ্রেষ্ঠ কবির মাঝখানে এই মর্মবাণী যেন একটি সেতু রচনা করেছে। তা যেন তাঁদের যোগ-সূত্র স্বরূপ। বাংলার আদিকবি গেয়েছিলেন :

শুন হে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি গাইলেন :

ওরে মানুষ আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।

বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এই তত্ত্বটি যেন বিচিত্র পথে আত্মবিকাশ লাভ করেছে। তা উন্নীত হয়েছে এই উপলব্ধিতে যে বিশ্বমানবের মধ্যেই বিশ্বনাথের ঘনিষ্ঠ প্রকাশ, সব-হারাদের সেবায় উৎসর্গীকৃত বিশ্বজনীন কর্মই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এইভাবে দেখা যায় বাংলার আদিকবির মূল বাণীটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পূর্ণতম রূপটি পেয়েছে। যা ছিল বীজের আকারে তা পত্রপুষ্প-শোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

শিশুসাহিত্য

শিশুসাহিত্য বলে কিছু থাকতে পারে কিনা তাই নিয়েই সাহিত্যিক মহলে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন শিশুসাহিত্য বলে কিছু থাকতে পারে না। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। তাঁর এই মতের সপক্ষে প্রধান যুক্তি হল এই যে শিশুসাহিত্য বলে স্বীকৃতি পেতে হলে শিশুরই সে সাহিত্যের রচয়িতা হওয়া চাই। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয় তখন শিশুসাহিত্য বলে কিছু থাকতে পারে না।

কিন্তু বহুকাল ধরে শিশুসাহিত্য বলে যা চলে আসছে, তা শিশুর জন্য বয়স্ক মানুষের রচিত সাহিত্য। শিশুর উপভোগের জন্য রচিত বলেই তা শিশু-সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ ক'রে এসেছে। এখন কি তা হলে এ সাহিত্যকে শিশুসাহিত্য বলবার আমরা অধিকারী হব না? এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে খুব সবল কোনো যুক্তি আছে বলে ত মনে হয় না। আমরা শিশুদের ব্যবহারের জন্য বাজারে জামা কিনতে যাই; তা বানায় বয়স্ক দরজি। আমরা কি সেই কারণে বলব যে তা শিশুর জামা নয়, যেহেতু শিশুরা তা বানায় নি? আর বয়স্করা ত শিশুসাহিত্য রচনার ভার গায়ে পড়ে গ্রহণ করেন নি। তাঁরা গরজে পড়েই তা করেছেন। তা না হলে শিশুসাহিত্য রচনার মত কঠিন কাজের দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করবেন কেন? যেমন শিশুর জামার প্রয়োজন আছে তেমন সকল কালেই ক্রম-বর্দ্ধমান শিশুমনের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির খোরাকের প্রয়োজন আছে। শিশুকে ঘুম পাড়াতে ছড়া বা গানের প্রয়োজন শিশুদের মায়েরা সকল কালেই অনুভব ক'রে এসেছেন। শিশুর কল্পনাশক্তিকে বিচরণের ক্ষেত্র দেবার জন্য সকল কালের ঠাকুরমা ঠাকুরদাদের গল্পের ঝুলি বোঝাই রাখতে হয়েছে। এই মৌলিক প্রয়োজনে চাহিদা মেটানর জন্যই শিশুসাহিত্যের জন্ম হয়েছে।

শিশুসাহিত্য কিন্তু একদিনে হঠাৎ ভূমিষ্ঠ হয়নি। মায়ের জঠরে যেমন ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে শিশু কিছুকাল অতিবাহিত করে, শিশুসাহিত্যেরও তেমন দীর্ঘকাল-স্থায়ী একটি জন্ম-পূর্ব অবস্থা ছিল। তাকে আমরা সাহিত্য-পূর্ব অবস্থা বলতে পারি। তখন তা ছিল লোকশিল্প-রূপে, তা মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে সংরক্ষিত হত, অক্ষরের সজ্জায় তখনও তা স্থায়ী রূপ পায় নি। এই প্রাক্-সাহিত্য-যুগের অবস্থায় তা প্রচলিত হয়েছিল মুখে মুখে ছেলেভুলানো ছড়া আর ঠাকুরমার

বলা গল্প রূপে। মুখে প্রচলিত এই ছড়া ও গল্পই শিশুসাহিত্যের আদিম রূপ। এই কারণেই দেখি, পরবর্তী যুগে শিশুসাহিত্য গড়ে উঠল দুই বিভিন্ন রূপে। একটি হল ছড়ার রূপ, অপরটি হল গল্পের রূপ। ছেলেভুলানো ছড়া প্রধানত দুই শ্রেণীর হতে পারে। একটি হল ঘুমপাড়ানি ছড়া, অপরটি হল শিশুর কল্পনা-শক্তিকে ফুটিয়ে তোলার ছড়া। শিশুকে ঘুম পাড়াবার তাগিদে মা যে ছড়া বলতেন তা সুর করে সঙ্গীত হিসাবেও গাওয়া চলত। এই ভাবেই প্রথম অবস্থায় লোকশিল্প হিসাবে ছেলেভুলানো ছড়া সকল দেশে প্রচার লাভ করেছে। তাদের অনেকগুলি এখন লিখিত আকারে পরিণত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এই ছেলেভুলান ছড়ার লিখিত সংগ্রহ বেশ সমৃদ্ধ। এদের আমরা ঠিক সাহিত্যের মর্যাদা দিতে পারি না। কারণ, তাদের প্রচার ছিল মুখে-মুখে; পুরুষ-পরম্পরায় এইভাবেই সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। তা ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, গোষ্ঠির রচনা। তাদের লোকশিল্প হিসাবে গণনা করাই বিধেয়। এই লোকশিল্পই পরিণত আকারের শিশুসাহিত্য হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে।

শিশুসাহিত্যের যা অপর শাখা সেই গল্প-সাহিত্যও অনুরূপভাবে লোকশিল্প হতেই জন্মলাভ করেছে। লোকশিল্প-রূপে তা ছিল ছেলেভুলানো গল্প। ঠাকুরমা-ঠাকুরদার মুখে-মুখে তা ঘুরত নাতি-নাতনীদের চিত্তবিনোদনের কাজে। ছেলে-ভুলানো ছড়ার যে রূপ ঘুমপাড়ানী গান হিসাবে প্রচলিত ছিল তা কোলের শিশুর বিশেষ সেবায় লাগত। যারা গল্প শুনে আনন্দ পায়, তারা মায়ের কোল ছেড়ে অনেকখানি বড় হয়েছে। অক্ষর-জ্ঞান হয়ত পায় নি, তবে গল্প শুনে উপভোগ করবার বয়স তাদের হয়েছে। এ-শ্রেণীর শিশুরা তুলনায় বয়সে বড়। তারা সন্ধ্যাবেলায় চিত্তবিনোদনের জন্য ঠাকুরমা বা ঠাকুরদা বা দিদিমা বা দাদামশায়ের কাছে আবদার ধরত গল্প শোনবার। মায়েদের ত পাওয়া যেত না, কারণ তাঁরা গৃহকর্মে ব্যস্ত। দিদিমা-ঠাকুরমারা তখন একরকম সংসার হতে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে অবসর খুঁজে পেয়েছেন। কাজেই গল্প বলে এই শ্রেণীর শিশুদের চিত্তবিনোদনের দায়িত্বটা তাঁদের গ্রহণ করতে হত। এমন কি ঠাকুরদা-দাদামশাইরাও অব্যাহতি পেতেন না। এই ভাবেই লোকশিল্প হিসাবে ছোটদের গল্প বলার রীতি দেশে দেশে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী যুগে বিশিষ্ট লেখকরা তাদের লিখিত আকারে রূপ দিয়ে নিজেদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখানেও গল্পগুলির রচয়িতা গোষ্ঠি, ব্যক্তিবিশেষ নয়। তার লিখিত রূপ যিনি দিয়েছেন তিনি তাকে সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করেছেন। যিনি তার সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন তিনি ঠিক তার রচয়িতা

বন। কোন কোন সাহিত্য এইভাবে বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছে।

তার কয়েকটি উদাহরণ এই সম্পর্কে দেওয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদার ঝুলি' দুই অমূল্য গ্রন্থ। শৈশবে সীতা দেবী ও শান্তা দেবী বাড়ীর ঝিয়ের মুখে প্রবাসে যে হিন্দুস্থানী গল্প শুনে অবসর বিনোদন করতেন তাদের সংগ্রহ ক'রে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন 'হিন্দুস্থানী উপকথা'য়। তা বাংলার শিশুদের হৃদয় জয় করেছে। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ছিলেন ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষ। তিনিও বাংলাদেশে প্রচলিত শিশুদের গল্প সংগ্রহ ক'রে ইংরেজিতে লিখেছিলেন, 'ফোক্ টেলস অব্ বেঙ্গল'। তাও সাহিত্যসমাজে বিশেষ সমাদৃত গ্রন্থ। এমন কি বাংলায় ছেলেভুলানো গল্পের শেষে যে ছড়াটি বলে গল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করবার রীতি আছে, সেই ছড়াটিরও ইংরেজি অনুবাদ ক'রে এই গ্রন্থে সাদরে স্থান দিয়েছেন। 'গ্রীম'রা ছিলেন দুই জার্মাণ ভাই। তাঁদের লেখা বিখ্যাত ছোট ছেলেদের গল্পের বই 'হাউস মেরশেন' বলে খ্যাত। তারও কাঁচা মাল সংগ্রহ হয়েছে অনুরূপ ভাবে প্রৌঢ়দের মধ্যে প্রচলিত ছেলেভুলানো গল্প হতে। এই পথেই পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশে গল্প-সাহিত্যের শাখাটি গড়ে উঠেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশুসাহিত্যের আলোচনা দুটি প্রধান বিভাগে করা যুক্তিসঙ্গত। আমরা সেই ভাবেই আলোচনা করবার প্রস্তাব করি। প্রথমে গল্পের বিষয় আলোচনা ক'রে, পরে কবিতার বিষয় আলোচনা করব।

শিশুদের জন্য রচিত গল্প-সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় দেখা যায় গল্পগুলি নীতি-মূলক হত। সম্ভবত লেখকদের মনে ধারণা জন্মেছিল যে শিশুদের জন্য রচিত গল্পে চিত্তবিনোদনের সঙ্গে নীতিশিক্ষা সংযুক্ত করা উচিত। এর প্রধান দৃষ্টান্ত হল ঈশপের গল্পগুলি। তারা সম্ভবত বয়সে যেমন প্রাচীন, গুণেও তেমন এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ঈশপের জীবনকাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৬২০ হতে ৫৬০ অব্দ পর্যন্ত। কিন্তু আমরা যে-আকারে তাঁর সংকলনটিকে পাই, তার মূলের সহিত অনেক পার্থক্য। এটির বর্তমান রূপ দিয়েছিলেন প্লানিউড্স নামে এক পাদরি, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। তাতে যেমন ঈশপের রচিত গল্প স্থান পেয়েছিল তেমনি ভারতীয় গল্পও স্থান পেয়েছিল। সম্ভবত তাতে 'পঞ্চতন্ত্রে'র কিছু গল্পও অনুপ্রবেশ লাভ করেছে।

এই সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থখানির কথা এসে পড়ে। এটিও এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তার গল্পগুলির পরিবেশের সহিত আমরা

ভারতীয়রা বেশ সুপরিচিত। কাজেই তার বিস্তারিত উল্লেখের এখানে প্রয়োজন নেই। 'পঞ্চতন্ত্রে' পশুপক্ষীদের মধ্যে কথোপকথন ও তাদের নিয়ে ঘটনার ভিত্তিতে সুন্দর নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই ধরণের গল্পের বীজ উপনিষদে আছে। সেখানেই পশুপক্ষীর মধ্যে নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে বাক্যালাপের নিদর্শন প্রথম পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে গল্প আছে, রাজহংসদের মধ্যে দার্শনিক আলোচনা চলেছে। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণেই সম্ভবত বৌদ্ধযুগে জাতকের গল্পগুলির প্রচার হয়। আমাদের 'পঞ্চতন্ত্রে'র বয়সও কম নয়। তাকে সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আর এক শ্রেণীর শিশু-গল্পসাহিত্য আছে যার ভিত্তি হল প্রাচীন মহাকাব্যগুলি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের বহু কাহিনী রচিত হয়ে শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সেইরকম বিভিন্ন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ইলিয়ড ও ঈনীয়ডে বর্ণিত নানা কাহিনী শিশু-গল্পসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণ' ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের রামায়ণ' এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

এগুলি কিন্তু প্রকৃত শিশুসাহিত্য নয়। প্রকৃত শিশু-গল্পসাহিত্যের নিদর্শন হল রূপকথা। রূপকথা কল্পনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় এবং তা চিত্তবিনোদনের সঙ্গে নীতি-শিক্ষণের রীতিকে পরিহার ক'রে চলে বলেই শিশুসাহিত্য হিসাবে সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এখানে লেখকের রচনা-শৈলী কল্পনাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেবার অবকাশ পায়। শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে এই শ্রেণীর গল্পের আবির্ভাব হয়েছিল দেরীতে। সম্ভবত তার কারণ হল নীতিভিত্তিক গল্পের আদর্শের প্রভাব হতে মুক্ত হতে কিছু সময় লেগেছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যে এই শ্রেণীর গল্পের প্রথম আবির্ভাব হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে। কিন্তু প্রথম আবির্ভাবেই তা গুণে এমন উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছিল। এই সম্পর্কে কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরাজী সাহিত্যে রস্কো রচিত 'বাটার ফ্লাই বলস' প্রকাশিত হয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে। ডেনমার্কের হান্‌স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসনের গল্পগুলির আবির্ভাব হয় একই সময়ে। তাদের ইংরাজী অনুবাদ প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৪১ সালে। তাঁর রচিত গল্পগুলির অন্যতম 'কুশ্রী হাঁসের বাচ্চা' এবং 'বুনো রাজহাঁস' এখনও বিশ্বের কোটি কোটি শিশুর মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হচ্ছে। একই যুগে ফরাসী সাহিত্যে শার্ল পেরোল-এর গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত

'সিনড্রেলা' 'বুট-পরা পুষি' গল্পের এখনও শিশুমহলে একচ্ছত্র আধিপত্য অক্ষুণ্ণ আছে।

সম্ভবতঃ লিউয়িস ক্যারোল-এর 'জাদুর দেশে এলিস' কাহিনী একই শ্রেণীতে পড়ে। তাঁর আসল নাম ছিল ডজ্‌সন। এখানে যে রূপকথার পরিচয় পাই তার আস্বাদ ছিল কিন্তু স্বতন্ত্র ধরণের। এ বইখানি নানা আজগুবি ঘটনার মধ্য দিয়ে এমন রসমণ্ডিত রচনার বিন্যাস করেছে যে শিশুহৃদয় জয় করবার ক্ষমতা তার চিরস্থায়ী হবে বলে মনে হয়।

এই শ্রেণীর কাহিনীর আবেদন বিশ্বজনীন। এখানে যে উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সমকক্ষ রচনা-সৃষ্টি বড় কঠিন কাজ। বাংলা সাহিত্যে তার সমস্থানীয় রচনা খুঁজে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না। সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল'কে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনের রচনা বলে সম্ভবত তা তেমন উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি। সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' এই শ্রেণীতে পড়ে। তার ওপর এলিসের গল্পের প্রভাব যেন বেশ প্রকট।

আমরা এবার শিশু-কাব্যসাহিত্যের কথা আলোচনা করতে পারি। তাদের সাহিত্য-পূর্ব রূপ হল ঘুমপাড়ানি গান ও ছেলেভুলানো ছড়া। প্রথমে তা ছিল মুখে মুখে প্রচলিত। পরে তাদের লিখিত আকারে স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়েছে। তার পরের যুগের সাহিত্যিকরা শিশুর উপভোগের উপযুক্ত মৌলিক কাব্য রচনা করেছেন। এই রচনায় কল্পনাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ফলে তাদের বৈচিত্র্যের সীমা নেই। এসব রচনায় নীতিশিক্ষার বালাই নেই, সত্য মিথ্যার বাচ্‌বিচার নেই। ফলে শিশুসাহিত্য বিকাশলাভের অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে। শিশুদের মনে বুদ্ধিশক্তি বা নীতিবোধ ভালরকম বিকাশ লাভ করবার পূর্বেই সৌন্দর্যবোধ পরিস্ফুট হয়। ফলে আজগুবি রচনাকে অবলম্বন ক'রে যে রস পরিবেশন হয়, তাকে গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা হয় না। অপর পক্ষে বুদ্ধিশক্তি অপরিণত থাকায় তাদের সত্য ও মিথ্যার ভেদবুদ্ধি তেমন পরিস্ফুট থাকে না। সেইজন্য আজগুবি কাহিনী তাদের নীতিবোধকে মোটেই খর্ব করে না। শিশুর মন বয়স্ক মানুষ হতে আজগুবি কাহিনীর রস গ্রহণ করতে বেশী উপযুক্ত।

যাকে বলা হয় 'ননসেন্‌স্‌' বা অর্থহীন কবিতা তাকেও আমরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা রূপকথা-শ্রেণীর সাহিত্যের সমস্থানীয়, তবে তাদের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রথম দৃষ্টান্ত

হল এডোয়ার্ড লিয়ার-এর 'বুক অব্ ননসেন্‌স্'। এই গ্রন্থে তিনি এক নূতন শ্রেণীর কবিতার ব্যবহার করেছেন। তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'লিমারিক'। তাঁর রচিত একটি 'লিমারিক' উদাহরণ হিসাবে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

There was young lady of wilts
Who walked up to Scotland in stilts.
When they said it was shocking
To show so much stocking,
She answered, 'Then what about kilts' ?

বাংলা সাহিত্যে এই শ্রেণীর কবিতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। তা হল সুকুমার রায় রচিত ছড়ার বই 'আবোল তাবোল'। তার কতগুলি সংস্করণ বেরিয়েছে নজর করলেই বোঝা যাবে তা কতখানি জনপ্রিয়। তা শুধু শিশুমহলেই প্রিয় নয়, যুবক বৃদ্ধ ও বনিতা-মহলেও সমান প্রিয়। মনে হয় তা যেন সুকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন। এই কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দিতে মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন :

"যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়ালরসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"

এখানে এই খেয়ালরসের একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা গেল না। একটি ছড়া আছে :

মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম
হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা
কাগের বাসায় বগের ডিম।

এই ধরণের কবিতা রচনায় ইংরাজি সাহিত্যে লিয়ুয়িস ক্যারোলও বেশ পটু ছিলেন। তাঁর রচনার স্বাদেরও একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। উদাহরণ-স্বরূপ 'আজব দেশে এলিস' গ্রন্থ হতে নীচের কবিতাটি উদ্ধৃত হল :

Speak roughly to your boy
And beat him when he sneezes.
He only does it to annoy
Because he knows it teases.

শিশু-কাব্যসাহিত্য চরম বিকাশ লাভ করেছিল রবার্ট লুই ষ্টিভেন্‌সন্ ও রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বজয়ী কবিদের লেখনীর জাদুস্পর্শে। ষ্টিভেন্‌সন্‌-এর 'এ চাইল্‌ড্‌স্ গার্ডেন অব্ ভার্সেস্' আর রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' এই শ্রেণীতে আসে। এই ত্রয়ীকে নিয়ে এমন একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বিশ্বসাহিত্যে পাওয়া যায় যার উৎকর্ষ অনন্যসাধারণ।

এখানে যেটি লক্ষ্য করবার বিষয় তা হল এই যে উভয় কবিরই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ নূতন এবং একধরণের। তাঁরা শিশুর মন দিয়ে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি হতে জগতটা যেমন দেখায় কাব্যে তাকেই প্রকাশ দিতে চেষ্টা করেছেন। ফলে আমরা পাই এমন কবিতা যা কাব্যশক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব হলে শিশু সম্ভবত নিজেই লিখে বসত। তাদের উৎকর্ষের কারণও বোধ হয় তাই। প্রমথ চৌধুরী শিশুসাহিত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এই শ্রেণীর কবিতা বোধ হয় তার সব থেকে কাছাকাছি যায়।

শিশুর জাতটা যে আমাদের বয়স্ক মানুষদের জাতি হতে কত পৃথক তা রবীন্দ্রনাথ খুব ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। আমরা থাকি নিয়মের রাজ্যে, সত্যের বন্ধনে আশে পাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ। আমাদের চোখ যা আজগুবি তা কল্পনা করতে ভয় পায়, কারণ তা সত্যের নিয়মকে লঙ্ঘন করে। আমাদের কল্পনাশক্তি নিয়মের শাসনে এমনি নিস্তেজ হয়ে গেছে যে ঘরের দেয়ালের বাহিরে আমাদের দৃষ্টিশক্তি আমাদের নিয়ে যেতে পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা বয়স্করা যেন জগৎপিতার পাঠশালার পড়ুয়ার মত :

আমরা থাকি জগৎ-পিতার
বিদ্যালয়ে—
উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা
দেয়াল লয়ে।
জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে চলে
সূর্য শশী,
নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে
রশারশি।

(শিশু)

আর শিশুর ক্ষেত্র হল স্বতন্ত্র। তার জন্য নিয়ম-বাঁধা পাঠ নেই। সত্য-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম ক'রে তার হৃদয়কে নীরস করতে হয় না। কারণ পরমসত্তার তার প্রতি যেন

বিশেষ পক্ষপাত আছে। তা না হলে গুরুমশাই-বেশে তিনি আমাদের পাঠ পড়াবেন কেন আর শিশুর কাছে অন্তঃপুরের মায়ের বেশে এসে খেলার সম্পর্ক পাতাবেন কেন। তাই জন্তই ত সেখানে নিয়মের বালাই নেই, সেখানে কল্পনা যথেচ্ছ বিচরণ করবার অবাধ সুযোগ পায়। শিশুর জন্ত দেয়ালঘেরা পাঠশালা নয়, প্রকৃতির বক্ষ জুড়ে তার খেলাঘর, আকাশ হল তার ঘরের চাতাল। তাই দেখি :

সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য শশী
তোমার সাথে হাসে যেন
এক বয়সী।
সত্য বুড়ো লাল রঙের
মুখোস পরে
শিশুর সনে শিশুর মতো
গল্প করে।

(শিশু)

তিনি তাই খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে যেতে চেয়েছিলেন যাতে শিশুর নয়নে বিশ্ব কেমন লাগে তা ঠিক বোঝা যায়। তাঁর অপরিসীম ধীশক্তি, এবং প্রখর কল্পনাশক্তি তাঁর পক্ষে এটা সহজেই সম্ভব করেছিল। সেই কারণেই তাঁর কবিতায় আমরা শিশুমনের সকল নিয়মছাড়া খেয়ালের ছবিটি অবিকল প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পাই। খোকার মনের মাঝখানটিতে জগতটি কেমন দেখায় তা তাই তিনি এমন সুন্দর ভাবে বর্ণনা করতে পেরেছেন :

খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁষে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টিশেষে
সকল উদ্দেশ-হারা
সকল ভূগোল-ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে।

(শিশু)

এ বিষয় রবীন্দ্রনাথ ও ষ্টীভেন্‌সনের দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি একধরণের ছিল তা বুঝতে উভয় কবির রচনা হতে দু'একটি উদাহরণ এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

সকল শিশুরই মনে মনে একটা অভিযোগ থেকে যায় যে যারা বয়স্ক ব্যক্তি তারা স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করতে পারে, ইচ্ছামত যা খুশী তাই করতে পারে, কিন্তু শিশুদের জন্ম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। অভিভাবক তাদের ওপর কতরকম বিধিনিষেধ আরোপ করেন। সময়মত খেতে হয়, সময়মত শুতে হয়, সময়মত পড়তে হয়, কত কি। কাজেই এই বিধিনিষেধের শৃঙ্খল হতে মুক্ত হবার একটা প্রবল ইচ্ছা শিশুর মনে জাগে এবং এই ইচ্ছাকে পূরণ করতে তার অতি শীঘ্র বড় হয়ে যাবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। বড় হবার সুবিধা পেয়ে তারা কিন্তু বড়দের মত আচরণ করতে চায় না, তাদের শিশুমনের ইচ্ছাগুলিই পূরণ করতে চায়। তারা চায় দেহে বড় হতে যাতে শিশুসুলভ ইচ্ছাপূরণের অবাধ স্বাধীনতা পায়। এটি বয়স্কদের চোখে সামঞ্জস্যহীন ঠেকলেও শিশুদের নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি। দেখতে আশ্চর্য লাগে যে ষ্টিভেন্‌সন্‌ ও রবীন্দ্রনাথের শিশু-বিষয়ক রচনায় তাঁরা উভয়েই এই একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন।

ষ্টিভেন্‌সন্‌-এর 'এ চাইলড্‌স্‌ গার্ড্‌ন অব্‌ ভার্সেস্‌' থেকে একটি ছোট চার লাইনের কবিতা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সেটি হল এই :

When I am grown to man's estate
I shall be very proud and great,
And tell the other girls and boys
Not to meddle with my toys.

শিশুমনের আকুতির সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে এখানে। শিশু তাড়াতাড়ি বড় হতে চায়, কিন্তু যখন বড় হবে তখন করবে কি ? না, খেলনা নিয়েই খেলে চলবে বিনা-বাধায়, কারণ বড় হয়েছে বলে কেউ আর তাকে বাধা দিতে পারবে না। এই খানেই তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় হবার সুবিধা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য হতে এরূপ একাধিক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। তার একটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'শিশু'তে 'ছোটোবড়ো' নামে একটি কবিতা আছে। কবিতার যিনি নায়ক তিনি এখানে তাঁর মনের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। নায়কের একটি দাদা আছে। সেই দাদা অনেক সুযোগ-সুবিধা পায় যা হতে সে বয়সে ছোট বলে বঞ্চিত। তার আশা যে সে যখন হুস্‌ ক'রে বড় হয়ে গিয়ে বাবার মত হবে তখন সে দাদার সুবিধাগুলো নিজে ভোগ করবে আর নিজের অসুবিধাগুলো দাদার ভাগে বরাদ্দ

করবে। বেচারীর খেয়াল নেই যে সে যখন বেড়ে চলবে তার দাদা থেমে থাকবে না, আগে আগে বেড়ে চলবে। এই কবিতাটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। খোকা বলছে:

এখনো ত বড়ো হইনি আমি,
ছোটো আছি ছেলেমানুষ ব'লে।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে।

দাদাকে পিছনে ফেলে রেখে আমাদের বালক-নায়ক বড় ত হলেন, কিন্তু বড় হয়ে তিনি করবেন কি? তিনি করবেন নিজেকে দাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত:

দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,
পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তারে এমনি বকে দেব!
বলব, 'তুমি চুপটি ক'রে পড়ো।'

আর কি করব? না—

তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পুষব পাখীর ছানা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর শিশু-বিষয়ক রচনা পাই যেখানে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গির আরও জটিল রূপ ধরা পড়েছে। আমাদের বালক-নায়কের যেমন একটি দাদা আছে, তেমন একটি ছোট বোনও আছে। ছোট বোন মানসিক বিকাশের যে স্তরে পৌঁচেছে তা আমাদের নায়কের স্তর হতে অনেক নীচে। আর দাদা যে স্তরে পৌঁচেছে তা তার কিছু ওপরে। দাদার একে অভিজ্ঞতা বেশী তার ওপর ইস্কুলে পড়ে কিছু কিছু নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করেছে যা আমাদের নায়কের নাগালের বাহিরে। কিন্তু তা হলে কি হবে? আমাদের নায়ক, দাদার সঙ্গে তর্কে হার মানতে প্রস্তুত নন। সাধ্যমত নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাদার ইস্কুল-হতে-পাওয়া তথ্যগুলিকে যুক্তি দিয়ে তিনি ধূলিসাৎ করবার চেষ্টার ত্রুটি করেন না। ফলে, এই যুক্তিগুলির প্রয়োগ এমন নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা যেমন কৌতুকপূর্ণ, তেমন মধুর। দু' একটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত ক'রে আমাদের প্রতিপাদ্যকে সমর্থন করা যেতে পারে।

'বিজ্ঞ' শীর্ষক কবিতায় খুকির তুলনায় তিনি যে কত বুদ্ধিমান তা আমাদের

নায়ক খুকির ত্রুটি-বিচ্যুতির নানা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। একটা উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে :

খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারী ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠেছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুষ।

(শিশু)

'জ্যোতিষ শাস্ত্র' কবিতায় পাই দাদার সঙ্গে তর্কের উদাহরণ। আমাদের নায়ক বুঝি বলেছিলেন যে পূর্ণিমায় চাঁদ যখন সন্ধ্যাবেলায় কদমগাছের ডালে আটকে পড়ে তখন তাকে কেউ ধরে আনতে পারে কিনা। দাদা তাই নিয়ে ঠাট্টা ক'রে তাকে বোকা বলেছিল, কারণ ইস্কুলে পড়ে সে এই জ্ঞান আয়ত্ত করেছে যে চাঁদ পৃথিবী হতে দু'লক্ষ মাইলেরও দূরে থাকে। কাজেই তাকে ধরা যায় না। আমাদের নায়ক-মহাশয়ের তাই হয়েছে ভীষণ রাগ। নিজের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অজ্ঞতার কথা তিনি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তাই তিনি নিজের নানা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুক্তি দিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের তত্ত্বকে খণ্ডন করেছেন।

সমস্ত কবিতাটিরই বিষয়বস্তু হল এই। দাদা যখন বলল যে চাঁদকে ধরবার মত ফাঁদ পাওয়া যাবে না, খোকা উত্তর দিল, কেন যাবে না? যেমন দেখা যায় তাকে ত ফুটবলের মতন ছুটো হাতে দিব্যি ধরে আনা যায় মনে হয়।

দাদা যখন উত্তরে বলল যে চাঁদ দূরে আছে বলে ছোট দেখায়, আসলে তা ছোট নয়, কাছে আসলে মস্ত বড় দেখাত, ছোট ভাই সে কথা মেনে নিতে চাইল না। তার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে যা যুক্তি দেখাল তা যেমন কৌতুকপূর্ণ তেমন মাধুর্যমণ্ডিত। তার কথাই এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

আমি বলি, 'কী তুমি ছাই
ইস্কুলে যে পড়!
মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নিচু,
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড় কিছু।'

আমাদের নায়কের দুঃখ এই যে এমন অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও দাদা তাকে বোকা বলেছিল।

লক্ষ্মীর অভিশাপ

প্রথম আবির্ভাবের দিনে ধরণীর বক্ষে মানুষ একান্ত লক্ষ্মীহীন হয়েই স্থাপিত হয়েছিল, জীবধারার ক্রমবিকাশের শেষ-পরিণতি হিসাবে মানুষ যে দিন পৃথিবীর কোলে জন্ম নিল সেদিন তার কোন সম্পদ ছিল না। তার না ছিল বাসের আশ্রয়-স্থল, না ছিল শীতাতপ নিবারণের জন্ম আচ্ছাদন, না ছিল অন্নের ভাণ্ডার। জীবিকার জন্ম যাযাবরের মত এখানে ওখানে ঘুরে তার আহার সংগ্রহ করতে হত। মাটি খুঁড়ে মূল আহরণ, বৃক্ষ হতে ফল আহরণ বা শিকারবৃত্তি অবলম্বন ক'রে পশুহনন তার ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মানুষ গুহায় বাস করত বা গাছের তলায় আশ্রয় নিত। অন্ত নানা জন্তুপ্রাণী জীবদের সহিত তুলনায় তার জীবন অতি হীন ছিল। তার থেকে বলবান অনেক হিংস্র জীব ছিল যাদের সর্বক্ষণ পরিহার ক'রে তার আত্মরক্ষা করতে হত। বাঘের কাছে তখনকার দিনে তার অবস্থাটা বর্তমান যুগে হরিণেরই সামিল। পৃথিবীতে প্রাধান্ত স্থাপন করা দূরের কথা, কোনোরকমে আহার সংগ্রহ ক'রে আত্ম-গোপন ক'রে টিকে থাকতে পারলেই নিজেকে সে যথেষ্ট ভাগ্যবান মনে করত।

এহেন লক্ষ্মীহীন জীবের মধ্যেই কিন্তু এমন সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত ছিল, যা তার ভাবী জীবনকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার মস্তিষ্ক-শক্তি তুলনায় অন্ত জীব হতে বেশী ছিল। তাই ভাববার, চিন্তা করবার শক্তি সে আয়ত্ত করতে পেরেছিল। সে ভাষা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। তার ফলে যেমন ভাবের আদানপ্রদান করা সম্ভব হয়েছিল, তেমনি বস্তুনিরপেক্ষভাবে চিন্তা করবার শক্তি তার হয়েছিল। সঙ্গে ছিল তার দুটি মুক্ত হাত, তা যেমন স্পর্শ-শক্তি সংযুক্ত, তেমন পাঁচটি অঙ্গুলিবিশিষ্ট হওয়ায় সূক্ষ্ম কাজ করবার উপযুক্ত। তার বুদ্ধিশক্তি এই দুটি হাতকে ব্যবহারের জন্ম পেয়েছিল। এই দু'য়ের সংযোগে সে তার বিকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিল।

এই দুটি বস্তুকে সম্বল করে লক্ষ্মীহীন মানুষের লক্ষ্মীলাভের অভিযান শুরু হয়েছিল। জীবনকে সুখকর করবার জন্ম যার কিছুই নাই তার সব উপকরণই সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে নিজের বুদ্ধির সাহায্যে।

আহার ও আচ্ছাদনই সবার থেকে মৌলিক সমস্যা। তাই তাতেই নজর পড়েছিল প্রথম; ফল-মূল আহরণ ও ক্ষুদ্র পশু-শিকারই প্রথমে তার অন্নসমস্যার

সমাধানের উপায় হয়েছিল, কিন্তু তাতে বেশী দিনের মত খাদ্য সংগ্রহ ক'রে রাখা যায় না। শিকারী পশু-শিকারে সাফল্য লাভ করে প্রকৃতিদত্ত অস্ত্রের সাহায্যে। শারীরিক বল ত তাদের আছেই, তার উপর তাদের দেহ ধারাল দাঁত এবং নখর দ্বারা সজ্জিত, সেও যদি অনুরূপ অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে তা হলে শিকারে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা তার সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

এইভাবে সুরু হল তার শিকারের অস্ত্রনির্মাণের জন্য সাধনা। প্রকৃতি তাকে এবিষয়ে সাহায্য করে নি। নিজের জীবনধারণের উপকরণ তার নিজে উৎপাদন করতে শিখতে হবে, ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা তার আয়ত্ত করতে হবে। অস্ত্রের কাঁচা মাল কি হবে? হিংস্র জীবের নখর ও দন্ত কঠিন পদার্থে নির্মিত অথচ ধারাল। প্রকৃতির বক্ষে ছড়ান নানা কাঁচা মালের মধ্যে অনুসন্ধান করে সে সংগ্রহ করল ছোট পাথরখণ্ড। তা কঠিন পদার্থ। তাকে ঘষে ঘষে ধারাল করা যায়। তা হলে তা হাতিয়ার হতে পারে। তাতে শিকারকে আক্রমণ ক'রে হত্যা করা যেমন সুবিধা, তার দেহ কেটে ছাল ছাড়িয়ে মাংস আহরণেও তার তেমন ব্যবহার হতে পারে। একাধারে তা আক্রমণের অস্ত্র ও কর্তনের যন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। এই ভাবেই মানুষের জীবনের ইতিহাসে প্রস্তর-যুগের সূত্রপাত হয়। হাতিয়ার সংগ্রহের ফলে যেমন তার শিকারবৃত্তি দ্বারা আহার্য সংগ্রহ করা সহজ হল, তেমন নিহত পশুর চর্ম হতে শীতাতপ নিবারণের জন্য বস্ত্রও তার জুটল। ক্রমশ প্রস্তরখণ্ড হতে নানা অস্ত্র নির্মাণে দক্ষতা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার দিন দিন বর্দ্ধিত হল। যে পাথরে ধার বেশী, সেই পাথরের ব্যবহার প্রচলিত হল। পাথরকে ঘষে মেজে শুধু ধারাল ক'রে কখন মানুষ তৃপ্তি পেত না; তার গঠনকে সুন্দর করত, তাকে ঘষে পালিশ ক'রে উজ্জ্বল করত। এই পথে সে প্রাচীন প্রস্তর-যুগ হতে নূতন প্রস্তরযুগে উন্নীত হল। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রস্তর-নির্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। যাদুঘরগুলিতে তাহা সংগৃহীত আছে। নূতন প্রস্তর-যুগের প্রস্তর যে তুলনায় প্রথম যুগের হাতিয়ার হতে সুদৃশ্য ও উজ্জ্বল, তা অনভ্যস্ত চক্ষেও ধরা পড়ে।

মানুষের সম্পত্তি উৎপাদনের এই প্রবল প্রচেষ্টা তাকে শিল্প উৎপাদনে অভিজ্ঞতা দিয়েছিল। শিল্প উৎপাদনের জন্য যে শক্তি তখন তার হস্তগত ছিল তা অতি সামান্য। তার দুখানি হাতই সে শক্তির উৎস। এই হাতের শক্তিই শিল্প উৎপাদনের কাজে তখন তার একমাত্র অবলম্বন। প্রস্তরযুগের মানুষের লক্ষ্য লাভের সাধনায় তার হাতই একমাত্র সহায়ক।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখতে হবে। মানুষ চিরকালই গোষ্ঠীপ্রিয় জীব। সে একা বাস করতে ভালবাসে না। সেকালে গোষ্ঠী ছিল খুব সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ একটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী হত। সেই পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল অতি সরল। জীবনধারণের জন্ম যা কিছু প্রয়োজনীয় সে সবই পরিবারের মানুষই সংগ্রহ করত বা উৎপাদন করত। প্রস্তরের অস্ত্র প্রতি পরিবারের মানুষই উৎপাদন করত। পণ্য হিসাবে তা পাওয়া যেত না। আহার্য-সংগ্রহ পরিবারের বয়স্ক মানুষেরই করতে হত, প্রধানতঃ শিকারবৃত্তি দ্বারা। অন্য কোনো গোষ্ঠীর সংগে লেনদেনের সম্পর্ক তার সম্ভবতঃ ছিল না।

ক্রমশ মানুষ লক্ষ্মীলাভের পথে আরও খানিক এগিয়ে গেল। আগুনের গুণ দেখে দেখে সে একদিন মুগ্ধ হল। অগ্নি শীত হতে পরিত্রাণ করে, হিংস্র পশু হতে মানুষকে নিরাপদ করে। শুধু তাই নয়, সে আবিষ্কার ক'রে বসল আগুনে পাক করা খাদ্য খেতে সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য। তখন সে আগুনকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করল। চকমকি পাথরের সাহায্যে ইচ্ছামত তাকে কিভাবে উৎপাদন করতে হয়, শিখল।

কিন্তু কেবল শিকারবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন তাকে তৃপ্তি দিল না। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য নিত্য শিকারে বাহির হতে হয়। মাংস এমন জিনিস নয় যা দীর্ঘদিন সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়। অন্নসংস্থানে নিশ্চয়তা এ ব্যবস্থা দিতে পারে না। অন্নসংগ্রহের জন্য শিকারের জীবের পশ্চাতে ঘুরতে হয়। কোনো সময় শিকারের জীব দুষ্প্রাপ্য হলে বাসস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই ধরনের জীবনে সত্যই স্বস্তি নাই। এমন কিছু উপায় উদ্ভাবন করা যায় না, যাতে খাদ্যবস্তু ইচ্ছামত উৎপাদন করা যায় এবং সঞ্চয় ক'রে রাখা যায়? আবার এই নূতন পথের সন্ধান চললো। এমন বনজ শস্য আছে যা মানুষের আহার্য হতে পারে। তার বীজ সংগ্রহ ক'রে ভূমি কর্ষণ ক'রে রোপণ করলে শস্য মেলে। সেই শস্য সঞ্চয় ক'রে রাখলে প্রায় এক বছরের মত অন্নসমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

এইভাবেই মানুষ কৃষিজীবী হতে শিখল। কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হওয়ার ফলে মানুষের জীবনে এক নূতন সম্ভাবনার পথ খুলে গেল। শিকারবৃত্তি জীবনে অবসর আনে না। ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমান দল হিসাবেই মানুষের টিকে থাকতে হয়। কিন্তু কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত হবার ফলে এক জায়গায় অবস্থান ক'রেই অন্নসমস্যার সমাধান করা সম্ভব হল। বৎসরে বর্ষা ঋতুতে একবার শস্য উৎপাদন করলেই

দীর্ঘকালের মত অন্নসমস্তার কষ্ট হতে পরিত্রাণ সম্ভব। ফলে যে ছিল যাযাবর, তার এক জায়গায় বসতি স্থাপন করা সম্ভব হল। তখন জনপদ জন্মলাভ করল। যেখানে অনেক পরিমাণ উর্বর ভূমি মেলে, সেখানে অনেক পরিবার একত্র বসতি স্থাপন ক'রে কৃষিকার্যের সাহায্যে জীবনধারণ করতে পারল। ফলে বৃহত্তর গোষ্ঠী স্থাপন সম্ভব হল। মানুষের সমাজ গড়ে উঠল। মানুষ প্রকৃত সামাজিক জীব হল।

কৃষিকার্যে সাফল্যলাভের প্রয়োজনে মানুষের বুদ্ধিশক্তি নূতন পথে পরিচালিত হল। কৃষির সাফল্য নির্ভর করে সেচের ব্যবস্থার উপর। তখন সেচের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত বন্যা বা বৃষ্টির জলের উপর। ঠিক কখন বর্ষা নেমে প্রথম বন্যা আনবে জানা থাকলে ক্ষেতের প্রস্তুতির কাজ সময় মত ক'রে রাখা যায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ পঞ্জিকা আবিষ্কার করেছিল। তার গল্পটি অতি সুন্দর। এই কৃষির যুগের প্রথমে নীলনদের অববাহিকায় মানুষ তখন প্রথম বর্ষার বন্যায় প্লাবিত ভূমিতে শস্য উৎপাদন করতে শিখেছে। কিন্তু ঠিক কোন সময় বন্যা আসবে না জানা থাকলে ত ঠিক সময় শস্য বপন করা যায় না। তখনকার দিনের জ্ঞানী মানুষ নজর করল যে—যখন বন্যা আসে তখন আকাশে শেষরাত্রে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। এই নক্ষত্রটিকেই আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা নাম দিয়েছিলেন লুব্ধক। এটি আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। কালপুরুষ নক্ষত্র-পুঞ্জের দক্ষিণপূর্ব কোণে তার অবস্থিতি। তারা কয়েক বছর নজর ক'রে দেখল যে গড়ে ৩৬৫ দিন পরে এই নক্ষত্র আকাশের সেই স্থানে আসে এবং সেই সময় নীলনদে বন্যা নামে। এই ভিত্তিতেই মিশরবাসীরা মানুষের ইতিহাসে প্রথম পঞ্জিকা বাহির করেছিল।

একস্থানে স্থায়ীবাস এবং অন্নসংস্থান সম্বন্ধে নিশ্চয়তা মানুষের একটি মস্ত বড় সুবিধা এনে দিল। এখন সে ইচ্ছামত অন্ন উৎপাদন করতে পারে। সমগ্র বৎসরের আহার্য সে একসংগে সংগ্রহ করবার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং তার স্থায়ী বসবাসের জন্য এবং শস্যভাণ্ডার সংরক্ষণের জন্য উন্নত ধরণের বাসগৃহের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ফলে সে ইষ্টক নির্মাণ করতে শিখল। ইচ্ছামত নানা প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করল। শস্য রক্ষার জন্য আধার দরকার। তাই পাত্র এবং আধার নির্মাণ করাও তার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। প্রয়োজনের তাগিদে সে কুম্ভকারের চাকা আবিষ্কার করল। তার সাহায্যে মৃত্তিকাকে উপাদান ক'রে সে নানা পাত্র নির্মাণ করল। তাকে অগ্নিদগ্ধ ক'রে শক্ত ও স্থায়ী করল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কত বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্র ও আধার আমরা যাদুঘরে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পাই।

কোনো বিশেষ স্থানে ঘর বেঁধে বাস করা যখন সম্ভব হল, তখন তার আনুষঙ্গিক ব্যাপার হিসাবে মানুষের ভাগ্যে আবার এক নূতন সম্পদ জুটে গেল। সে ঘর বেঁধেছে, সে জনপদের পত্তন করেছে, ক্ষেতের কর্ষণ ক'রে শস্যের ভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে। এ অবস্থায় যে পশুকে হত্যা ক'রে সে পূর্বের যুগে ক্ষুধানিবৃত্তি করত, সেই পশুকে গৃহে পালন করার সুবিধা পেল। এখন সে এই শ্রেণীর পশুকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করতে সমর্থ। ক্ষেত্রজাত শস্যের অনাবশ্যক অংশ হতে তার খাদ্যসমস্যার সমাধান করাও সম্ভব। অপরপক্ষে যেমন শস্যের ভাণ্ডার তার মজুত থাকে, তেমন আহার্য মাংসের ভাণ্ডার হাতের কাছেই সঞ্চিত রূপে পাওয়া যায়। এই ভাবেই বোধহয় গরু, ছাগল, মেষ প্রভৃতি বন্যজীব গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়েছিল। অশ্ব পোষ মেনেছিল বোধহয় তারও পূর্ববর্তীকালে যখন মানুষ যাযাবর ছিল।

পুষ্টির উৎস হিসাবে যদিও তারা সম্পদ আর সমৃদ্ধির পথে মানুষকে অন্য উপায়ে আরও বেশী এগিয়ে দিয়েছিল, আর এক দিক হতে তাদের গৃহপালিত জীবে পরিণত হওয়ার তাৎপর্য অনেক বেশী। সে তাৎপর্য এই হিসাবে যে—তারা মানুষের হস্তে এক নূতন শক্তিকে স্থাপন করেছিল। এতকাল মানুষ নিজ বাহুবল ও দেহের বলের উপর নির্ভর করত নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান বা সম্পদ উৎপাদনের জন্য। এখন হতে গৃহপালিত পশুদের দেহবলও তার আয়ত্ত হল। এইভাবে গরু একটি অতি প্রয়োজনীয় সম্পদে পরিণত হল। তার মাংস মানুষকে খাদ্য জোগাল, আর তার দুগ্ধ শিশুর পানীয় হল এবং তার দৈহিক শক্তি ভূমি-কর্ষণকে সহজ ক'রে দিল। পূর্বে নিজের দৈহিক বলের সাহায্যে মানুষের ভূমি-কর্ষণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন লাঙল উদ্ভাবন ক'রে তাতে গরু জুতে সে বৃহত্তর ক্ষেত্র আরও গভীরভাবে কর্ষণ করবার ক্ষমতা লাভ করল। কৃষি প্রসার-লাভ করল।

এটি বহু উদাহরণের একটি মাত্র। পশুর শক্তিকে অধীনে এনে তাকে মানুষের সেবার কাজে লাগানর কৌশল এইভাবে তার যখন আয়ত্ত হল, তখন এক নূতন সম্ভাবনার পথ মানুষের নিকট অর্গলমুক্ত হল। আরও নানা পশুকে সে পোষ মানাল এবং নানা ভাবে ব্যবহার করতে শিখল। ঘোড়াকে হয়ত আয়ত্ত ক'রে বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের জন্য ইতিপূর্বেই সে বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে

শিখেছিল। এখন ভূমিকর্ষণের কাজেও তাকে লাগাল। সে চাকা আবিষ্কার করল। চাকার সাহায্যে যান নির্মাণ ক'রে আরও সহজে ঘোড়া জুতে ভ্রমণের সুবিধা ক'রে নিল। এইভাবে প্রথম রথ আবিষ্কার হল। হস্তীর মত বিরাটকায় পশুকেও বন থেকে ধরে এনে পোষ মানিয়ে অনুরূপ কাজে নিয়োগ করল। তার বিপুল শক্তি ভার উত্তোলনের কার্যে নিযুক্ত হল।

এইভাবে মানুষ এক নূতন যুগের মধ্যে এসে পড়ল। এতদিন মানুষ তার নিজের বাহু ও দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর ক'রে এসেছে জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য বা কোনো বস্তু উৎপাদনের জন্য। এখন সে এক নূতন শক্তির সন্ধান পেল। ফলে, পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের সম্ভাবনা বা সম্পদ উৎপাদনের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেল। এই নূতন শক্তি তাকে সমৃদ্ধির পথে আরও অনেকখানি এগিয়ে দিল। এখন সে কষ্টসাধ্য কাজ নিজে না ক'রে এই সকল গৃহপালিত পশুর স্কন্ধে অর্পণ করে। রথে বা গোযানে চড়ে পদব্রজে ভ্রমণ সে পরিহার করতে পারে। সেইরকম শস্য উৎপাদন করতে বা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে যেখানে কাজটি আয়াসসাধ্য বা একটানা ক'রে যাওয়া বিরক্তিকর, সেখানে সে পশুশক্তি প্রয়োগ ক'রে সেই জাতীয় কাজ হতে নিজেকে অব্যাহতি দিল। ক্ষেত্রকর্ষণের জন্য সে গরু বা অশ্ব নিয়োগ করল। তৈল উৎপাদনের জন্য বলদ ব্যবহার করল। ভূমিতে জলসেচের জন্য বলদকে কাজে লাগাল।

অন্নসমস্যার মত বস্ত্রসমস্যাও একটি প্রধান সমস্যা। তার সমাধান মানুষ প্রথম করেছিল পশুদেহ হতে আচ্ছাদন-বস্তু সংগ্রহ ক'রে বা বৃক্ষ হতে বল্কল সংগ্রহ ক'রে। সে সমাধান সন্তোষজনক নয়। পরে নূতন পথে সে সমাধান পেয়েছিল। কার্পাস গাছের তুলো হতে সে বস্ত্র বয়ন করতে শিখল। তকলি উদ্ভাবিত হল সুতো পাকানর জন্য। পরে তার স্থান চরকা নিল। বয়ন করবার জন্য মানুষ তাঁত উৎপাদন করল। এ কাজগুলি এত সূক্ষ্ম যে পশুশক্তি নিয়োগের অবকাশ এখানে ছিল না, তা না হলে একাজও মানুষ পশুর স্কন্ধে অর্পণ করত। মানুষের জীবনধারণের জন্য তিনটি মৌলিক সমস্যার সমাধান লাগে। প্রথম অন্নসংস্থান, দ্বিতীয় বস্ত্রসংস্থান এবং তৃতীয় যাতায়াতের বা দ্রব্য সরবরাহের সমস্যা। আবাসের সমস্যাও একটি মৌলিক সমস্যা। প্রথম যুগে মানুষ এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে নির্ভর করত সম্পূর্ণ নিজ কায়িক শক্তির উপর। সে ব্যবস্থা তত সন্তোষজনক নয়। প্রথমতঃ, সে কাজগুলি পরিশ্রম ও আয়াসসাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ হওয়ায় তার ফলও সীমাবদ্ধ। পায়ে হেঁটে বেশীদূর যাওয়া চলেনা। বাহুবলের উপর নির্ভর ক'রে বেশী পরিমাণ ভূমিকর্ষণ করা যায় না।

দ্বিতীয় যুগে পশুশক্তি আয়ত্ত হওয়ায় মানুষের এ বিষয় অনেকখানি সুবিধা হয়ে গেল। গৃহপালিত পশুগুলিকে সে এখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাদের দৈহিক শক্তি মানুষের দৈহিক শক্তি হতে অনেক বেশী। সুতরাং এক্ষেত্রে দুই বিষয়ে তার লাভ হল। প্রথমতঃ, কষ্টসাধ্য কাজ তাদের উপর অর্পণ ক'রে সে কষ্ট হতে অব্যাহতি পেল। দ্বিতীয়তঃ, তাদের শক্তির উৎকর্ষ হেতু যে কাজ পশু দ্বারা করান সম্ভব, তা আরও ভাল ভাবে সম্পাদিত হল। বলদের সাহায্যে ভূমিকর্ষণ যেমন বেশী পরিমাণে করান সম্ভব, তেমন গভীর ভাবে সম্ভব। পদব্রজে যত দূর ও যত দ্রুত যাওয়া যায়, অশ্বযানে তা হতে অনেক বেশী দূরবর্তী স্থানে অনেক বেশী দ্রুতগতিতে যাওয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগে এই ভাবে মানুষের যে সমাজ-জীবন গড়ে উঠেছিল তার কতক-গুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। কায়িক শক্তির সাহায্যে ততটা নয়, যতটা পশুশক্তির সাহায্যে সে এখন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে, হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যে সে বস্ত্র সমস্যার সমাধান করে এবং দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের জন্য সে পশুশক্তির উপর নির্ভর করে। জীবনে তখনও জটিলতা দেখা দেয়নি। সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের উপকরণের তালিকা বিশেষ দীর্ঘ হয় নি। শস্য উৎপাদনই তখন মৌলিক কাজ।

বেশী সংখ্যক মানুষই কৃষিকর্ম ক'রে জীবনধারণ করে। পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কিছু কারিগরও থাকে। তারা ভূমিকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে। তারা গোযান বা অশ্বযান নির্মাণ করে। তারা বস্ত্র বয়ন করে। তারা গৃহে নিত্য-ব্যবহার্য পাত্র বা আধার উৎপাদন করে।

সুতরাং সমাজ তখন গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রামে চাষীই প্রধান শ্রেণী। তাদের ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কয়েক ঘর কারিগর বা শিল্পদ্রব্য-উৎপাদক থাকে। একঘর কর্মকার, এক ঘর কুম্ভকার, এক ঘর সূত্রধর এবং একাধিক ঘর তন্তুবায় থাকতে বাধ্য। এই বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলের মধ্যে মাঝে মাঝে ছড়ান আকারে গড়ে ওঠে পত্তন বা নগর। কোথাও হয়ত দশদিকের দশটা পথ একস্থানে মিলেছে। নানা পণ্যদ্রব্যের সেটা বিনিময়কেন্দ্র হয়ে গড়ে ওঠে। সেখানে বহু ব্যবসায়ীর মিলন হয়। তারই ভিত্তিতে সেখানে একটি নগর গড়ে ওঠে। কোথাও বা রাজ্যশাসনের জন্য শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কত আমলার সেখানে কাজ জোটে,

রাজদরবারে কত মানুষের আনাগোনা করতে হয়। এইভাবে সেখানেও বহু মানুষের বসতি স্থাপিত হয়। সেখানেও নগর গড়ে ওঠে। গ্রামই যেন নিয়ম, নগর যেন ব্যতিক্রম। জীবনে জটিলতা কম। জীবনযাত্রার তাল দ্রুত নয়, মন্দ। এই হল মোটামুটি দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য।

মানুষের নূতন শক্তি আয়ত্ত করবার তৃষ্ণা কিন্তু তখনও নির্বাপিত হয়নি। এককালে নিজের দৈহিক শক্তি তাকে যে সম্পদ এনে দিয়েছিল তাতে সে তৃপ্তি পায়নি। পরবর্তী যুগে সে পশুদেহের শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু তাতেও সে তৃপ্তি পায়নি। নূতনতর শক্তির উৎসের সন্ধানে তার মন ছুটেছিল। নূতন ক্ষেত্রে শক্তির সন্ধান যে এতকাল সে পায়নি, তাও নয়। অতি শৈশবে সে অগ্নির গুণ চিনেছিল। এবং তাকে ইচ্ছামত উৎপাদন করবার দক্ষতা অর্জন করেছিল। কিন্তু তার ব্যবহার সে করেছিল অতি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। রন্ধনের কার্যে বা শীত হতে পরিত্রাণের কার্যে বা রাত্রির অন্ধকারকে আলোকিত করবার কার্যে তাকে ব্যবহার করেছিল। কাজেই প্রাকৃতিক শক্তিকেও যে আয়ত্ত ক'রে ব্যবহার করা যায় সে অভিজ্ঞতাও তার ছিল। পরবর্তীকালে নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে সে যাতায়াতের সমস্যাকে সহজ করেছে। জোয়ার-ভাঁটার নিয়মকে আয়ত্ত ক'রে সে নদীকে যাতায়াতের পথে পরিণত করতে পেরেছে। বস্ত্রের সাহায্যে বাতাসকে বেঁধে সে নৌকা বা জাহাজ পরিচালিত করেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এরা ছিল প্রকৃতির প্রকট শক্তি।

প্রকৃতির মধ্যে নিদ্রিত যে শক্তি রয়েছে তার সংগে এতকাল তার পরিচয় হয়নি। সেই শক্তির সন্ধান সে যেদিন পেল সেদিন আর একটি যুগান্তর সংঘটিত হয়ে গেল। ঘটনাটি অতি সামান্য। একটি ইংরেজ বালক লক্ষ্য করেছিল যে কেট্‌লিতে যখন জল গরম হয়ে ওঠে এবং বাষ্প নির্গত হতে থাকে, তখন কেট্‌লির ঢাকনা উপরে উঠে যায়। এই দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করল যে জল যখন উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, তখন বাষ্পের মধ্যে যে আত্মবিস্তারের শক্তি আছে তা কেট্‌লির ঢাকনাকে উপরে ঠেলে দেয়। এইভাবেই প্রকৃতির মধ্যে ঘুমন্ত যে শক্তি আছে তার প্রথম সাক্ষাৎ মানুষ লাভ করেছিল। তারপর যা ঘটে গেল তা যেমন আকস্মিক, যেমন দ্রুত, তেমনি বিস্ময়কর।

বাষ্পের এই বিস্তারশক্তিকে মানুষ নানা যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে কাজে লাগাতে চেষ্টা করল। বস্ত্র উৎপাদন করতে, যেমন সুতো পাকানো তেমন বস্ত্র বয়ন,

উভয়ই বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং একান্ত বিরক্তিকর। পশুশক্তিকে আয়ত্ত ক'রেও সে এই বিরক্তিকর কাজ হতে অব্যাহতির উপায় খুঁজে পায়নি। আজ বাষ্পশক্তির আবিষ্কার সেই অব্যাহতির পথ সুগম ক'রে দিল। বাষ্পচালিত তাঁত এবং বাষ্পচালিত মাকু তৈয়ারী হল। তার ফলে সমাজ-জীবনে যে দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হল তাকে বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই নামকরণ যে যথার্থ হয়েছে তা হৃদয়ঙ্গম করতে একটু বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী যুগে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ। সেইরকম তার বিনিময়ের ক্ষেত্রও ছিল অপরিসর; গ্রামাঞ্চলে এক বা একাধিক গ্রামেই তা সীমাবদ্ধ। কোনো কুম্ভকারের উৎপাদিত পণ্য তার গ্রামের প্রয়োজন মেটাতে ফুরিয়ে যেত। বিশেষ বিখ্যাত কারিগর হলে হয়ত পাশের গ্রামেও তার পণ্য যেত। শহর-অঞ্চলে, তুলনায় ধনী শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। তারা মূল্যবান পণ্যদ্রব্য ক্রয় করবার ক্ষমতা রাখত। তা দূর থেকে আসত বৈ কি। কিন্তু তা উৎপাদন করত যে শিল্পীরা তাদের সংখ্যা যেমন কম, ক্ষমতাও তেমনি সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে তার চাহিদা ছিল না। এইকালে শিল্পীরা প্রধানতঃ নিজ হস্তেই কাজ করত। অর্থাৎ যে শ্রমিক সেই ছিল সাধারণতঃ মালিক। উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুটি আলাদা সত্তার আবির্ভাব তখনও হয়নি।

বাষ্পের শক্তি কিন্তু অপরিসীম। তাকে আয়ত্ত ক'রে মানুষ যখন বস্ত্র উৎপাদনের কার্যে লাগাল, তখন এক নূতন দৈত্যের যেন আবির্ভাব হল। যন্ত্রচালিত মাকু ও যন্ত্রচালিত তাঁতের জন্য নির্মিত হল কারখানা। আগুনের সাহায্যে জল উত্তপ্ত ক'রে বাষ্প উৎপাদনের জন্য নির্মিত হল প্রকাণ্ড বয়লার। পাইপ যোগে সেই বাষ্প চালিত ক'রে বিশেষ পথ দিয়ে তাকে নির্গত ক'রে, চালান হল প্রকাণ্ড চাকা। সেই চাকার সহিত নানা বেল্টের সাহায্যে মাকু এবং তাঁতকে সংযুক্ত ক'রে তাদের চালিত করা হল। এইরূপে মানুষের নূতন সৃষ্টি যন্ত্ররাজ অধিষ্ঠিত হল। কি আসুরিক তার শক্তি! লোষ্ট্র, কাষ্ঠ, ইষ্টক ও লৌহ দ্বারা তার ঘনপিনদ্ধকায় দেখলে মনে ত্রাস আসে। তার যা শক্তি তা একসাথে শত শত তাঁত চালাতে পারে এবং সহস্র মাকু ঘোরায়। যেখানে এতগুলি যন্ত্র একসংগে কাজ করে, সেখানে সেই যন্ত্রগুলির প্রতি নজর রাখতে এবং তাদের যোগান দিতে কত লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সুতরাং এই দানবকে সৃষ্টি করতে ও চালু রাখতে সমাজের কাঠামোর কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এতদিন সীমাবদ্ধ আকারে

অল্প মূলধন নিয়ে ছোট ছোট শিল্প-উৎপাদনকেন্দ্র ছিল। যিনি শিল্পী, সাধারণতঃ তিনিই কেন্দ্রের মালিক ছিলেন। মালিক এবং শ্রমিকের কোনো ভেদ ছিল না। এখন কিন্তু এত বড় যন্ত্রদানব সৃষ্টি করতে লাগে প্রচুর অর্থ। দ্বিতীয় যুগের ছোট শিল্পীর এত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত। কাজেই মূলধন তোলবার জন্ম প্রয়োজন হল ধনী বা বিত্তবান মানুষের। বড় জমিদার বা ব্যবসায়ীরাই এত পরিমাণ অর্থ মূলধন হিসাবে ব্যয় করতে সামর্থ্য রাখে। কাজেই পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারাও এসে জুটল। তাদের অর্থে নির্মিত হল কারখানা। অপর পক্ষে কয়েকজন কারিগর দিয়ে এতবড় কারখানা চালু রাখা যায় না। সুতরাং অসংখ্য কারিগর নিয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অন্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্মও বহু মজুরের প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

ফলে এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেল। ব্যাপক ভাবে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্ম গড়ে উঠল দুটি বিভিন্ন সমাজ। একদিকে বিত্তবান মালিক অর্থ দিয়ে কারখানা গড়ে তোলে আর মজুরী দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করে। অপর দিকে গড়ে উঠল অসংখ্য শ্রমিকের সমাজ। তারা পণ্য উৎপাদনের জন্ম প্রয়োজনীয় পরিশ্রম দান করে এবং পরিবর্তে মজুরী পায়। ফলে, গ্রামের সমাজ ভাঙতে আরম্ভ করল। যে পণ্যদ্রব্য কারখানায় উৎপাদিত হয় তা পরিমাণে এত বেশী এবং মূল্য তার এত কম যে গ্রামের শিল্পী তার সংগে প্রতিযোগিতায় পারে না। গ্রামের শিল্প সে প্রতিযোগিতায় হার মেনে মরতে বসল। গ্রামের কারিগর নিজের কুটীর-শিল্প ভেঙে দিয়ে কারখানায় যোগ দিল। কারখানায় যত শ্রমিকের প্রয়োজন শুধু কারিগর দিয়ে তা মেটে না। তাই চাষীও ক্ষেত-খামার ফেলে কারখানায় এসে জুটল। গ্রামের সমাজ ভেঙে বড় বড় কারখানার পাশে শিল্প-কেন্দ্র গড়ে উঠল। সেখানে অসংখ্য শ্রমিকের বাস। তাদের জন্ম স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান জোটে না, তবু গাদাগাদি ক'রে এক জায়গায় থাকতে হয়। সেখানে কষ্ট, দুঃখ এবং দারিদ্র্যই সাধারণ নিয়ম। সেখানে কয়েক ঘর মুষ্টিমেয় বিত্তবান মালিকের গৃহে তার ব্যতিক্রম।

এই পথে মানুষ প্রকৃতির বক্ষে অপ্রকট অবস্থায় স্থিত আরও অনুরূপ শক্তির সন্ধান পেল। খনিজ কয়লা উত্তাপ দেয়, সেই উত্তাপে জলকে বাষ্পে পরিণত ক'রে বাষ্পের আত্মবিস্তার-শক্তির ব্যবহার ক'রে প্রথম শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল। তারপর খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হল। তার বিস্ফোরণ ঘটিয়েও অনুরূপ কাজে লাগান যায়। তার ভিত্তিতে যে শক্তির যন্ত্র উদ্ভব হল, তার নাম হল—

'আভ্যন্তরীণ দোহন ভিত্তিক ইঞ্জিন'। তারপর জলের নিম্নমুখী গতিও একটা প্রাকৃতিক শক্তি। তাকে ব্যবহার ক'রে জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। উত্তাপ হতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এই বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়েও কল-কারখানা চালান যায়। এইভাবে প্রকৃতির নানা অপ্রকট শক্তি মানুষের আয়ত্ত হয়ে মানুষের সমাজবিন্যাস রীতিমত পরিবর্তিত ক'রে দিল, যন্ত্রশক্তিই তার জীবনের প্রধান অবলম্বন হল। শস্য এখন উৎপাদিত হয় বড় বড় খামারে যন্ত্রের সাহায্যে। যাতায়াতকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে যন্ত্রচালিত যান। তার ভোগের জন্য বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয় যন্ত্রচালিত কারখানায়।

পুরাণে গল্প আছে যে দেবতা আর অসুর, এই দুই দলে মিলিত হয়ে লক্ষ্মীলাভের আশায় এককালে সাগর মন্থন করেছিল। তার ফলে লক্ষ্মীলাভ হয়েছিল ঠিক, কিন্তু সেই সংগে একভাণ্ড গরলও উঠে এসে তাদের রীতিমত বিপদ ঘটিয়েছিল। পুরাণে যা গল্প—মানুষের ইতিহাসে তা সত্য ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে অপ্রকট শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে মানুষ সত্যই লক্ষ্মীলাভের পথকে সুগম করেছে। কিন্তু সেই সংগে দুই ভাণ্ড গরলও এসে জুটেছে। প্রথম গরল হল ধনিক ও শ্রমিক-সমস্যা। যন্ত্রভিত্তিক শিল্প-পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে যারা লিপ্ত তাদের দুটি বিভিন্ন দলে ভাগ ক'রে দিয়েছে। একদিকে আছে মূলধনের মালিক, অন্যদিকে আছে শ্রমিক। তাদের স্বার্থ বিভিন্ন এবং তাদের মধ্যে বিদ্বেষের প্রাচীর দাঁড়িয়ে। এই সমস্যা অর্থনীতির ক্ষেত্র অতিক্রম ক'রে রাজনীতিতে আত্মবিস্তার করেছে। ফলে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন দলের সমর্থনের ভিত্তিতে দু'টি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়েছে। তাই আজ পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবেশ সংকটাপন্ন।

অপরপক্ষে, যন্ত্রশক্তিকে চালু রাখতে প্রয়োজন পণ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত মাত্রায় চাহিদা। তার ক্ষুধা যেমন বেশী, তেমন উৎপাদন-শক্তিও বেশী। যে পণ্য উৎপাদিত হল তার বিপণন না হলে লোকসান ঘটে। তাই বিপণন তার প্রধান সমস্যা। এই সূত্রেই আর এক ভাণ্ড গরলের সৃষ্টি। বিপণনের জন্য বাজার চাই। বাজার সৃষ্টি করতে সাম্রাজ্য চাই। এইভাবে শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে শিল্পে অগ্রবর্তী জাতিরা সাম্রাজ্যবিস্তার এবং সাম্রাজ্যস্থাপনের কাজে নামতে বাধ্য হয়েছিল। এই হল গরলের দ্বিতীয় ভাণ্ড।

এই মালিক-শ্রমিক সমস্যা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা শিল্পবিপ্লবের দুটি মূল সমস্যা। তারা ঠিক বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে বিশেষ

আলোচনার বিষয় হল এই শিল্পবিপ্লবেরই আর একটি কুফল। তা যে সমস্যাটি সৃষ্টি করেছে, তা ততটা প্রকট নয়। সেই কারণে তেমন ভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। কিন্তু যেমন দ্রুতগতিতে তা বেড়ে চলেছে, তাতে মনে হয় মানুষের জীবনকে তা অন্যভাবে বিপদাপন্ন করবে, সে বিষয়ে তাই আমাদের আজ সচেতন হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এ বিষয়টি বুঝতে হলে কিছু প্রাথমিক আলোচনা প্রয়োজন। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনকে সম্ভব করতে হলে যেমন একদিকে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন পণ্যদ্রব্যের বিপণনের। বিপণন-ব্যাপারটা সত্যই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়—কারণ যন্ত্রের ক্ষুধাও যেমন বেশী, তেমন উৎপাদন-শক্তিও বেশী। উৎপাদন-শক্তি বেশী হওয়ার ফলে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণও বেশী হয়ে পড়ে এবং সেই অনুপাতে বিপণনের সমস্যাটাও বড় হয়ে পড়ে। এই সমাধানের চেষ্টাতেই প্রথম যুগে শিল্পে-অগ্রসর জাতিগুলি সাম্রাজ্যবিস্তারে মন দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবিস্তার করতে পারলে দুই দিক হতে সুবিধা আছে। প্রথম, যে দেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল সেই দেশ হতে কাঁচামাল আমদানী করা সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, সেই কাঁচামাল ব্যবহার ক'রে কারখানায় যে পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হবে, সেই দেশের বাজারে তা বিক্রয় হতে পারে। ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের কারখানা চালু রাখবার জন্য ইংরেজ এইভাবে ভারতকে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশে একরকম অক্রিয় এবং অচল অবস্থায় এসে পড়েছে। সুতরাং বিপণনসমস্যা-সমাধানে তা এখন আর নির্ভরযোগ্য নয়।

বিপণনসমস্যার সমাধান আর এক উপায়ে হতে পারে। মানুষের ভোগের ইচ্ছার তৃপ্তির জন্যই ত উৎপাদন এবং সেই উৎপাদনের জন্যই কারখানা। বাড়ীর যেমন ভিত্তি থাকে, তার উপর একতলা ওঠে, তার উপর দোতলা উঠে—উৎপাদন-শিল্পের বিন্যাসেও অনুরূপ ব্যবস্থা এসে পড়ে। তারও ভিত্তি আছে; তার উপর নির্ভর ক'রে বেড়ে ওঠে বিভিন্ন স্তরের শিল্প। সামাজিক মানুষের ক্রয়ের ক্ষমতাই হল সকল শিল্পের ভিত্তি। মানুষ যা কেনে তা সোজা ভোগ করবার জন্য। তার জন্য তাকে বলা হয় ভোগ্যপণ্য। এই ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের জন্য যে কারখানা হয় তাই হল, তা হলে, শিল্পবিন্যাসের উপরতলা। কিন্তু ভোগ্য-পণ্য উৎপাদন করতে লাগে নানা যন্ত্র। তাও উৎপাদন করতে কারখানার প্রয়োজন। এই যন্ত্র-উৎপাদনের কারখানাগুলি যেন শিল্পবিন্যাসের নীচের তলা। অপরপক্ষে, সেই যন্ত্র উৎপাদন করতেও কাঁচামাল লাগে—যেমন লোহা বা

ইস্পাত। সেই কাঁচামাল উৎপাদনের জন্যও আবার কারখানা দরকার। এদের সেই জন্য বলে মৌলিক শিল্প। এই মৌলিক শিল্পই যেন বাড়ীর ভিত।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যাতায়াতের সুবিধার জন্য কোনো বিত্তবান মানুষের মোটরগাড়ী কেনবার ইচ্ছা হয়েছে, ধরা যাক। সে যাবে দোকানে। সেখানে প্রদর্শনীকক্ষে সদ্য কারখানা হতে আনীত মোটরগাড়ী আছে। এখন সেই গাড়ী যে কারখানায় উৎপাদিত হল সেখানে মোটরগাড়ীর বিভিন্ন অংশ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র দরকার। সেই যন্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য আর এক শ্রেণীর কারখানা দরকার যেখানে সেই যন্ত্র উৎপাদিত হবে। আবার সেই যন্ত্র উৎপাদিত করতে দরকার ইস্পাতের মত কাঁচা মাল উৎপাদনের। তার জন্য আবার বিভিন্ন কারখানা দরকার। এই ভাবেই শিল্পবিন্যাস গড়ে উঠেছে। একের প্রয়োজনে আর এক শিল্প গড়ে উঠেছে, আবার তার প্রয়োজনে আর এক শিল্প গড়ে উঠেছে। বিত্তবান মানুষের ভোগের জন্য মোটরগাড়ী। মোটরগাড়ী উৎপাদনের জন্য একশ্রেণীর কারখানা। সেই কারখানার যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য আর একশ্রেণীর কারখানা। আবার সেই কারখানার কাঁচা মাল জোগান দেবার জন্য ইস্পাতের কারখানা। সুতরাং ধাপে ধাপে এই যে শিল্পবিন্যাস গড়ে উঠেছে, তার মূলে আছে মানুষের ভোগে উৎপন্ন-পণ্যের ব্যবহার। সুতরাং যে ভোগ্যপণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হবে তাকে মানুষের ভোগে লাগান প্রয়োজন, ভোগ্যপণ্য বিপণনই মূল কথা। বিক্রয় হলে তবেই শিল্পে যে অর্থব্যয় করা হয়েছে, তা উঠে আসবে। দেহের নিকট যেমন আহার, শিল্পের নিকট তেমন বিপণন একান্ত প্রয়োজন।

এখন এই বিপণনসমস্যার সমাধানের আর একটি উপায় হল ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা। সেটা করা যায় মানুষের জীবনধারণের মান উন্নীত ক'রে। এটা বেশ ভাল বোঝা যায় শিল্পে অনগ্রসর সমাজের বিষয় আলোচনা করলে। এমন অনুন্নত দেশ আছে যেখানে গ্রামের সাধারণ মানুষ পায়ে জুতো পরে না, দেহে উত্তরবাস ধারণ করে না, কেবলমাত্র কটিবাসই তার সম্বল। সে দেশের মানুষের যদি রুচির পরিবর্তন ঘটিয়ে তার মনকে উত্তরবাস ব্যবহারে অভ্যস্ত করান যায়, তাহলে কাপড়ের চাহিদা বাড়বে। তার জীবনের মানকে আর একটু উন্নত করতে পারলে, সে পায়ে জুতো পরতে চাইবে। ফলে জুতো-শিল্প বিস্তার লাভ করবে। সুতরাং এইভাবে জীবনের মান উন্নীত করলে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বর্ধিত করা যায়। চাহিদা

বর্ধিত হলে কারখানায় যে বিপুল পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তার বিপণন সহজ হয়ে পড়ে।

শিল্পে অগ্রবর্তী দেশে এই পথেই বিপণনসমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের ব্যবস্থার যেমন প্রসার হয়েছে, তেমন দেশের মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটিয়ে নূতন নূতন পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পে অগ্রবর্তী দেশে এই ব্যবস্থার প্রয়োগ খুব বেশী রকম হয়েছে। এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে মূল্যবান ব্যবহার্য পণ্যের ব্যবহার বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। যে কোনো সাধারণ মানুষ রেডিও, রেফ্রিজারেটার, টেলিভিসন এবং মোটরগাড়ীর মালিক হবার স্বপ্ন দেখে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মালিক হয়েও বসে। এই সব মূল্যবান জিনিস কিনতেও বেশী মূলধন লাগে। সাধারণ মানুষ তা পাবে কোথায়? তার জন্যও ব্যবস্থা আছে। যারা এইসব মূল্যবান পণ্যের কারবার করে, তারা মাসিক কিস্তিতে মূল্য শোধ করবার ব্যবস্থা ক'রে দেয়। সমগ্র মূল্য না দিতে হলে, মাসিক আয়ের অংশ কিস্তি-শোধের জন্য বরাদ্দ ক'রে দিয়ে জিনিস কেনা যায়, কবে মাসিক আয় হতে সঞ্চয় ক'রে ক'রে মূলধন জমবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। তার একটা সুবিধা আছে। এইসব মূল্যবান পণ্য ক্রয় করবার ক্ষমতা অর্জনের অনেক পূর্বেই, সেগুলি ভোগ করবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু তার একটা অসুবিধাও এসে পড়ে; যে এমন ভাবে ভোগ করে, তার ঋণশোধের একটা দায়িত্বও বহন করতে হয় এবং মাসিক আয়ের একটা মোটা অংশ এই কিস্তিবদ্ধ ঋণ শোধে ব্যয় হয়ে যায়।

এই সূত্রেই শিল্পবিপ্লবের তৃতীয় কুফলটি আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের ভোগ্য-পণ্য উৎপাদনের সুবিধার জন্যই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যন্ত্রের জন্য অত্যধিক মূলধন ব্যয় হয় এবং তা পরিশোধের জন্য নির্ভর করতে হয় অধিক পরিমাণ পণ্যের ব্যবহারে। সেই কারণে উৎপাদন-ব্যবস্থার যন্ত্রীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হয়ে পড়ে—পণ্যদ্রব্য-ব্যবহারের সীমাহীন বিস্তার। এই সূত্রেই বিপদ আসে। মানুষের প্রয়োজন মেটাতে আর পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় না। যে কারখানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে উৎপাদনের পরিমাণ বর্ধিত হতে থাকে এবং মানুষের তা কেনবার প্রয়োজন থাক বা না থাক, নানা উপায়ে কিনতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। নানা চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন প্রচার হয়, কারবারীরা এসে ধরাধরি করে, ঘরে টাকা না থাকলে ধারে জিনিষ দেওয়া হয়—কত কি। সুতরাং পণ্যদ্রব্য ক্রয় আর প্রকৃত ভোগের জন্য নয়, যন্ত্রের

অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্ত। যেটা ছিল গৌণ, সেটা মুখ্য বস্তুর স্থান অধিকার ক'রে বসে।

এইভাবে শিল্পে অগ্রসর দেশে মানুষের জীবনধারার মান অত্যধিক বেড়ে গেলে অবস্থাটা হয়ে পড়ে বেশ শোচনীয়। মানুষের জীবন রীতিমত সংকুচিত হয়ে পড়ে। মানুষের কাজ যেন হল উপার্জন করা এবং ভোগ্যপণ্য ক্রয় করা। প্রকৃত ভোগের প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক, পণ্য কিনতে হবে, হাতে টাকা না থাকলে ধারে কিনতে হবে। একথা স্বীকার্য যে মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্ত খানিক পরিমাণ বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দরকার। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে। মানুষ একটি জটিল সত্তা। তার হৃদয় আছে, মন আছে, দেহ আছে। তার হৃদয় অন্ত মানুষের সংগে, অন্ত জীবের সংগে, প্রকৃতির সংগে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। তার মন ভাবতে, মৌলিক চিন্তা করতে অবসর চায়। তার সেই মন সেই হৃদয়কে ধারণ করে। তারও কিছু স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন আছে বৈকি। তা না হলে হৃদয়বৃত্তি এবং মনোবৃত্তি কাজ করে না। তার শৈশবে মানুষের সে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। পরে বৈষয়িক সমৃদ্ধির সংগে সেটা সম্ভব হয়েছিল। এই বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্তই পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা। সহজে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্তই যন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা। কিন্তু যন্ত্রীকরণ যে অর্থনৈতিক বিন্যাস আনল, তার ফলে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের পরিবর্তে যন্ত্রের অস্তিত্বের প্রশ্নই প্রাধান্য পেল বেশী। ফলে ভারসাম্য গেল নষ্ট হয়ে। হৃদয়বৃত্তির বা মননবৃত্তির দাবী ত উপেক্ষিত হলই। সংগে সংগে বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানও গৌণ বস্তুতে পরিণত হল। মানুষ যেন উৎসর্গীকৃত হল যন্ত্রদানবের কাছে। যন্ত্রদানবের জন্তই তার জীবন নিবেদিত। পণ্যদ্রব্যের ভারে তার জীবন হয়ে পড়ল ব্যতিব্যস্ত।

শিল্পবিপ্লবের ফলে যন্ত্রের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। মানুষের দেহবল বা পশুবল উৎপাদনের কাজে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। তবে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু যে নীতি যন্ত্রীকরণের জন্য দায়ী, সেই নীতিই উৎপাদন-ব্যবস্থায় এমন একটি নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চলেছে যা যন্ত্রীকরণের কুফলকে আরও বেশী বর্ধিত করবে। তাকে বলা যায় 'স্বয়ংক্রিয়ণ'। যন্ত্রীকরণের পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন কাজ যন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু তাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্ত এবং অন্ত আনুষঙ্গিক কাজের জন্ত মানুষের বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র থাকে। স্বয়ংক্রিয়ণে তা থাকবে না।

বর্তমান কালে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে এই সংযোগ স্থাপন বা নিয়ন্ত্রণের কাজ আপনা হতে সম্পাদিত হয়। তাই হল স্বয়ংক্রিয়ণের বৈশিষ্ট্য। পণ্য-উৎপাদনে এই নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ হলে যন্ত্রীকরণের যে কুফল তা নিঃসন্দেহে আরও বর্ধিত হবে। স্বয়ংক্রিয় কারখানা স্থাপন করতে মূলধন খরচ হবে অনেক বেশী। উৎপাদনের কাজে মানুষের সহিত সংযোগ একরকম বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তার উৎপাদন শক্তি অনেক বেড়ে যাবে। ফলে সেই বিপণনসমস্যা আরো বর্ধিত আকারে দেখা দেবে। সেই ভাবী ব্যবস্থা মানুষের ভাগ্যে আরও কি আনবে তা কল্পনা করা যায় না।

যন্ত্রদানবের এই দৌরাত্ম্য যে পশ্চিমের মানুষের নজরে আসেনি তা নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ ক'রে বৈষয়িক উন্নতির চরম সীমায় পৌঁচেছে ঠিক, কিন্তু সে উন্নতি আমেরিকাবাসীর অবিমিশ্র সুখের কারণ হয় নি। পণ্যদ্রব্যের বোঝা তাদের জীবনকে সবিশেষ ভারাক্রান্ত করেছে। যন্ত্রীকরণের এই কুফলের দিকটির প্রতি সে দেশের মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তার প্রমাণ স্বরূপ 'সুস্থ সমাজ' শীর্ষক এরিক ফ্রোম লিখিত পুস্তকের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন :

"আমাদের পণ্যদ্রব্য ভোগের রীতির নিশ্চিত ফল হল আমরা তাতে কখনো তৃপ্তি পাই না, কারণ আমাদের মধ্যে যে সত্য বাস্তব ব্যক্তিটি আছে সে তা ভোগ করে না। এইভাবে আমরা আরও পণ্যের জন্য, আরও ভোগের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন-বোধ গড়ে তুলি। একথা সত্য যে, যে পর্যন্ত দেশের মানুষের জীবনের মান সম্ভ্রান্তভাবে জীবনযাত্রার স্তরের নীচে থাকবে, সে পর্যন্ত স্বভাবতই অধিক পণ্যদ্রব্য ভোগের প্রয়োজন থাকবে।

"এও সত্য যে মানুষ যেমন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত হবে মার্জিত রুচির খাদ্য, সুন্দর কারুকার্য, পুস্তক প্রভৃতির প্রয়োজন বোধ করবে—তেমন সংগত কারণে অধিক পণ্যের প্রয়োজন থাকবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের পণ্যদ্রব্য ভোগের বাসনা মানুষের প্রয়োজনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেনা। প্রথম দিকে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্টতর পণ্যদ্রব্য ভোগের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বেশী সুখ ও তৃপ্তি দেওয়া। পণ্যদ্রব্য-ভোগ একটি উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপ ছিল। সে উদ্দেশ্য হল সুখলাভ। বর্তমানে তা নিজেই উদ্দেশ্যের স্থান দখল ক'রে বসেছে। প্রয়োজনের অন্তহীন পরিবর্ধন উপার্জনের চেষ্টাকে বর্ধিত করতে বাধ্য করে এবং এই নূতন প্রয়োজনগুলির উপর এবং যে মানুষ ও প্রতিষ্ঠানগুলি

তার জোগান দেয়, তাদের উপর আমাদের নির্ভরশীল করে।"

যন্ত্রদানব যে এমন আপদ হয়ে মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত করবে তার আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথের মনেও জেগেছিল। তিনিও বলেছেন যে প্রযুক্তি-বিদ্যার অতিপ্রয়োগে যখন উৎপাদন-ব্যবস্থার যন্ত্রীকরণ হয়, তখন আমাদের বৈষয়িক প্রয়োজনবোধ ক্রমবর্ধমান-হারে বেড়ে চলে এবং সেই প্রয়োজন দূর করতে আমাদের কার্য ও সামর্থ্যের উপর চাপ বৃদ্ধি হয়। ফলে আমাদের বৈষয়িক সংগতি বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তার জন্য আমাদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। সব থেকে দুঃখের কথা হল, মানুষের জীবন হতে অবসর আবার পলাতক হয়। মানুষ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীবে পরিণত হয় এবং তার সকল কাজ, সকল চেষ্টা অর্থ-উপার্জন ও পণ্যদ্রব্য ক্রয় ক'রে ভোগের কাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার জীবনের ক্ষেত্র রীতিমত সংকুচিত হয়ে পড়ে। তিনি তাই বলেছেন:

"আমাদের একান্ত জটিল বর্তমান পরিবেশে যান্ত্রিক শক্তিকে এমন নিপুণভাবে গড়ে তোলা হয় যে ভোগ্যপণ্য এমন দ্রুতহারে উৎপাদিত হতে থাকে যে মানুষ তার সংগে তাল রেখে নিজের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে তার সংগতি রক্ষা করে নির্বাচন ও পরিপাক করে উঠতে পারে না।

"গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উদ্ভিদের বিস্তারের মত, পণ্যদ্রব্যের এই অসংগত অতি-বিস্তার মানুষের জন্য অবরোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। নীড় হল সরল জিনিস। তার আকাশের সহিত সহজ সংযোগ আছে; পিঞ্জর জটিল এবং মূল্যবান জিনিস; যা বাহিরে আছে তা হতে তা অতি বেশী রকম বিচ্ছিন্ন। বস্তুরূপী দৈত্যের উপর দ্রুতহারে নির্ভরশীল হয়ে এবং চারিদিক হতে তার প্রভাব বিস্তার করতে দিয়ে মানুষ নিজের জন্য দ্রুতবেগে পিঞ্জর নির্মাণ ক'রে চলেছে।"

(রিলিজিয়ন অব্ ম্যান, দ্য টিচার)

এখানে 'পিঞ্জর' এবং 'নীড়' এই পদ-দুটির তাৎপর্য বিশেষ ক'রে হৃদয়ঙ্গম করবার প্রয়োজন আছে। তাঁর মতে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের উন্নতির যে খানিক পরিমাণ প্রয়োজন নাই তা নয়, বরং তা মানুষের অনেক অভাব সহজে দূর করতে সাহায্য করে এবং দৈহিক পরিশ্রম হতে তাকে খানিক পরিমাণে মুক্তি দিয়ে, তার বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে। সেই রকম পাখীরও নিশ্চিত আশ্রয়ের জন্য একটি নীড়ের প্রয়োজন আছে, তা না হলে উন্মুক্ত আকাশে নিরুদ্বেগচিত্তে উড়ে বেড়াবার সুযোগ তার মেলে না।

নীড় তাই তার স্বাধীনতাকে খর্ব করে না, বরং তা ভোগ করবার সুবিধা এনে দেয়। কিন্তু সেই পাখীকে যদি পিঞ্জরে আবদ্ধ করা হয়, তার আবাসের ব্যবস্থা নিশ্চয় নীড় হতে অনেক ভাল হয়, কিন্তু অনন্ত আকাশে স্বাধীন বিচরণের অধিকার হতে তাকে বঞ্চিত করা হয়। তেমনি মানুষের জীবনকে খানিক পরিমাণ নিরাপদ করতে এবং দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদন-সমস্যার অনন্ত জটিলতা হতে মুক্তি দিতে, খানিক পরিমাণ প্রযুক্তি-বিদ্যা প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। উৎপাদন-ব্যবস্থা সহজ হলে যা সবার বড় লাভ তা হল নানা বৃত্তি-বিকাশের সুবিধার জন্য অবকাশ। কিন্তু যান্ত্রিক শক্তির সংযোগে অত্যধিক পরিমাণে পণ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি হলে, তার বন্যায় আবার অবসর ভেসে চলে যায় এবং মানুষের জীবন সংকুচিত এবং অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই এও একরকম নিজের চারিপাশে পিঞ্জর নির্মাণের সামিল হয়ে দাঁড়ায়।

আসলে গোড়াতেই আমাদের একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। আমরা একাগ্রমনে কেবল লক্ষ্মীরই সাধনা ক'রে এসেছি। আমরা ভুলে বসে আছি যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ অবিচ্ছেদ্য সংযোগ আছে। তাঁরা সম্বন্ধে পরস্পরের ভগিনী এবং উভয়ের মধ্যে এমন প্রীতির সংযোগ যে, একজনকে বঞ্চিত ক'রে অন্যের প্রতিষ্ঠা কারও প্রীতিকর নয়। দৈহিক প্রয়োজনগুলিকে অস্বীকার ক'রে মনোবৃত্তির বা হৃদয়বৃত্তির বিকাশ সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, প্রয়োজন থাক বা না থাক, কোনো দৈহিক ভোগের জন্য ভোগ্য পণ্য আহরণ করলে মনোবৃত্তি বিকাশের অবকাশ পায় না। শুধু সরস্বতীর সেবা ক'রে লক্ষ্মীর মন পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে সরস্বতীকে দূরে রেখে কেবল লক্ষ্মীর উপাসনা তাঁকে রুষ্ট করে। মানুষের ইতিহাসে ঠিক তাই ঘটেছে। সরস্বতীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে আমরা কেবল লক্ষ্মীর উপাসনা করেছি। তাই তিনি রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিয়েছেন। সেই জন্যই ত এত বৈষয়িক সম্পদ মানুষের ভোগে এল না, বরং পণ্যদ্রব্যের এই পাহাড়প্রমাণ সঞ্চয় তার জীবনকে শুধু ভারাক্রান্ত করে নি, নিষ্পেষিত করবার উপক্রম করেছে।

এই ভ্রান্তি সংশোধন করবার এখন কি সময় আসেনি? লক্ষ্মী ও সরস্বতী যে দুই ভগিনী, তাঁদের সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য, এই কথা স্মরণ রেখে আমাদের কি অর্থনৈতিক সমাজবিন্যাসের ব্যবস্থায় পরিবর্তন-বিধান প্রয়োজন নয়?

ফিরে চল মাটির টানে

শেক্‌সপিয়ার বলেছেন, অন্ধকারের মাঝখানে একটি বাতির আলো অনেক দূর হতে দেখা যায়। চারিদিকে অনাচারের মাঝখানে একটি ভাল দৃষ্টান্তও যেন বাতির মত শোভা পায়।

শান্তিনিকেতনে ভারতীয় বিশ্বজনীন বিকাশের ব্যবস্থা ক'রে রবীন্দ্রনাথ তৃপ্তি পান নি। বাংলার গ্রামের দৈন্য ও দুর্দশার সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল জীবনের প্রারম্ভেই, যখন পিতার নির্দেশে জমিদারী তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁকে গ্রামে গিয়ে বাস করতে হত। তা তাঁর মনকে পীড়া দিত। সেই কারণে তার দুর্দশা মোচনের জন্য কিছু করতে তিনি বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। সে সংকল্প কাজে পরিণত করতে তদানীন্তন সরকারের সাহায্য ভিক্ষা করতে তাঁর রুচি হয় নি। তাঁর নির্ভর করতে হয়েছিল সম্পূর্ণ নিজের সঙ্গতির উপর। সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন স্কুলের আশে পাশের কয়েকটি গ্রামকে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজের জন্য।

সে কারণে তাঁর কোনো ক্ষোভের কারণ ঘটে নি; কারণ তাঁর দৃঢ় প্রতীতি ছিল সাধনার ক্ষেত্র ছোট হলে ক্ষতি নাই, সাধনার উৎকর্ষই তার মূল্য এবং সার্থকতা নির্ধারণ করে। এই কয়েকটি মাত্র গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে সংগঠনমূলক কাজ যদি সম্ভব হয়, তাই সমগ্র ভারতের নিকট দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। পল্লীজীবনের নৈরাশ্য ও দুর্দশার আঁধারকে ভেদ ক'রে তা বাতির মত দীপ্তি পাবে। তাই তিনি বলেছিলেন :

"যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি, তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে আমাদের সাধন-ক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ, সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। এ কথা মনে রাখা উচিত—সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তি-মহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি, সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে।"

শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার-উদ্বোধন-অভিভাষণ, ১৩৩৫

গ্রামের সমস্যার সমাধান হবে কোন পথে, সেটা ঠিক করবার পূর্বে সবার প্রথম প্রয়োজন গ্রামের সমস্যা সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণা ক'রে নেওয়া।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। রোগ যখন পুরাতন হয় তখন রোগীর দেহকে নানাদিক হতে তা আক্রমণ করে। রোগ তখন একটা থাকে না, অনেকগুলি একসঙ্গে এসে জটলা পাকায়। তখন তাকে রোগমুক্ত করতে হলে যুগপৎ সকল প্রকার রোগেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। আমাদের পল্লীগ্রাম পুরাতন রোগীর মত। তাকে একসঙ্গে অনেক রোগ ধরেছে। গ্রামের গরিষ্ঠ সংখ্যক লোক চাষী। কিন্তু তারা প্রধানত নিরক্ষর। রোগে ভুগে ভুগে তাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। ভাল ক'রে চাষ করবার তাদের সামর্থ্যও নেই, মনের বলও নেই। সেই মান্ধাতার আমল হতে যে প্রথায় চাষ করত সেই প্রথায় ছোট ছোট ক্ষেতে তারা চাষ করে। গ্রামের কারিগরের অবস্থা আরও খারাপ। কাঁচা মাল কেনবার তার আর্থিক সঙ্গতি নেই। যেটুকু পণ্যদ্রব্য সে উৎপাদন করে তাও বাজারে বিকোয় না। বাংলার পল্লীগ্রামের ব্যাধি একটি নয়, অনেক প্রকার। তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ বিষয় তিনি যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা তিনি সংক্ষেপে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন :

"কর্ম উপলক্ষ্যে বাংলার পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যপ্ত করে, লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষার জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি।"

শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার-উদ্বোধন-অভিভাষণ

পল্লীবাসীর এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন তাঁর মনকে পীড়া দিত। তাই শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী স্থাপনের অনতিবিলম্বেই তিনি সুরুলকে কেন্দ্র ক'রে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু কাজ জমে উঠল তখনি যখন লিয়োনার্ড এলমহার্স্ট নামে এক সহৃদয় কৃষি-বিশেষজ্ঞ ইংরেজ যুবক তাঁর নির্দেশে এ কাজের ভার নিলেন। তাঁরই ইচ্ছায় এ কাজের নাম দেওয়া হল "পল্লীপুনর্গঠন কার্য", কারণ রবীন্দ্রনাথ চান নি যে শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র ক'রে মানুষের সংযোগ হতে বিচ্ছিন্ন কেবল কতকগুলি তথ্য আবিষ্কৃত হক। তিনি চেয়েছিলেন এলমহার্স্টের নেতৃত্বে এই বৃহৎ কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের নিপুণ স্নেহসিক্ত সেবায় গ্রাম পুনরুজ্জীবিত হয়ে একটি নূতন সজীব সৃষ্টি হয়ে গড়ে উঠুক। এই সম্পর্কে তাঁর অন্তরের ইচ্ছা এলমহার্স্টকে লিখিত একটি চিঠিতে এইভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন :

"তুমি তোমার কাজের ঠিক নামই দিয়েছিলে, 'পল্লীপুনর্গঠন কার্য' কারণ তা ছিল পল্লীজীবনের বিভিন্ন কর্মধারাকে ব্যস্ত ক'রে একটি সজীব কাজ, কেবলমাত্র বিশ্লেষণমূলক তথ্য আবিষ্কারে তা সীমাবদ্ধ ছিল না।"

পল্লীপ্রকৃতি, পৃ ২৬৪

এই কাজ যখন শুরু হয় তখন কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। কারণ, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খোলা মনে কাজ ক'রে যেতে হবে। কর্মক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্যক্রম ক্রমশ গড়ে তুলতে হবে। আগে হতেই মনগড়া পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামলে তা নিতান্ত অবাস্তব হবে এবং মনের মত ফল দেবে না। তা সত্ত্বেও একটা বিষয়ে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন পল্লীকে যদি নূতন ক'রে বাঁচতে হয়, তাকে সম্পূর্ণ নিজের প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। বাহির হতে সাহায্য দিয়ে দাঁড় করানর চেষ্টা হবে মারাত্মক রকম ভুল। তাতে যিনি সাহায্য করবেন তাঁর তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু পল্লীবাসীর দুর্দশা আরও বেড়ে যাবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখবার মন্ত্রে তাকে দীক্ষিত করলে তবেই সে আবার বাঁচবে। গ্রামের সমস্যার সমাধানে গ্রামবাসীকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। যা কিছু পল্লী-উন্নয়নের ব্যবস্থা হবে, সবই এই মূলনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তিনি তাই বলেছিলেন :

"প্ল্যান ছিল না বটে, কিন্তু দুটো-একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল।...... রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

...আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূরণ করার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়।"

শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার-উদ্বোধন-অভিভাষণ

এইভাবে লিয়োনার্ড এলমহার্স্টকে কেন্দ্র ক'রে যে কার্যক্রম গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাস বড় বিচিত্র। তাঁর সহকর্মীরা এখনও অনেকে বর্তমান। কেহ কেহ শ্রীনিকেতনে এখনও সক্রিয়ভাবে কাজে নিযুক্ত। শ্রীধীরানন্দ রায় তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর কাছে এ বিষয় অনেক চিত্তাকর্ষক গল্প শোনার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছে। যাই হোক, এইভাবে ধীরে ধীরে যে কার্যক্রম গড়ে উঠেছিল সংক্ষেপে তার একটা বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

মূলনীতি হল পল্লীপুনর্গঠনের কাজে গ্রামবাসীকে স্বাবলম্বী হতে হবে। কাজেই শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন। সে শক্তি সঞ্চিত হবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পরস্পর মিলে-মিশে সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ ক'রে। গ্রামবাসীকে বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট একক পারিবারিক জীবন ত্যাগ ক'রে, সমগ্র পল্লী জুড়ে যে ব্যাপক গোষ্ঠীজীবন আছে সে বিষয় সচেতন হতে হবে। একটি পরিবার একা যে সামর্থ্য রাখে, গ্রামের দশটি পরিবারের মিলিত শক্তি তার থেকে অনেক বেশী সামর্থ্য রাখে। কাজেই সকলে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে গ্রামের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে, এমন কাজে হাত দেওয়া যায়। এই পথেই নূতন শক্তির উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং তবেই আপনার পায়ে দাঁড়াবার শক্তি গ্রামবাসী পাবে। সেই পথই স্থায়ী কল্যাণের পথ, বাহিরের দান নিয়ে তা কখনো সম্ভব নয়।

তবে কি বাহির হতে কোনো সাহায্যই আসবে না? আসবে বৈকি। তারও স্থান আছে। গ্রামের বিশেষ বিশেষ সমস্যা কি তা জানতে, তার সমাধান কি গবেষণা ক'রে বার করতে এবং সেই সমাধানের উপায় নির্ধারিত হলে, তাকে গ্রামবাসীর হাতে পৌঁছে দিতে বাহিরের সাহায্যের প্রয়োজন। এ সেবা এইভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে কেবল উন্নত নীতি বা প্রথার আবিষ্কারে এবং তাকে গ্রামবাসীর নিকট স্থাপনে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রসারিত সেবার যা মূলনীতি তা এভাবে এইখানে রূপ নিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর এই বিশেষ পদ্ধতি মার্কিন বিশেষজ্ঞ আমাদের দেশে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তার বহু পূর্বে শ্রীনিকেতনের কর্মীরা তাকে আবিষ্কার করেছিলেন। সুতরাং বাহিরের সাহায্য সীমাবদ্ধ থাকবে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে নূতন-লব্ধ জ্ঞান দিয়ে সাহায্যে। তার বেশী নয়। শ্রীনিকেতনের উদ্ভাবিত কার্যক্রমের এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হবে, পল্লীপুনর্গঠনের জন্য যে নীতিগুলি গৃহীত হয় তা হতে। তার মূল অংশগুলি নীচে উদ্ধৃত হল:

"গ্রামবাসীকে তাদের সব থেকে জরুরী সমস্যার সমাধানে সাহায্য করা।

গ্রামের এবং গ্রামের ক্ষেতের সমস্যাগুলিকে গবেষণা-গৃহে নিয়ে গিয়ে বিবেচনা করা, আলোচনা করা এবং পরীক্ষামূলক ক্ষেতে তার সমাধান করা।

গবেষণা-গৃহে এবং পরীক্ষামূলক ক্ষেতে যে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যালাভ হয়েছে তা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া।

গ্রামবাসীকে গোষ্ঠীজীবন, পারস্পরিক সাহায্য এবং মিলিত চেষ্টার সুফল সম্বন্ধে অবহিত করা।"

(Viswa-Bharati Quarterly, Education Number, 1947)

উপরে উদ্ধৃত অংশ হতে বেশ বোঝা যায় যে, শ্রীনিকেতনে যে পরীক্ষামূলক কাজ চলেছিল, তা পল্লীউন্নয়নে বিশেষ কার্যকরী হয় এমন যে মূলনীতিগুলি আবিষ্কার ক'রেছিল, তা হল গোষ্ঠীজীবন সম্বন্ধে সচেতনতা, সংঘবদ্ধভাবে কাজ এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার এবং তার প্রচার।

শ্রীনিকেতনের আদর্শ

রবীন্দ্রনাথ যে নৈসর্গিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তা বিশ্বের বিস্ময়ের বস্তু। যে কাজে তিনি হাত লাগিয়েছেন তাই যেন সোনা হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রতিভা যেন স্পর্শমণি। তিনি বঙ্গভারতীর সেবার ভার নিয়েছিলেন, ফলে বাংলা সাহিত্য এমন শ্রীমণ্ডিত হয়েছে যে তা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির অন্যতম বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্য আজ শুধু বাঙালীর নয়, বিশ্ববাসীর চিত্তকে আকৃষ্ট করে, তার রসমাধুর্য আস্বাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে কত দেশের কত মানুষ আজ বাংলা শিখছে।

দেশের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী বাল্যকালে তাঁর ভাল লাগেনি। তাই নিজের সন্তানদের সে দুঃখভোগ হতে নিষ্কৃতি দেবার জন্য বোলপুরে তিনি নিজে বিদ্যায়তন খুলে স্বহস্তে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয় তাঁর চিন্তা ও ভাবনা এমন অভিনব শিক্ষারীতি গড়ে তুলল, যা এক রমণীয় শান্তির পরিবেশে মানুষের মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব করে। ফলে একদিন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হল যেখানে 'বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। তা আজ সারা বিশ্বের বিদগ্ধজনের তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাঁর করুণাঘন হৃদয় পল্লীগ্রামের দরিদ্রঘরের দুর্দশা দেখে বড় ব্যথা পেয়েছিল। তাই তিনি গ্রামবাসীর দুঃখ মোচনের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন। সে বিষয় পরীক্ষামূলকভাবে কাজ ক'রে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি স্থাপন করলেন শ্রীনিকেতন। সে কাজ শুরু হয়েছিল এখন হতে চল্লিশ বছর পূর্বে, ১৯২১ সালের শেষে লিয়োনার্ড এল্‌মহার্স্টের নেতৃত্বে। সেখানে যে সাধনা চলল তার ফলে পল্লীগঠনের এক নূতন কার্যক্রম ও কার্যরীতি গড়ে উঠল। উৎকর্ষগুণে তাও অতুলনীয়। কারণ, তাও যে তাঁর নিপুণ হাতের সযত্ন সেবায় গড়ে উঠেছিল। পল্লীগঠনের এই আদর্শ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

তারপর কতকাল কেটে গিয়েছে। বিদেশী শাসক চলে গিয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের যাঁরা নেতা তাঁদের উপর ভার পড়েছে আমাদের এই হৃতসর্বস্ব দেশকে নূতন করে গড়ে তোলবার। তাঁরা তার জন্য পরিকল্পনা রচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাণকেন্দ্র তো নগরে নয়, পল্লীতে।

আমাদের দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ পল্লী-অঞ্চলেই বাস করে। পল্লী-উন্নয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা না থাকলে, পরিকল্পনা রচনা সার্থক হয় না। তাই একটা আদর্শ পল্লীগঠন-পরিকল্পনা রচনার চেষ্টা হল। নানা বিশেষজ্ঞের ডাক পড়ল। দেশে এবং বিদেশে পরীক্ষামূলকভাবে কোথায় কি কাজ হয়েছে, তার সন্ধান চলল। বিদেশ হতে নানা গুণী মানুষ এলেন পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে। ফলে যে পরিকল্পনাটি গড়ে উঠল তার নাম দেওয়া হল 'সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা'। তেরো বছর হল তা দেশে চালু হয়েছে। সমগ্র দেশের এক ব্যাপক অংশ জুড়ে তার কাজ চলেছে।

শ্রীনিকেতনের পল্লীগঠনের আদর্শের সংগে তার বেশ তুলনা চলতে পারে। বোধহয় এই তুলনার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত পল্লী-উন্নয়নের রীতির উৎকর্ষ কোনখানে, তা প্রকাশ হবে। দেখা যাবে যে স্বাধীনসরকার-প্রবর্তিত নূতন পরিকল্পনায় যা আছে, তা শ্রীনিকেতনের আদর্শে বহু পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল। আর এই নূতন পরিকল্পনায় যা নাই, তাও সেখানে আছে। সেই অভাব বর্তমান পরিকল্পনাকে পঙ্গু করেছে।

বর্তমান সরকার-প্রবর্তিত সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের পৃথক আলোচনার এখানে প্রয়োজন হবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তার কার্যক্রমের ব্যাপকতা। পল্লীউন্নয়ন-সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজে লব্ধ অভিজ্ঞতা হতে এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, গ্রামের সমাজ যে রোগে ভুগছে সে রোগটি বড় জটিল। রোগ যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার সকল অঙ্গেই বাসা বেঁধেছে। অবস্থাটা যেন অনেকটা পুরাতন রোগীর অবস্থার মতো। দীর্ঘকাল রোগে ভুগে ভুগে পুরাতন রোগীর দেহের যেন সকল যন্ত্রই বিকল হয়ে গিয়েছে। তার হৃৎপিণ্ড দুর্বল, হজমশক্তি কমে গিয়েছে, তার গাঁটে গাঁটে বাত, তার সমগ্র দেহখানি রোগে জর্জরিত। এমন রোগীর চিকিৎসা বড় শক্ত কাজ। এ তো একটি রোগ বা দুটি রোগ নয়, এ হল বহু রোগ একত্র হয়ে জট পাকানোর অবস্থা। কাজেই ব্যবস্থাটা একটি রোগের হবে না, হবে সকল রোগের যুগপৎ চিকিৎসার।

আমাদের গ্রামের সমাজের অবস্থাটাও অনেকটা সেইরকম। তার সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য তার জীবনকে নানাভাবে পঙ্গু ক'রে দিয়েছে। চাষী চাষ করে পুরাতন প্রথায় খণ্ড খণ্ড ছোট ক্ষেতে। ফলে, তার যা ফসল ওঠে তাতে সারা বছরের ভাতের ব্যবস্থাটাও হয় না। কারিগরের হাতে পয়সা নেই। তার উৎপাদিত

পণ্য বাজারে বিকোয় না, এদিকে তা ধরে রাখবার মতো আর্থিক সঙ্গতিও তার নেই। যোগাযোগের পথঘাট নেই, কাজেই বাহিরের জগৎ হতে তা বিচ্ছিন্ন। খাবার জন্য পানীয় জল নেই। গ্রামের মানুষের দেহ নানা রোগে জর্জরিত। তাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা বিশেষ নেই। বেশীর ভাগ মানুষেরই অক্ষরজ্ঞান নেই, কাজেই জ্ঞানের পরিধি বড় সীমাবদ্ধ। সবথেকে মারাত্মক কথা যে সকল দিকে বঞ্চিত হয়ে গ্রামের মানুষের মন এমন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যে নিজের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য, ভিতর হতে তাদের কোনো গরজবোধও নেই। এই পরিস্থিতিতে গ্রাম্যজীবনের রোগের চিকিৎসা হওয়া উচিত সব দিক হতে।

এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই ভারত সরকারের সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনায় বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল, কর্মতালিকার ব্যাপকতার দিকে। পল্লীগঠনের জন্য যে কার্যসূচী হবে, তাতে ব্যবস্থা থাকবে সর্বদিক হতে পল্লীজীবনের উন্নতিবিধানের। উন্নত কৃষি, উন্নতপ্রথায় পশুপালন, উন্নত কুটিরশিল্প, জনস্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, উপযুক্ত যোগাযোগের পথ, অক্ষরজ্ঞানের বিস্তার—এইসব বিষয়গুলিই এই কর্মতালিকায় স্থান পেয়েছে।

শ্রীনিকেতনের যখন কাজ সুরু হয়, তখন পূর্ব হতে নির্দিষ্ট কোনো কর্মতালিকা গৃহীত হয়নি, কারণ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্যক্রম আপনি গড়ে উঠুক। পরে এইভাবে ধীরে ধীরে যখন কার্যতালিকাটি তার পূর্ণরূপটি গ্রহণ করল, তাও ব্যাপক হয়ে উঠল। সেখানেও এই তত্ত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে পল্লীর সমস্যা যেহেতু ব্যাপক, পল্লী-উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপক কার্যতালিকার প্রয়োজন। এই কার্যতালিকায় কৃষি, পশুপালন, কুটিরশিল্প, অক্ষরজ্ঞানের প্রচার, সমবায়, স্বাস্থ্য—সবকটি বিষয়ই স্থান পেয়েছিল। সে কার্যতালিকা বর্তমান সরকারী পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যতালিকার মতোই ব্যাপক, গ্রামের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

কার্যতালিকা ব্যাপক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছেন :

"সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক ক'রে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভাল পূর্ণ ভাল হয়ে ওঠে।"

কালান্তর, স্বরাজসাধন

ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত নূতন পরিকল্পনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, গ্রামবাসীর মধ্য হতেই নিজেদের উন্নতিসাধনের ইচ্ছা ফুটিয়ে তুলে, তাদের দিয়ে পল্লীগঠনের কাজ চালানো। এই নীতি বলে গ্রামের মানুষ নিজেদের দুর্দশা সম্বন্ধে অবহিত হোক, হয়ে তাদের অভাববোধ জাগুক এবং তারপরে তাদের নিজেদের চেষ্টাতেই সেই অভাব মোচনের ব্যবস্থা হ'ক। তার মূলনীতি হল "দাঁড়া, আপনার পায়ে দাঁড়া"। সরকার পিছনে থাকবেন, বিশেষজ্ঞ দিয়ে, প্রযুক্তিবিদ্যা-সম্পর্কিত উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন, প্রয়োজন হলে আর্থিক সাহায্য করবেন ; কিন্তু গ্রামের মানুষেরই উন্নয়নের কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য বলা হয়ে থাকে, এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল, গ্রামের মানুষকে নিজেদের সাহায্য করার কাজে সাহায্য করা।

এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে। বাহির হতে সাহায্য কখনো স্থায়িত্ব দেয় না। তা কৃত্রিম জিনিস এবং যাদের সাহায্য করা হচ্ছে, তাদের আরও পঙ্গু করে। কারণ তার ফলে, যে সাহায্য পায় সে আত্মমর্যাদা-বোধ হারায় এবং সেই কারণে, আপনার পায়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করে না। শিশু যখন প্রথম হাঁটতে শেখে, তখন তার মা প্রথম দিকে তার হাত ধরেই হাঁটান। পরে হাত ছেড়ে দেন। সে আছাড় খায়, কাঁদে, তবু হাত বাড়িয়ে দেন না। তবেই শিশু আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজের পায়ে হাঁটতে শেখে।

এই তত্ত্বটির বিষয় রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি তাঁর কর্মীদের তাই বলেছিলেন :

"আমি প্রথম থেকেই একথা মনে রেখেছি যে পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়। সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।"

শ্রীনিকেতন শিল্প-ভাণ্ডার উদ্বোধন-অভিভাষণ

কাজেই তাঁর প্রবর্তিত পল্লী-উন্নয়নের আদর্শে বাহির হতে দয়া দেখানো একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। গ্রামের মানুষের অভাববোধকে জাগ্রত ক'রে, তাদের মধ্যে যে গোপনশক্তি আছে তাকে বিকশিত ক'রে, তার সাহায্যেই পল্লীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে, তাঁর কর্মীদের তিনি শিক্ষা দিতেন। এখানে 'দাঁড়া, আপনার পায়ে দাঁড়া' হল মূলমন্ত্র। তাদের ব্যক্তিগত শক্তি এবং মিলিত শক্তি হবে তাদের প্রধান অস্ত্র। তিনি তাই তাঁর কর্মীদের উপদেশ দিয়েছিলেন :

"পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে।"

ভারত সরকার-প্রবর্তিত সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার তৃতীয় মূল বৈশিষ্ট্য হল কর্মীদের জন্য অনুমোদিত নূতন কর্মপদ্ধতির নূতনত্ব। এটির পারিভাষিক নাম হল 'সম্প্রসারিত সেবা'। বিদেশ হতে, বিশেষ ক'রে আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানবিদ্ বিশেষজ্ঞদের নিকট এটি পাওয়া গেছে। এটির বৈশিষ্ট্য হল যে, সেবক এবং যার সেবা করা হয়, উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা আছে এবং তথ্যের আদান-প্রদানের কাজ উভয়ত চলে। একটি বাস্তব উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে।

আমরা সাধারণত উন্নতি লাভ করি পুরাতন রীতি ছেড়ে দিয়ে নূতন উন্নত রীতি গ্রহণ ক'রে। কৃষি সম্পর্কে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা সাধারণত পাট বুনি ক্ষেতে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গাছ যখন খানিকটা বাড়ে, তখন আগাছা সরিয়ে দেবার জন্য জমিতে নিড়ান দিই। এটা মামুলি প্রথা। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে বীজ এমনি ছড়িয়ে না দিয়ে যদি লাইনবদ্ধ ভাবে কিছু ব্যবধান অন্তর মাটিতে বসানো যায়, তাহলে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গাছ সারিবদ্ধ ভাবে বেড়ে ওঠে। তা হতে কয়েকটা সুবিধা এসে পড়ে। প্রথম, বীজ কম খরচ হয়। দ্বিতীয়, দুই সারি গাছের মধ্যে ফাঁক থাকায়, গাছ আলো-বাতাস বেশী পেয়ে সতেজ হয়ে ওঠে। তৃতীয়, গাছ লাইনবদ্ধ ভাবে থাকায়, দুই সারির মাঝখান দিয়ে একরকম ঠেলা-নিড়েন আছে, তা চালিয়ে দিলে আগাছা তোলা আর মাটি আলগা করার কাজ অল্প আয়াসে হয়, নিড়েনের জন্য মজুরী-খরচ অনেক কমে যায়। সম্প্রসারিত সেবকের একটা কাজ হল এই নূতন রীতির গুণ সম্বন্ধে চাষীকে সচেতন করা, যাতে স্বেচ্ছায় সে প্রাচীন রীতি ত্যাগ ক'রে তা গ্রহণ করে। এখানে সে বাহির হতে উন্নত রীতির খবর নিয়ে এসে চাষীর হাতে পৌঁছে দেয়। এই হল সম্প্রসারিত সেবার একটি দিক।

সম্প্রসারিত সেবার আর একটি দিকও আছে। তা হল যার কাছে নূতন রীতি বা নূতন প্রথার খবর এনে দেওয়া হল, তার কাছ হতেও কিছু খবর নিয়ে যাওয়া। তা প্রধানত চাষী কি নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার খবর। হয়তো চাষীর ক্ষেতে কোনো নূতন পোকার উপদ্রব হয়েছে, যা তার পাটকে বিপদাপন্ন করেছে। সম্প্রসারিত সেবকের দ্বিতীয় কাজ হবে, এই সমস্যা সম্পর্কে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে, গবেষণাকেন্দ্রে স্থাপন করা। উদ্দেশ্য হল, সেই

গবেষণাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞগণ তা নিয়ে অনুসন্ধান করবেন, যাতে পরীক্ষা ক'রে তার একটা সমাধান তাঁরা খুঁজে পান।

সুতরাং সম্প্রসারিত সেবার বৈশিষ্ট্য হল, তাতে আদান এবং প্রদানের ব্যবস্থা আছে। একদিকে চাষীর কাছে নূতন সমাধানের খবর পৌঁছে দেওয়া হয়, অপর দিকে তার কাছ হতে নূতন সমস্যার খবর আনা হয়। কারবার এখানে একতরফা নয়, দু-তরফা। সমস্যার সমাধান খোঁজা হয় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। তা হতে যা নূতন প্রথা আবিষ্কার হয়, তা চাষীকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় না, চাষী তার গুণ বুঝে তাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। এইগুলিই হল সম্প্রসারিত সেবার বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় শ্রীনিকেতনের কর্মীরা যে কার্যরীতি প্রায় চল্লিশ বছর আগে গড়ে তুলেছিলেন, তার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্থান পেয়েছে। গ্রামবাসীর সমস্যার খবর গবেষণাকেন্দ্রে আনা হবে। গবেষণাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ তার সমাধান খুঁজে বার করবেন। ফলে যে নূতন রীতি আবিষ্কৃত হবে, তার সংবাদ গ্রামবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়ে, তাকে তা গ্রহণ করতে শিক্ষা দিতে হবে। এই হল এ পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য। লিয়োনার্ড এল্‌মহার্স্ট লিখিত বিবরণী হতে তার সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তার বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হল :

"পল্লীবাসীদের সবথেকে উৎকট সমস্যাগুলির সমাধানে সাহায্য করা।

গ্রামবাসীর গ্রামের এবং ক্ষেতের সমস্যাগুলিকে গবেষণাগৃহে নিয়ে গিয়ে অবহিত হওয়া এবং আলোচনা করা এবং পরে পরীক্ষামূলক খামারে নিয়ে গিয়ে তার সমাধান করা।

গবেষণাগৃহে এবং পরীক্ষামূলক খামারে যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানলাভ হবে তা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া।"

সুতরাং দেখা যায় যে আমাদের দেশের স্বাধীনসরকার-প্রবর্তিত নূতন সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনার সবকটি মূল বৈশিষ্ট্য, শ্রীনিকেতনে যে পল্লীগঠনের আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তাতেও বর্তমান ছিল। সুতরাং নূতন পরিকল্পনায় মূলত নূতন কিছু নেই। অথচ শ্রীনিকেতনের আদর্শে এমন বস্তু ছিল যা নূতন পরিকল্পনায় স্থান পায়নি। এবং একথা বলা অন্যায় হবে না যে, সেই কারণেই সম্ভবত বর্তমান পরিকল্পনা তেমন প্রাণবান হয়ে ওঠেনি। এই মৌলিক অভাবই যেন তার দুর্বলতার কারণ। আমাদের এই মন্তব্যটির যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মানুষ বস্তুটি বড় জটিল। তার একটা বুদ্ধির দিক আছে, একটা কর্মের দিক আছে আর একটা অনুভূতির দিক আছে। মানুষের মনে অনুক্ষণ এই তিন শক্তির ত্রিবেণী-সঙ্গম চলেছে। এই তিন শক্তিই তার কর্মক্ষমতাকে বিভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। তার বুদ্ধিশক্তি আর কর্মশক্তির প্রভাব তার কর্মক্ষমতার ওপর যে বিলক্ষণ বর্তমান, সেটা সকলেরই চোখে পড়ে। কিন্তু অনুভূতিশক্তি যে তাকে বিশেষরকম নিয়ন্ত্রণ করে, সেটাই সাধারণত চোখে পড়ে না।

এখন মানুষ কর্ম করে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আপাতদৃষ্টিতে দুটি পরস্পরবিরোধী মূল উদ্দেশ্য তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথমটি তার স্বার্থবোধ এবং দ্বিতীয়টি তার পরার্থবোধ। সাধারণ মানুষ প্রধানত স্বার্থবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু যে-কোনো সাধারণ মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে পরার্থবোধকেও পক্ষপাত দেয়, যেমন সন্তানের জন্য মায়ের আত্মত্যাগ। এদের মূলে যে শক্তি ক্রিয়াশীল, তা হল অনুভূতির সেই প্রকাশ যাকে প্রীতি বা ভালবাসা বলি। মানুষ নিজেকে বেশী ভালবাসে, তাই প্রধানত স্বার্থসিদ্ধিই তার কাজের প্রেরণা। সেই ভালবাসা যখন অপরে সঞ্চারিত হয়, তখন পরার্থও তার লক্ষ্যবস্তু হয়। মানুষ যাকে ভালবাসে তার জন্য সে কি না করতে পারে?

এখন সিদ্ধির পথে বুদ্ধিশক্তি যদি হয় সারথি এবং কর্মশক্তি যদি হয় অশ্ব, এই অনুভূতিশক্তি হবে কশাঘাত। বুদ্ধিশক্তি পথ নির্দেশ ক'রে দেয়, কর্মশক্তি সেই পথে চলে। কিন্তু কি গতিতে তা চলবে তা নির্ধারিত হয়, তার উপর অনুভূতি-শক্তির প্রভাবের উপর। বর্তমান যান্ত্রিক যুগের উপমা প্রয়োগ করলে বলতে হয়, বুদ্ধিশক্তি হল 'স্টিয়ারিং হুইল', কর্মশক্তি হল 'ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্‌ট্' এবং অনুভূতিশক্তি হল 'এ্যাক্সেলারেটার'। কাজ তো নানা ভাবে করা যায়। কোনোটা মামুলিভাবে, কোনোটা ভালভাবে, কোনোটা অতি উৎকৃষ্ট ভাবে। যেখানে অনুভূতির সংযোগ নেই, সেখানে কাজ সম্পাদিত হয় মামুলিভাবে। যেখানে অনুভূতির সংযোগ অল্প, সেখানে তা সম্পাদিত হয় তুলনায় ভালভাবে। আর যেখানে অনুভূতির সংযোগ নিবিড় সেখানেই কাজ সম্পাদিত হয় উৎকৃষ্ট ভাবে। এই অনুভূতি এখানে ক্রিয়াশীল হয় প্রীতি বা ভালবাসার যোগ রূপে।

এখন কর্মের সঙ্গে এই প্রীতির যোগ ঘটবে কি ক'রে? তা ঘটানো যায় পরার্থবোধকে প্রস্ফুটিত ক'রে। সন্তানের জন্য মায়ের পরার্থবোধ আপনি ফুটে ওঠে, কারণ মা সন্তানকে প্রাণের অধিক প্রীতি করেন। বন্ধুর জন্য বন্ধু আত্মত্যাগ করে, কারণ বন্ধুকে সে প্রীতি করে। দেশের জন্য মানুষ শহীদ হবার প্রেরণা পায়,

প্রয়ো

কারণ স্বদেশবাসীকে সে ভালবাসে। ভগবানকে শ্রদ্ধা জানাবার, সেবা করবার আকুতি, অনুভূতির আর একটি প্রকাশ। তা-ই হল ধর্মবোধের ভিত্তি। তা-ও প্রবল শক্তি। যে কাজ ধর্মের মর্যাদা লাভ করে, মানুষ তা নিষ্ঠাভরে করে।

কাজেই, যে কৌশল প্রয়োগ করতে হবে তা হল, যে কাজ করি, যাকে ভালবাসি তার কল্যাণের সহিত তাকে সংযুক্ত করা, বা তাকে ভগবানকে ভক্তি বা সেবা নিবেদনের উপায়রূপে ব্যবহার করা। আমাদের দেশের মানুষ তা জানত। তাই তারা ব্রত-আচরণের ব্যবস্থা করেছিল। ব্রত-আচরণ করা কি? না, যাকে ভালবাসি, যার কল্যাণ কামনা করি, তার কল্যাণসাধনের জন্য নিষ্ঠাভরে কিছু করা। এমন কাজ হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ যত্নের সঙ্গে, বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে করবার জিনিস।

ভারত সরকারের পরিকল্পনায়, কর্মের উৎকর্ষে এই অনুভূতিশক্তির প্রভাবের আদৌ স্বীকৃতি নাই। তা যেন এই মৌলিক তত্ত্বটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাতে সুন্দর একটি কার্যতালিকা আছে, একটি বিজ্ঞানসম্মত কার্যপদ্ধতি আছে, একটি সুবিন্যস্ত কর্মীদল আছে। কিন্তু প্রেরণার বড় অভাব পরিলক্ষিত হয়। যাঁরা পরিকল্পনাটি রচনা করেছেন, তাঁরা যেন ধরে নিয়েছেন যে, প্রেরণার কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। ভাল কার্যতালিকা আর ভাল কর্মী হলে কাজ যেন আপনি ভাল হবে। কিন্তু বাস্তবে তো তা হয় না। ভাল ঘোড়া আর ভাল আরোহী থাকলেই ঘোড়দৌড়ে জেতা যায় না, ঘোড়াকে অনুক্ষণ কশাঘাত ক'রে জানিয়ে দিতে হয় যে দ্রুততর গতিতে তার ছোটা প্রয়োজন। এখানে সে ব্যবস্থা নাই। কাজে মন্দা দেখা দিলে, কর্তৃপক্ষ সরকারী-বেসরকারী সকল কর্মীর জন্য ব্যাপকভাবে শিক্ষণের আয়োজন করেন। তাঁদের যেন ধারণা যে শিক্ষণ ভাল হলেই কাজ ভাল হবে, কিন্তু তা হয় না। প্রয়োজন ত্রিবেণী সংযোগের, কিন্তু এখানে তৃতীয় বেণীর প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি নাই। মহাশক্তির উৎস মানুষের অন্তরের মাঝখানেই রয়েছে। তাকে জাগ্রত করতে জানা চাই। কর্মীর মন তার সঙ্গে যুক্ত হলে তার মধ্যে অপূর্ব সাফল্যলাভের শক্তি সঞ্চারিত হত। যার কল্যাণের জন্য কাজ করি, তাকে ভালোবাসতে পারলে, তাকে শ্রদ্ধা করতে পারলে কর্মীর কর্মক্ষমতা বর্ধিত হবে।

আমাদেরই দেশের আর এক মনীষী এই তত্ত্বের তাৎপর্য ভালরকম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি জানতেন দেশাত্মবোধের সঙ্গে পশ্চিমের মানুষ যেমন পরিচিত, আমাদের দেশের মানুষ তেমন নয়। তাই

তিনি ঠিক করলেন তাকে স্বদেশপ্রীতি শেখাতে, অন্য উপায়ে। দেশকে এমনভাবে দেখাতে হবে, যাতে তা প্রীতির ও সেবার পাত্ররূপে প্রতিভাত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় দেশকে আমরা এতদিন জানতাম মাত্র, তাকে পাইনি; তাকে পেতে হবে, ভালবাসতে হবে। দেশ যে আমাদের একান্ত আপনার তা বুঝিয়ে দিতে হবে। সেটা বুঝলে প্রীতির সংযোগ ঘটবে এবং দেশের সেবার আহ্বান অপ্রতিরোধনীয় হয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্য তিনি দেশকে ডাকতে শিখিয়েছিলেন 'মা' বলে, দেশকে অভিনন্দন করতে শিখিয়েছিলেন 'বন্দেমাতরম্' বলে। দেশবাসীকে বুঝিয়েছিলেন, তারা সেই মায়ের সন্তান। তবেই তো দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল আমাদের দেশে। তাই না জুটিয়েছিল সেই মহতী প্রেরণা, যা স্বাধীনতা-আন্দোলনকে জয়যুক্ত করেছিল?

এইখানেই রবীন্দ্রনাথ-স্থাপিত শ্রীনিকেতনের পল্লীগঠনের আদর্শের উৎকর্ষ। তিনি বলেছিলেন:

"দেশের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য আমরা স্থির করিয়াছি, সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই তাহার গৌরব ও স্থায়িত্ব।"

তাই পল্লী-উন্নয়নের কাজে তাদের অফুরন্ত শক্তি ও উদ্যমকে কাজে লাগাতে তিনি যখন বিভিন্ন বয়সের কিশোরদের সংঘবদ্ধ ক'রে গড়ে তুললেন, তিনি তাদের উপদেশ দিলেন 'সেবার ব্রত' গ্রহণ করতে। যে কাজ তারা করবে তা যে নিষ্ঠাভরে করতে হবে, প্রাণপণে করতে হবে, পল্লীবাসীকে ভালবেসে, শ্রদ্ধা ক'রে করতে হবে, সেই কথা যাতে সর্বক্ষণ স্মরণ থাকে, তার জন্য তাদের নাম দিলেন 'ব্রতী দল'। শুধু 'যুবকদল' নামকরণ হলে তাদের যা উৎকর্ষ হত, এই আদর্শেরই জাদুস্পর্শে তা অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

দুর্দশাগ্রস্ত পল্লীবাসীর সেবাকে রবীন্দ্রনাথ শুধু ব্রতের মর্যাদা দিয়ে ক্ষান্ত হননি, তিনি তাকে আরও সম্মান দিয়েছিলেন। তিনি তাকে ধর্মের মর্যাদা দিয়েছিলেন। অবশ্য এটি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তাধারার বিকাশের ফল।

যে চিন্তাধারা তাঁর বিভিন্ন কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে এবং বিভিন্ন আলোচনায় বিকাশলাভ করেছে, তাই পরিণত অবস্থায় তাঁকে এই উপলব্ধি এনে দিয়েছে। একদিন তিনি প্রকৃতিকে ভালবেসেছিলেন। সেই প্রকৃতির বক্ষে এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন শক্তির অবস্থিতি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁকে তিনি অভিবাদন জানিয়েছিলেন 'নিত্যকালের মায়াবী' বলে, 'নটরাজ' বলে। তাঁকে জেনেই তিনি

কান্ত হননি, তাঁকে একান্ত আপনজন রূপে পেতে চেয়েছিলেন। সেই পাওয়ার আকূতি এবং না পাওয়ার কষ্ট তাঁর মধ্যজীবনের কাব্যধারায় প্রধান প্রেরণা ছিল। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং গীতালির কবিতা তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শেষে একদিন তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে যিনি সর্বব্যাপী হয়ে বিশ্বের মধ্যে অদৃশ্যরূপে বিরাজমান, তাঁকে একস্থানে কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি 'অরূপরতন', তিনি 'অন্ধকার ঘরের রাজা', তিনি দেখা দেন না, তিনি আড়াল থেকে ভালবাসেন। কাজেই তাঁকে সেবা নিবেদন করতে হলে মানুষের নিকট তাঁর যে প্রকাশ ঘনিষ্ঠতম, সেই রূপেই সেবা করতে হবে। মানুষের কাছে মানুষরূপেই তিনি ঘনিষ্ঠতম। সুতরাং সকল মানুষের সেবা, সকল মানুষের কল্যাণসাধনই হল পরমসত্তাকে সেবা করবার প্রকৃষ্ট পথ। তাই তিনি বলেছিলেন বনে নয়, বিজনে নয়, আপন মনে নয়,

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

(গীতাঞ্জলি)

তাঁর উপলব্ধিতে তাই বিশ্বজনীন কর্মসাধনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের নিকট পরমসত্তার ঘনিষ্ঠ প্রকাশ যদি মানবরূপে হয়, তা হলে তাঁর ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ হল অবহেলিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত মানুষের মধ্যে। তিনি যেন বিশেষ ক'রে আসন পেতেছেন সর্বহারাদের মাঝখানে। তিনি তাই বলেছেন :

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানেতে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।

(গীতাঞ্জলি)

যিনি আদর্শ সমাজসেবক তিনি যদি অবনত পল্লীবাসীর কল্যাণসাধনকে, দেবতাকে উপাসনায় সমান মর্যাদা দিতে পারেন, তা হলে তিনি এমন শক্তির উৎসের সন্ধান পাবেন যার শেষ নাই, যা তাঁকে আদর্শ সমাজসেবক হবার প্রেরণা দিতে পারবে।

মণিকাঞ্চন যোগ

স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক গ্রন্থগুলি পাঠ করলে মনে হয়, তাঁর দর্শনখানি গড়ে উঠেছে দুটি মূল উপাদান হতে। তার একটি হল শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ এবং অপরটি হল বুদ্ধের সার্বজনীন প্রেম। প্রাচীন ভারতের এই দুই মহামনীষীর চিন্তাধারা যে তাঁর উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শঙ্করাচার্যের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, দক্ষ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য এবং যুক্তিসম্মত চিন্তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তাঁর মনে হয়েছিল শঙ্করাচার্য-প্রচারিত বেদান্ত বিজ্ঞান-সম্মত।

অপরপক্ষে ভগবান বুদ্ধের অহিংসা নীতি তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। ঠিক বলতে গেলে বলা উচিত বুদ্ধকে তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তায় আত্মার অস্তিত্বের স্বীকৃতি নেই, বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বরের স্থান নেই। এগুলির তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। এই পরমকারুণিক মহর্ষি মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল মানুষকে ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাতেও বিবেকানন্দের অনুমোদন ছিল না। এই কারণে, এক সময় তাঁকে গন্ধাসুর বলে অভিহিত করেছিলেন। এতগুলি বিরুদ্ধ ভাব বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, ভগবান বুদ্ধের চরিত্রের একটি গুণ তাঁর বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। সেটি হল তাঁর সকল জীবের প্রতি সুগভীর প্রেম। তাঁর কারুণিকত্ব বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

এই দুই মনীষীর প্রভাব তাঁর ওপর কত অধিক ছিল তাঁর নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হতে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন:

"তার পর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি হৃদয়, অনন্ত সহগুণ; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে জ্ঞানের প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এক্ষণে চাই এই প্রখর জ্ঞানসূর্যের সহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও দয়া সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা বিচারপূর্ণ হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চন যোগ হইবে।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৫)

এই মণিকাঞ্চন-যোগ যেন বিবেকানন্দ-দর্শনেই ঘটেছে মনে হয়। দর্শনের যে আদর্শ তিনি মানসপটে স্থাপন করেছিলেন, তা নিশ্চিত তাঁর চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। ফলে, আমরা দেখি তাঁর দর্শনে দুটি ভাগ আছে। তাদের প্রথমটিকে জ্ঞানকাণ্ড বলতে পারি এবং দ্বিতীয়টিকে কর্মকাণ্ড বলতে পারি। প্রথমটির আলোচনার বিষয় হল বিশ্বের স্বরূপ কি। তা জ্ঞান-সম্পর্কিত সমস্যার উত্তর দেয়। বিবেকানন্দ-দর্শনের জ্ঞানকাণ্ডে যে দর্শন রূপ নিয়েছে, তার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের কোনো ভেদ নেই। ঠিক বলতে গেলে এ বিষয়ে বিবেকানন্দ কোনো নূতন দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করেন নি। তিনি শঙ্করাচার্যের বেদান্তের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন, নিজে তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রচার করেছেন। এখানে বলা যায় তিনি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের ভাষ্যকার।

অপর পক্ষে, কর্মকাণ্ডে তাঁর যে দার্শনিক চিন্তাধারা বিকাশলাভ করেছে, তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব মত স্থান পেয়েছে। এখানেই তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। যিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, তাঁর নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের জগত প্রপঞ্চময়, স্বপ্নের মত তা অসার। তাঁর সব থেকে বড় আকর্ষণ হল আত্মার অপরোক্ষানুভূতি। সাধারণত সে ক্ষেত্রে দয়া, মায়া, মমতা বা করুণাবোধ-প্রণোদিত হয়ে সমাজসেবার প্রতি মানুষ আকর্ষণ বোধ করে না। কিন্তু তাঁর সে আকর্ষণবোধের অভাব হয়নি। এইখানেই বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তার মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়বৃত্তিও যে খুবই প্রবল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্যই বোধ হয় তার দাবীকে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। ফলে আমরা তাঁর দর্শনে পাই দুটি বিপরীতধর্মী ভাবধারার একত্র সমাবেশ। এই ভাবেই তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা বিশিষ্ট ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের রূপ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দার্শনিক মতের সহিত পরিচিত হতে হলে আমাদের শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সহিত প্রথম পরিচয় লাভ করতে হবে। তাঁর সেই অদ্বৈতবাদের সহিত আমাদের দেশের মানুষ অল্পবিস্তর পরিচিত। এমন কি, সাধারণ ভাবে শিক্ষিত মানুষেরও তার সম্বন্ধে একটি ধারণা আছে। শঙ্করাচার্য প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্ব মায়াবাদ নামেই বেশী প্রচারিত। মায়াবাদ বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে, এ হল সেই দার্শনিক তত্ত্ব যা বলে, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'।

কিন্তু শঙ্করাচার্য যে মায়াবাদ প্রচার করেছেন এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার সঠিক পরিচয় দেয় না। তিনি ঠিক এমন কথা বলেন নি যে আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহু, বিমিশ্র বস্তু-সমন্বিত এই জগৎ সর্বৈব মিথ্যা। তিনি বলেছেন যে তাও সত্য, তাও ব্রহ্মতেই অধিষ্ঠিত। তবে তাকে দেখার ভুলে আমরা বহু ও বিচিত্র রূপে দেখি। জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্ম ও জগৎ একই; তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জগৎ সম্বন্ধে ঠিক পরিচয় এনে দেয় না।

কথাটা অন্যভাবে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। বিশ্ব কি বহু, বিমিশ্র, সম্পর্ক-হীন বস্তুর সমষ্টি, না একই সত্তার প্রকাশ? এটি হল দর্শনের একটি মূল প্রশ্ন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বিশ্ব অসংখ্য, বিমিশ্র, বিক্ষিপ্ত বস্তুর সমষ্টি মাত্র। আমাদের দেশে বৈশেষিক দর্শন এই ভাবেই বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছে। গ্রীস দেশের দার্শনিক ডিমোক্রাইটাসও এক অনুরূপ মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে বিমিশ্র বহু অণুর সমষ্টি নিয়ে বিশ্ব রচিত।

কিন্তু তার জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ লক্ষ্য করেছে যে বিশ্বে ঠিক পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বিমিশ্র নানা বস্তুর সমাবেশ নেই। যাকে বহু ও বিচিত্ররূপে আপাতদৃষ্টিতে দেখি তার বিভিন্ন অংশের মধ্যেও সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যধারা লক্ষ্য করা যায়। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দার্শনিক চিন্তাধারা এক নূতন পথে যায়। ফলে, একটি নূতন তত্ত্বের জন্ম হয়, যে তত্ত্ব বলে বিশ্ব বহুকে নিয়ে এক। বিশ্ব সরলভাবে একক বস্তু নয়, তা জটিলভাবে এক। তার মধ্যে বিভাগ আছে, কিন্তু সেই বিভাগগুলির মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বর্তমান। তাদের বহুত্বকে ব্যাপ্ত ক'রে একত্ব প্রকট।

শঙ্করাচার্য এই দুই শ্রেণীর দার্শনিক মতের কোনোটিকেই গ্রহণ করতে পারেন নি। বহুবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ত বটেই, এমন কি, বহু-বিশিষ্ট জটিল একবাদকেও তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বিশ্ব একটি অখণ্ড সত্তাস্বরূপ। তার মধ্যে বহুর স্থান নেই, বিভাগের অবকাশ নেই। তাকে তিনি ব্রহ্মন্ বা আত্মন্ বলেছেন। তার প্রকৃতি হল চৈতন্যময়। তাই তাকে তিনি 'নির্বিশেষ চিন্মাত্রম্' বলেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ চিন্ময়, তাঁর প্রকৃতি চিন্ময়, যেমন লবণখণ্ডের প্রকৃতি লবণের আস্বাদময়। সাধারণক্ষেত্রে চিৎশক্তি-বিশিষ্ট সত্তার চিৎশক্তি প্রকাশ হয় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে। জানবার বস্তু একটা থাকা চাই, তবেই ত জ্ঞাতার জানবার শক্তি প্রকট হবে। জানবার বস্তু কিছু না থাকলে মানুষের মন জানবে কি? কিন্তু তাঁর মতে ব্রহ্ম

সম্পর্কে এ কথা খাটে না। জ্ঞেয় বস্তু থাক বা না থাক, এই চিৎশক্তি নিত্য বিরাজমান। তিনি বলেন, মহাশূন্যে কিরণ গ্রহণ করবার জন্য বস্তু থাক বা নাই থাক, সূর্য যেমন তবু কিরণ বর্ষণ ক'রে যায়; ব্রহ্মের তেমন জ্ঞাতৃরূপ, জানবার বস্তু না থাকলেও, নিত্য অক্ষুণ্ণরূপে বিরাজমান থাকে। ব্রহ্ম হলেন জ্ঞেয়হীন জ্ঞাতৃ-গুণ-বিশিষ্ট সত্তা।

যিনি চিন্ময় বা অবিভাজ্যরূপে একক সত্তা, তাঁকে তবে কেন আমরা বহু ও বিচিত্ররূপে দেখি? তিনি বলেন তার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি খানিক পরিমাণে দায়ী। তারা তাঁর যে পরিচয় আমাদের এনে দেয়, তা ভুল পরিচয়। যার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই, যা সম্পূর্ণ অলীক অথচ দেখি, তাকে আমরা ভ্রান্তি বলতে পারি। যার বাস্তব ভিত্তি আছে, অথচ আমরা যাকে তার প্রকৃত রূপ হতে বিভিন্নরূপে দেখি, তাকে মায়া বলতে পারি। স্বপ্নে যা দেখি তা হল প্রথমটির উদাহরণ, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। মরুভূমির তপ্ত বালু-স্তরে আমরা জল দেখি, তাকে আমরা মরীচিকা বলি। এটি মায়ার উদাহরণ। তপ্ত বালুস্তরের উপরের বায়ু কাঁপে, আর তারই সেই কম্পনকে আমরা জলের রূপে দেখি। তা ভ্রান্তি নয়, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়, তা হলে তাকে কেবল তপ্ত বালুস্তরের ওপর না দেখে যেখানে সেখানে দেখতাম। শঙ্করাচার্যের মতে যা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক, তাকে যে আমরা বহুরূপে দেখি তাও এই ধরনের অনুভূতি। তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, তা মিথ্যা নয়, তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আমরা তাকে ভুল বুঝে তার অপব্যাখ্যা করি। যেমন তপ্ত বালুস্তরের কম্পনকে আমরা মরীচিকা বলে ভুল করি।

কেন এমন দেখি? তারও তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখানে একটি বিশেষ শক্তি ক্রিয়া করে বলে এমন ঘটে। তা যা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক তাকে আমাদের নিকট বহুরূপে বিকৃত বা বিবর্তিত ক'রে দেখায়। বায়ুর তাপ যেমন বালুস্তরের কম্পনকে বিবর্তিত ক'রে মরীচিকার রূপ দেয়, বা একটা সোজা কাঠির খানিক অংশ জলে ডুবিয়ে রাখলে তাকে যেমন বাঁকা দেখায়। এখানে জলের সূর্যকিরণকে আংশিকভাবে বিক্ষিপ্ত করার শক্তি কাঠির রূপকে বিকৃত করে। জলের বিক্ষিপ্ত করার শক্তি এখানে আমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটায়। অপব্যাখ্যাই এই ভ্রান্ত উপলব্ধির কারণ। যে শক্তি একক ব্রহ্মকে বহুরূপে বিকৃত করে, তাকে তিনি মায়া বলেছেন।

বিবেকানন্দ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থে বেদান্তের যে ব্যাখ্যা

দিয়েছেন তা শঙ্করাচার্য প্রচারিত অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যা। বেদান্তের মূল গ্রন্থ হল ব্রহ্মসূত্র। মহর্ষি বাদরায়ণ তা রচনা করেন, উপনিষদে যে তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে তার সার মর্ম নিয়ে। কিন্তু তা সূত্রের আকারে রচিত বলে সোজা পাঠ করলে বোধগম্য হয় না। তাই তার ভাষ্যের প্রয়োজন। তার উপর একাধিক মনীষী ভাষ্য লিখেছেন, কিন্তু তাঁদের পরস্পর মতের এত পার্থক্য যে কোনটি ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা তা বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে। তাদের পার্থক্য এত গভীর ও সুদূর-প্রসারী যে তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিশ্বের স্বরূপ কি, এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হতে পারে। একটি উত্তর হতে পারে যে তা বহু ও বিশ্লিষ্ট বস্তুর সমষ্টি। তাকে আমরা বহুবাদ বলতে পারি। আর এক ব্যাখ্যা হতে পারে যে বহুকে জড়িয়ে নিয়ে জটিলভাবে একই শক্তির ব্যাপক বিকাশ হল বিশ্ব। তাকে পারিভাষিক কথায় সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়ে থাকে। আর এক ব্যাখ্যা হতে পারে, বিশ্ব একই শক্তির রচনা, তিনি ঈশ্বর, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট বিশ্ব হতে স্বতন্ত্র। তাকে একেশ্বরবাদ বলা হয়ে থাকে। শঙ্করাচার্য এদের কোনোটিকেই গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন বিশ্ব অবিচ্ছিন্নভাবে এক বস্তু, তার মধ্যে বিভাগের কোনো স্থান নেই। তাঁর মতকে তাই অবিমিশ্র এককবাদ বলা যেতে পারে। তিনি সর্বেশ্বরবাদকেও স্বীকার করেন না, একেশ্বরবাদকেও স্বীকার করেন না। ব্রহ্মসূত্রের উপর আরো চারজন দার্শনিক ব্যাখ্যা লিখেছেন। তাঁর মত এই চার শ্রেণীর কোনোটির মধ্যে পড়ে না। মধ্বাচার্যের ভাষ্য বহুবাদকে গ্রহণ করেছে। বল্লভাচার্যের ভাষ্য গ্রহণ করেছে সর্বেশ্বরবাদকে। আবার দেখি নিম্বার্কের ভাষ্য গ্রহণ করেছে একেশ্বরবাদকে। রামানুজের ভাষ্যও তাই। সবগুলিই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে বলে সবই বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত। এই বিভিন্ন ভাষ্যগুলি হতে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাকে পৃথক করবার জন্য তাকে অদ্বৈতবাদ বলা হয়ে থাকে। তাকেই বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছেন।

এই অদ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্য হল তিনটি। তা বলে যে, বিশ্ব অবিমিশ্রভাবে এক। তাতে একটি মাত্র সত্তা বর্তমান এবং তিনি হলেন ব্রহ্ম বা আত্মন্। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহু ও নানা বস্তুসমন্বিত যে বিচিত্র জগতের পরিচয় এনে দেয়, তা ভ্রান্ত। সে জগত হতে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু দেখার ভুলে তাঁকে বহু রূপে দেখি। তৃতীয়ত এই ব্রহ্ম চিৎশক্তি-বিশিষ্ট। বিবেকানন্দের বেদান্ত-সম্পর্কিত রচনা বা ভাষণে এই ব্যাখ্যাটিই প্রচারিত হয়েছে। তার দু' একটি উদাহরণ

সমর্থক-যুক্তি হিসাবে এখানে দেওয়া যেতে পারে।

তাঁর 'সন্ন্যাসীর গীতি'-শীর্ষক কবিতায় তিনি বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অদ্বৈতবাদের সারমর্ম সংক্ষেপে বলে। কবিতার সম্পর্কিত অংশটি হল এই :

একমাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অনাম, অরূপ, অক্লেদ, নিশ্চয় ;
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া।

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪)

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই উক্তিটির মধ্যে অদ্বৈতবাদের তিনটি মূল তত্ত্বই পাওয়া যায়। বিশ্বে আছেন একটি মাত্র সত্তা, তিনি হলেন আত্মা। তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাই নেতিবাচক পদে ; তাঁর নাম নেই, রূপ নেই। তিনি জ্ঞাতা-রূপী। বহু ও নানা রূপে যাকে দেখি তা তাঁরই উপর আশ্রিত, কিন্তু তা মায়ার রচনা, তা স্বপ্নের মত অলীক। এই কথাগুলিই তিনি সংক্ষেপে অন্য এক রচনায় এইভাবে বলেছেন :

"অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন, তাঁহার কখন পরিণাম হয় নাই, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নামরূপ এইসকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ৮৪)

এই আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকৃতি যে চৈতন্যস্বরূপ, তার সমর্থনে তিনি একটি যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেন যে আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখি যে, যা জড় বস্তু তা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, একটি স্বতন্ত্র চৈতন্যযুক্ত বস্তুর সহিত সংযোগ স্থাপিত হলেই তা প্রকাশ পায়। কোনো চৈতন্যবিশিষ্ট সত্তা জানলে তবেই তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সুতরাং যিনি স্বপ্রকাশ সেই ব্রহ্ম কখনো জড়ধর্মী হতে পারেন না। তিনি তাই বলেছেন :

"স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্তু দেখা যায় নাই, জ্ঞানই যাহার স্বরূপ। জড় ভূত কখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ১১৩)

মায়াবাদকে তিনি বিজ্ঞানসম্মত মনে করেছেন বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, বিশ্ব সত্যই। যদি অবিমিশ্রভাবে একটিমাত্র সত্তা নিয়ে তা গঠিত হয়, তা হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুর জগতের সব থেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হল মায়াবাদ। তার জন্যই তার গলায় তিনি বরমাল্য দিয়েছেন। এই সম্পর্কে মায়াবাদের তিনি যে প্রশস্তি রচনা করেছেন তা এই :

"কেন সেই এক তত্ত্ব বহু হইল? আর উহার উত্তর—সর্বোত্তম উত্তর—ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর—মায়াবাদ; বাস্তবিক উহা বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এই বহুত্ব কেবল আপাত-প্রতীয়মান মাত্র।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ৩১৮)

এই হল তাঁর দর্শনের জ্ঞানকাণ্ড। অপরপক্ষে কর্মকাণ্ডে দেখি একটি স্বতন্ত্র সুর। আপাতদৃষ্টিতে যিনি ত্যাগী, যিনি সন্ন্যাসী, সংসারের মানুষের ব্যাপারে তাঁর কোনোরকম মনঃসংযোগ আশা করা যায় না। বিশেষ ক'রে যিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, যাঁর উপলব্ধিতে বহু ও নানার বিচিত্র জগৎ স্বপ্নের মতো অলীক, তিনি যে সাধারণ মানুষের দুঃখমোচনের ভার নেবার প্রেরণা পাবেন, তা ভাবা আরও দুষ্কর। কিন্তু বিবেকানন্দের দর্শনে এই দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এ যেন শঙ্করাচার্যের সঙ্গে বুদ্ধদেবকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এমন বিস্ময়কর ঘটনা কেমন ক'রে ঘটল সেইটিই ভাববার কথা। যাকে স্বপ্নবৎ প্রপঞ্চ বলে তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাকে কি যুক্তি প্রয়োগ ক'রে কল্যাণ-কর্মের ক্ষেত্র হিসাবে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তবে যেন মনে হয়, তাঁর মনে বুদ্ধিশক্তি যেমন প্রবল ছিল, অনুভূতি-শক্তিও তেমন গভীর ছিল। তাই বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে যাকে মায়া বলে গ্রহণ করেছেন তাকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। অনুভূতিশক্তির প্রেরণায় তারই জন্য তাঁর হৃদয়ে করুণা প্রবাহিত হয়েছে এবং তাই কর্মকাণ্ডে সমাজসেবার এক উচ্চ আদর্শ তিনি স্থাপন করতে পেরেছেন। মনে হয়, তিনি সত্যই একটা-দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন।

দর্শনের ইতিহাসে এইরূপ দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার দোটানার দৃষ্টান্ত আরও একটি পাওয়া যায়। তা পাওয়া যায় পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্টের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে। তাঁর মনেও দুটি বিভিন্নধর্মী ভাবধারা সমানভাবে শক্তিমান ছিল। এক পক্ষে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী। যুক্তির প্রয়োগে যে সিদ্ধান্ত পাবেন,

তাকে তিনি বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করবেন। অপর পক্ষে, তাঁর নীতিবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা, তাঁর কাছে এটি ছিল একটি মূল দার্শনিক প্রশ্ন। তাঁর যুক্তিবাদী মন এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে দেখল যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যতগুলি যুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাদের কোনোটিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না। তিনি তখন বললেন এই যুক্তিগুলি অসার; সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তখন ওদিকে তাঁর নীতিবোধ এসে বাধা দিল। ঈশ্বর না থাকলে ন্যায়দণ্ডের ভার কে নেবেন? কাজেই এই নৈতিক যুক্তির দাবীতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার ক'রে নিলেন।

বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যেও যেন অনুরূপ একটি দোটানার ইতিহাস বিকাশ লাভ করেছে। বহু বিভিন্ন মানুষ, তাদের দৈন্য, তাদের দুর্দশা, তাদের অশেষ দুর্ভোগ—এ সবই ত বিশ্ব-প্রপঞ্চের অংশ! তাঁর যুক্তিবাদী মন বলবে তারা অলীক, তারা মায়ার রচনা। সুতরাং অকাট্য সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, তাদের সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়ার কোনো অর্থ হয় না। স্বপ্নে যদি কারো দুঃখ বা দুর্দশা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, তা দূর করবার জন্য কি কেউ মাথা ঘামায়? কিন্তু বিবেকানন্দ তা পারলেন না। তাঁর হৃদয়ে ছিল গভীর করুণা। যুক্তির নিষেধকে অগ্রাহ্য ক'রে তাই তিনি এই সংসারের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি প্রচার করলেন বিশ্বজনীন কল্যাণধর্ম।

এ সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি মোটামুটি প্রয়োগ করেছেন তা বলে, প্রপঞ্চময় জগৎ যেন ব্রহ্মেরই প্রকট রূপ। এই যে নানা জীব, নানা মানুষ, এরা সবাই ঈশ্বরের প্রকাশ। সুতরাং সকলেই আমার আপনজন। সেক্ষেত্রে তাদের সেবা করব, না ত কার করব? এ ধরণেরই একটা যুক্তি যেন তাঁর মনে ক্রমশ বল সঞ্চয় করেছে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন:

"অনন্তকাল ধরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সন্তান-সন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই ভালয়, তিনিই মন্দে, তিনিই পাপে, তিনিই পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং তিনিই মরণে বর্তমান।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ২৬০)

এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব আর ঠিক প্রপঞ্চময় মনে হয় না, বিশ্ব তখন ব্রহ্মসত্তার অভিব্যক্তি বলে প্রতিভাত হয়। ফলে অবিমিশ্র একবাদ হতে

মন বহুকে জড়িয়ে নিয়ে এক সর্বব্যাপী সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করে। দার্শনিক অদ্বৈতবাদ ত্যাগ ক'রে সর্বেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তখন দার্শনিকের উপলব্ধিতে বিশ্বে যা কিছু দেখা যায় সবই ব্রহ্ম বলে অনুভূত হয়। এ সেই উপনিষদেরই উপলব্ধি—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই পথেই বিবেকানন্দের সেই উপলব্ধি হয়েছিল। তিনি বলেছেন :

"যাহা কিছু দেখ, শুন বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি—ঠিক বলিতে গেলে তাঁহারই পরিণাম—আরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভু স্বয়ং।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ১৮৭)

এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি দার্শনিক সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়। ঈশ্বরকে কোথায় সেবার জন্য পাব, তাই হল প্রশ্ন। তাঁর ত একস্থানে কোথাও বিশিষ্ট আকারে প্রকাশ নেই। তাঁকে পেতে হলে যার মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান সেই বিশ্বের মধ্যেই পেতে হবে। তার বাদিয়ে পৃথকভাবে তাঁকে পাবার চেষ্টা করা বৃথা। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন :

"বেদান্ত বলেন এইরূপে কার্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, সকলেতেই তিনি আছেন জান, আপনার জীবনকেও ঈশ্বরানুপ্রাণিত, এমন কি ঈশ্বররূপ চিন্তা কর—জানিয়া রাখ, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য—কারণ ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইবে ?"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ২৬৯)

ঈশ্বর সম্বন্ধে বিবেকানন্দের উপরের উদ্ধৃত মন্তব্য হতে দুটি নীতি পাওয়া যায়। প্রথম, ঈশ্বর সকল বস্তুকে ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজমান এবং দ্বিতীয়, তাঁকে পেতে হলে তাদের মধ্যেই পেতে হবে, কারণ, তাঁর ত বিশিষ্ট আকারে প্রকাশ নেই। এই পথেই তাঁর চিন্তাধারা আরও একটু অগ্রসর হয়ে একটি নূতন নীতি উপলব্ধি করেছে দেখতে পাই, যা বলে যে মানুষের নিকট মানুষরূপেই তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রকট। এটি সমর্থিত হবে তাঁর নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হতে :

"ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে তিনি মানুষের ভিতরই প্রকাশিত।"

(ভক্তিরহস্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ১২৯)

এই ভাবে আমরা দেখি তাঁর চিন্তাধারা উপনিষদের একটি মূল ভাবধারার অনুসরণ করেছে। নীতির রাজ্যে একটি মূল সমস্যা হল বিভিন্ন মানুষের মধ্যে

পরস্পরের স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব। প্রতি ব্যক্তি সাধারণত নিজেকে সব থেকে বেশী ভালবাসে, কাজেই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণেই সচেষ্ট। স্বার্থের সহিত পরার্থের দ্বন্দ্ব, তাই, নীতির ক্ষেত্রে একটি মূল সমস্যা।

উপনিষদ এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছে একটি নূতন পথে। বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সংযুক্ত সাহায্যে উপনিষদ তার সমাধান করতে চেয়েছে। উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন চেয়েছে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রসারের ভিত্তিতেই স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ স্নেহ ও ভালবাসার বিস্তারের পথে। এই পথেই মানুষের স্বার্থবোধ পরিশোধিত হতে পারে। ঠিক কথা বলতে কি, মানুষ যে সর্বক্ষণই স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে কাজ করে, তা নয়। সাধারণ মানুষও ক্ষেত্রবিশেষে স্বার্থত্যাগ করতে সক্ষম এবং স্বার্থত্যাগ করেও। প্রয়োজন হলে বন্ধুর জন্য বন্ধু আত্মত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। যেখানে সন্তানের স্বার্থ জড়িত, সেখানে এমন ত্যাগ নেই যা মা করতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরার্থবৃত্তি দুর্লভ নয়।

কেন এমন হয়? উপনিষদে বলা হয়েছে, তার কারণ আছে। এই যে জায়ার নিকট পতি প্রিয় হয়, তা পতির কারণে নয়; এই যে মায়ের নিকট সন্তান প্রিয় হয়, তা সন্তানের কারণে নয়; তার কারণ, তাদের মধ্যে আত্মন্ বা ব্রহ্মন্ আছেন বলে। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেছেন, "আত্মানস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।" আত্মার কারণেই এরা সকলে এমন প্রিয় হয়ে ওঠে। আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু, সাধারণ মানুষ—সকলকে ব্যাপ্ত ক'রে আত্মা বিরাজমান; সেই কারণেই মানুষের নিকট মানুষ প্রিয় হয়ে ওঠে। সর্ব-ব্রহ্মবাদের ভিত্তিই হল এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধি। তাই আনে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতাবোধ এবং সেই ঘনিষ্ঠতাবোধ ভালবাসার বিস্তারকে সম্ভব করে। এই কারণে উপনিষদের ঋষি ঘনিষ্ঠতাবোধের ভিত্তিতে আত্মীয়তাবোধের উদ্রেক এবং আত্মীয়তাবোধের ভিত্তিতে স্বার্থে সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের বাণীতেও অনুরূপ ভাব পাই। তিনি এক জায়গায় বলেছেন:

"ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও দেখা যায় 'স্ব'-এর, এই 'অহং'-এর ক্রমশ বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে। সেই এক 'অহং',—একটা লোক বিবাহিত হইলে দুইটা হইল, ছেলে-পুলে হইলে অনেকগুলি হইল—এইরূপে তাহার 'অহং'-এর বিস্তৃতি হইতে থাকে,

অবশেষে সমগ্র জাতি তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সার্বজনীন প্রেম—অনন্তপ্রেমে পরিণত হয়, আর এই প্রেমই ঈশ্বর।"

(ভক্তিরহস্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ১৪৭)

এইভাবে ঘনিষ্ঠতাবোধ-হেতু প্রীতির বিস্তার ঘটলে সার্বজনীন কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করবার প্রবৃত্তি আপনিই আসে। বিবেকানন্দের সমাজ-কল্যাণের প্রেরণা এই পথেই এসেছিল। তাঁর রচনায় ও বাণীতে পরিণত আকারে যে দর্শনটি গড়ে উঠেছিল তাতে যুগপৎ জ্ঞাননিষ্ঠা ও করুণার একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। তার প্রথম কারণ, তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ, ভগবান বুদ্ধের অপরিমিত কারুণিকতা তাঁকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবিষ্ট করেছিল। এই উভয় মনীষীকেই তিনি কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁর নীচে উদ্ধৃত উক্তি হতে বেশ বোঝা যাবে:

"আমি সেই গৌতম বুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ঐ সম্বন্ধে কখন প্রশ্নই করেন নাই, ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, সারাজীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারাজীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই যাঁহার চিন্তা ছিল।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ ৪৩৪)

এই ভাবে আমরা দেখি, বিবেকানন্দের দর্শনের মধ্যে সত্যই দুই বিপরীত-ধর্মী ভাবধারার একত্র সমাবেশ ঘটেছে। অদ্বৈতবাদের অবিমিশ্র একত্বকে আশ্রয় ক'রে সর্বজনে প্রীতি ও সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগের একটি আদর্শ গড়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ নিজেই তাকে 'মণিকাঞ্চন-যোগ' বলেছেন। এক পক্ষে মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটেছে বৈ কি। অবিমিশ্র অদ্বৈতবাদে যিনি দীক্ষিত তাঁর ত স্বার্থবোধ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারপর নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্বন্ধের বোধের ভিত্তিতে সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ ত সুখসাধ্য সহজ কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ

কখনো কখনো এমন মানুষ দেখা যায়, যাঁর মধ্যে বিপরীত-ধর্মী গুণের একত্র সমাবেশ হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণত যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা সাংসারিক ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসীর মধ্যে সন্ন্যাসী, অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের বিচিত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত তাঁর কাছে প্রপঞ্চময়, তা স্বপ্নের মত অলীক। অনাম, অরূপ, অব্যয়, নিত্যমুক্ত আত্মার অপরোক্ষানুভূতিই তাঁর বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হওয়া উচিত। তিনি যে শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈত বেদান্তদর্শন সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর নিজের রচিত একটি কবিতার দ্বারা সুন্দর ভাবে সমর্থিত হয়। কবিতাটির নাম "সন্ন্যাসীর গীতি"। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তা হতে একটি অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল :

> একমাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
> অনাম, অরূপ, অক্লেদ, নিশ্চয় ;
> তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
> দেখিছে এসব স্বপনের ছায়া।

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪)

এরূপ যাঁর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই তাঁর নিজের সমাজ বা নিজের দেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখতে আশ্চর্য লাগে যে তিনি ছিলেন তার ব্যতিক্রম।

মায়াবাদী সন্ন্যাসী হওয়া সত্বেও তিনি দেশকে প্রাণ ভরে ভালবাসতে পেরেছিলেন। দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা বা দেশপ্রেমিক কবির থেকে তাঁর স্বদেশপ্রেমিকতা কম গভীর ছিল না। তাঁর এই দেশপ্রেমের একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল। দেশের কোনো গুণ আছে বলে তিনি দেশকে ভালবাসতেন না, দোষগুণ বিচার না করেই তিনি দেশকে ভালবাসতেন। দেশ তার স্বদেশ বলেই তাঁর কাছে প্রিয় ছিল, যেমন পিতামাতাকে আমরা পিতামাতা রূপেই ভালবাসি, তাঁদের দোষগুণের জন্য ভালবাসি না। আমরা গুণদোষ-নির্বিশেষে তাঁদের ভালবাসি। এই দেশের সমাজে মানুষ হয়েছি, এই দেশে যৌবন কাটিয়েছি, বার্দ্ধক্যে এই দেশই আমার আশ্রয়। তাই এই প্রীতির যোগসূত্র। তাই স্বদেশ

দোষগুণ-নিরপেক্ষ ভাবে তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ; স্বর্গের থেকেও তার প্রতি আকর্ষণ বেশী। তিনি বলেছেন :

"ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।"

(বর্ত্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ ৫৩)

তাঁর এই দেশপ্রেমের আরও বিশিষ্টতা আছে। অনেক সময় দেখা যায়, দেশপ্রেমের প্রেরণার বশে মানুষ স্বদেশ সম্পর্কে অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশের ওপর কল্পিত গুণরাশি আরোপ করে। এ ধরণের উচ্ছ্বাস মানসিক তৃপ্তিসাধন করে বটে, কিন্তু কল্যাণ আনে না। কেউ বলবেন, এ দেশের তরুলতা যতখানি শ্যামল হয় তেমন শ্যামল তরুলতা আর কোনো দেশে মিলবে না। কেউ বলবেন, আমার স্বদেশ সকল গুণধারা ভূষিত, সকল দেশের তা রাণী হবার দাবী রাখে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ধরণের উক্তি কেবল ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। তাতে স্বদেশ-সেবার কোনো প্রেরণা মেলে না।

বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম এ হতে স্বতন্ত্র। তিনি দেশ যেমনটি সেই ভাবেই তাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে আমাদের দেশমাতা বাস্তবিক বৈষয়িক সমৃদ্ধির দিক হতে আদর্শ নয়, দেশে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে। তিনি জেনেছিলেন, দেশে সকলেই পণ্ডিত নয়, দেশে মূর্খ আছে। তিনি জেনেছিলেন, দেশের সকল মানুষ অভিজাত বংশোদ্ভূত নয় ; দেশে ব্রাহ্মণ আছে, শূদ্র আছে, চণ্ডাল আছে। দেশের হীনতা, দেশের দুর্বলতা, দেশের দারিদ্র্য, দেশের অক্ষমতা সব আছে জানি, তবু দেশ বলেই তাকে ভালবাসব। দেশের যে মানুষ মূর্খ, যে মানুষ দরিদ্র, যে মানুষ অখ্যাত কুলজাত, সকলেই তাঁর দেশবাসী ; কাজেই সকলেই তাঁর ভাই, সকলেই তাঁর পরম আত্মীয়। তিনি তাই আমাদের উপদেশ দিয়েছেন :

"সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"

(বর্ত্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৫২)

এই ধরণের স্বদেশপ্রেমের বিশিষ্টতা হল এই যে, তা কেবলমাত্র ভাবোচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হয় না। তা দেশের কল্যাণকর কর্মে মানুষকে উৎসাহ দেয়। যে ভাই আমার দরিদ্র, যে ভাই মূর্খ, যে ভাই অবহেলিত, তার মঙ্গলবিধানের জন্য

মনে একটা ইচ্ছা আসে এবং সেই ইচ্ছা আমাদের কল্যাণকর্মে প্রণোদিত করে। এমন স্বদেশপ্রেমিকের মনে দেশের সামগ্রিক অধঃপতন এবং দুর্দশা সবিশেষ পীড়া দেয়। ফলে, দেশের দুর্দশামোচন কি পথে হবে সে বিষয় যেমন চিন্তা আসে, তেমন চেষ্টাও আসে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ঠিক তাই ঘটেছিল। এইভাবেই তিনি ভারতবর্ষের বাস্তব দুর্দশামোচনের জন্ম বিশেষভাবে চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এই প্রেরণাই তাঁর ভারত-বিষয়ক চিন্তার মূলে। ফলে আমরা পেয়েছি তাঁর মত তীক্ষ্ণধী মনীষীর চিন্তাপ্রসূত আমাদের সমস্যাগুলির সমাধানের পথ। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল, তাঁর সেই চিন্তাগুলি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনার মধ্য হতে সংগ্রহ ক'রে সুসংবদ্ধ আকারে একত্র স্থাপন করা।

বিবেকানন্দ ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মানুষ। তখন সব দিক দিয়ে ভারত দুর্দশার নিম্নতম স্তরে নেমে গিয়েছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরাধীনতার শৃঙ্খল সে সময় ভারতবাসীর গলায় দৃঢ়বদ্ধ হয়ে বসেছে। তথাকথিত সিপাহীবিদ্রোহ ছিল দেশের মানুষের ইংরেজের নাগপাশের বন্ধন হতে মুক্ত হবার শেষ নিষ্ফল চেষ্টা। ইংরেজ সেই চেষ্টাকে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে দমন করেছে। কোম্পানীর শাসন বিলোপ ক'রে ইংরেজ সরকার ভারতের শাসন-ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। ধর্মের ব্যাপারেও তখন অনুরূপ বিপর্যয় চলেছে। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ ক'রে পশ্চিমের মানুষ আমাদের দেশের মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। বাষ্পীয় যান, টেলিগ্রাফ, কাপড়ের কল প্রভৃতি ভারতে সবে প্রবর্তিত হয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে তাদের এই শক্তি ও সাফল্যের পরিচয় আমাদের দেশের মানুষের চক্ষে পশ্চিমের মানুষের মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে, তারা যা বলে তাকে মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত। হিন্দুর প্রতীক-উপাসনা তাদের কাছে পৌত্তলিকতার সমস্থানীয়, তাদের মতে তা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হতে উদ্ভূত। যে পশ্চিমের মানুষ এত শক্তিমান, এত বিদ্যাবুদ্ধি ধারণ করে, তার অভিমতের মূল্য দিতে হয় বৈকি। কাজেই হিন্দু তার নিজের ধর্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিল। তাই ধর্ম সম্বন্ধে সে নিজেকে অত্যন্ত হীন ও দরিদ্র মনে করল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থা সমান শোচনীয়। ভারতের অর্থনৈতিক বিন্যাস ভারতবাসীর নিজ স্বার্থ দ্বারা আর প্রভাবান্বিত নয়; এক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী জাতির স্বার্থই তাকে রূপ দেয়। ফলে, ভারতীয় যন্ত্রশিল্প বিপর্যস্ত। ভারতের কৃষিও পরিত্রাণ পায় নি; তাও সেই বিদেশী জাতির

শিল্পকে পুষ্ট করতে নিবেদিত। তাই নীলকর সাহেব গাঁয়ের জমিতে চাষীকে নীল চাষ করতে বাধ্য করে। তার জন্য এমন অত্যাচার নেই যা করতে তার দ্বিধা হয়। তাদের সে অত্যাচার কতখানি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, সমকালীন সাহিত্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, বিশেষ ক'রে দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। সত্যই সে যুগ ভারতের বড় আঁধারের যুগ ছিল।

এ বিষয় বিবেকানন্দ অবহিত ছিলেন। ভারতের এই দুর্দশার একটি করুণ চিত্র তিনিও এঁকেছেন। একটা কথা আছে যে দারিদ্র্য-দোষ গুণরাশি নাশ করে। ভারতের সেই যুগের সর্বাঙ্গীণ দারিদ্র্য ভারতবাসীর সত্যই সকল গুণ বিনষ্ট করেছিল। ভারতবাসী এমন হীন মনোভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল যে কুকুরের মত পদলেহনই তার মূল প্রবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেছেন :

"এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতি-দ্বেষ, আছে দুর্বলের যেন তেন প্রকারেণ সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুকুরবৎ পদলেহনে।"

(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৩৫)

এই মহামনীষী কিন্তু এই সর্বগ্রাসী আঁধারের মধ্যেও আশার আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের পূর্বের ইতিহাস যে পথে চলেছিল সে পথে আর চলবে না। ইংরেজের ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপন এমন একটি ঘটনা যা তার ইতিহাসকে নূতন পথে প্রবর্তিত করবে। কারণ, পূর্বে যারা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, ইংরেজ তাদের থেকে বিভিন্ন। ইংরেজ মহাশক্তিমান জাতি এবং তার শক্তির উৎস হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রসার। সুতরাং তার সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সংঘর্ষে বিপ্লব অনিবার্য। সেই বিপ্লব ভারতকে অতীত হতে স্বতন্ত্র পথে নিয়ে যাবে। তিনি তাই বলেছেন :

"সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনী, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা। এবং সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।

এইজন্যই পূর্বে বলিয়াছি এটি অতি অভিনব ব্যাপার—ইংলণ্ডের ভারতবিজয়। এ নূতন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে এবং তাহার

পরিণামে ভারতে কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।"

(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ১৭)

তিনি আরও নজর করেছিলেন যে ব্রিটিশ জাতির ভারতে সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হলেও তা আমাদের ভাগ্যে অবিমিশ্র দুর্ভোগ আনে নি। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে আমাদের ভাগ্যে কিছু সুফলও জুটেছে। তা দুটি বিষয় সম্পর্কে এবং উভয় ক্ষেত্রেই তার তাৎপর্য সুগভীর। প্রথমত, মোগল যুগের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ায়, আমাদের উপর এমন একটি ভৌগোলিক ঐক্য আরোপ করা হয়েছে, যা আমাদের দেশে এক সুদূর অতীতে সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল ব্যতীত আর কখনো হয় নি। দ্বিতীয়ত, ইংরেজের ব্যবসায় ও বাণিজ্য-বিস্তারের চেষ্টা হতে পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে এক শক্তিমান সংস্কৃতির সহিত ভারতের বিভিন্ন অংশের পরিচয় ঘটেছে। একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাবধারা আমাদের দেশের সর্বত্র একরকম বলপূর্বক ছড়িয়ে পড়ে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

এই কথাগুলি নিজের ভাষায় তিনি এইভাবে বলেছেন :

"ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্ত প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে, দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে।"

(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪২)

সমগ্র ভারতভূমি একই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হওয়ায় একটি সামগ্রিক ঐক্যবোধ বিকাশের সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন। তার ফলে, য়ুরোপে যা হয়নি ভারতে যে তা ঘটতে পারে, তাঁর দূরদর্শী মন তা আন্দাজ করেছিল। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা পরিধানে বিচিত্র এই ভারতবর্ষের মধ্যেও একটি সামগ্রিক ঐক্যবোধের ভিত্তিতে এক মহাজাতির অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন। তিনি তাই বলেছিলেন যে, ভারতে বিদেশীসাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্যে দুর্ভাগ্যের সকল লক্ষণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এইখানে সর্বাপেক্ষা কল্যাণ নিহিত আছে।

তিনি আরও বুঝেছিলেন যে আমরা দুর্দশার চরম সীমায় নেমে যে চেতনাহীন কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় অভিভূত হয়েছি, এই নূতন প্রবল জাতির অভিনব ভাবধারার সহিত সংঘর্ষে সেই নিদ্রাও ভঙ্গ হতে পারে। সেটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মঙ্গলের সূচনা। তিনি এই বলেছেন :

"কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে।"

(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪২)

নিদ্রাভঙ্গের পর ভারতের নূতন অভ্যুদয় কোন পথে হবে বিবেকানন্দ সে বিষয়েও বিশেষ চিন্তা করেছিলেন। তার ফলে, সেই পথের দিশাও কিছু কিছু বলে দিতে পেরেছেন। বিদেশীর সাম্রাজ্য তিনি সুনজরে দেখেন নি, কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম এমন অন্ধ ছিল না যে বিদেশী সংস্কৃতির গুণও তাঁর নজরে পড়বে না। তাঁর উদার দার্শনিক মন বিচারশক্তি প্রয়োগ ক'রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে যেমন এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দোষগুলি লক্ষ্য করেছে, তেমন গুণগুলিকেও আবিষ্কার করেছে। তিনি চেয়েছিলেন যেখানে তার গুণ আছে তাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তবে তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। আমাদের সংস্কৃতির মধ্যেও দোষগুণ দুই আছে। তার দোষকে বর্জন ক'রে গুণকে গ্রহণ করতে হবে। সেই রকম আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পশ্চিমের সংস্কৃতির গুণগুলিকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের গ্রহণ করতে হবে।

এই বিষয়টি বুঝতে তিনি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইংরেজের ব্যবহৃত খাদ্যের মধ্যে অনেক পুষ্টিকর খাদ্য আছে। তা আমরা গ্রহণ করব বৈকি। কিন্তু তাই বলে তারা যে রীতিতে আহার করে তা গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই, কারণ সেটা গৌণ জিনিষ। আমাদের রীতি অনুসারে মাটিতে পা গুটিয়ে বসে সে খাদ্য আহার করলে সমানই সুফল পাওয়া যাবে। এবার তাঁর নিজের ভাষাই উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"কাজেই পা গুটিয়ে এদের খাব বৈকি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মত ক'রে—পা গুটিয়ে আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে।"

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, অষ্টাদশ সংস্করণ, পৃঃ ২৬)

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কোন্ গুণ আমাদের গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়েও তিনি বিশেষ চিন্তা করেছিলেন। বিষয়টি বিশ্লেষণ ক'রে তিনি তার মূলে চলে গিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমের মানুষ তার বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে বিশ্ববাসীর মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। তার সেই প্রাণশক্তির উৎসমূলে তিনি চলে গিয়েছিলেন। সেই উৎস হল প্রাচীন গ্রীক বা যবনদের সংস্কৃতি। তাদের অফুরন্ত কার্যক্ষমতা, বিজ্ঞানমুখী যুক্তিবাদী মন ও ইহলোকে প্রতিষ্ঠালাভের অদম্য চেষ্টা—এই গুণগুলিই ছিল বিশেষত্ব। সে সম্ভাবনাময় সংস্কৃতি খৃষ্টধর্মের পরিপোষকদের ধর্মান্ধতার চাপে একদিন চাকা পড়ে গিয়েছিল। সেই সময়টিকে চিহ্নিত করতে পশ্চিমের ইতিহাসে তাই তাকে 'আঁধারের যুগ' বলা হত। পরে নূতন ক'রে সেই সংস্কৃতি যখন য়ুরোপে আবার আবিষ্কৃত হল, তখন তার সঞ্জীবনী প্রাণশক্তির স্পর্শ পেয়ে ওদেশের মানুষ বিকাশের পথে আবার যাত্রা সুরু করল। তবেই ত পশ্চিমের মানুষ বর্তমান কালে এমন দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল। সেই কারণেই, বর্তমান পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যা উৎস সেই যবন-সংস্কৃতির প্রতি বিবেকানন্দ সোজা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত যবন-সংস্কৃতির পার্থক্য কোথায় তা তিনি সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন এই ভাবে :

"ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান; যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা; অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র ত্যাগ, অপরের ভোগ; ....এক জন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতা-প্রাণ; একজন ইহলোকে কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ।"

(ভাববার কথা, দশম সংস্করণ, পৃঃ ১৮)

মোটামুটি, ভারতের সংস্কৃতি সত্ত্বগুণ দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত। তার আদর্শ ত্যাগ, তার লক্ষ্য পরলোক। আর যবনের সংস্কৃতি রজোগুণ-প্রধান। তার আদর্শ ভোগ, তার আদর্শ ইহলোকেই স্বর্গ রচনা করা। তা অত্যন্ত কর্মচঞ্চল। প্রকৃতির মধ্যে লুকানো সকল শক্তির বিষয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন ক'রে তাদের কার্যরীতির সহিত পরিচয় লাভ ক'রে, তাকে ব্যবহার করাই তার লক্ষ্য। এদিকে ভারতে সত্ত্বগুণের প্রভাবটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতীতের জিনিষ। দেশবাসীর উপর তার কোনো ক্রিয়া বর্তমানে লক্ষিত হয় না। এখন ভারতবাসীর মনকে অধিকার ক'রে বসেছে ঘোরতর তমোগুণ। এখন ভারতবাসীর কোনো রকম কর্মে প্রবৃত্তি নেই, গঠনমূলক কোনো কাজে উৎসাহ নেই। সে এখন চরম দুর্দশাগ্রস্ত।

সে মোহাবিষ্ট হয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই অবস্থায় বিবেকানন্দের মনে হয়েছে যে এ রোগের চিকিৎসার জন্য যা প্রয়োজন, তা হল যবনের রজোগুণের সহিত সংস্পর্শ। তার সংস্পর্শে এসেই পশ্চিমের মানুষ নূতন প্রাণশক্তি লাভ করেছে। তার প্রভাব আমাদের মধ্যেও বিস্তারিত না হলে আমাদের ভাবী কল্যাণের পথ অর্গলমুক্ত হবে না। তাই তিনি বলেছেন :

"যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে য়ুরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে চাই তাহাই, চাই সেই উত্তম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা; চাই পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত, সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

(ভাববার কথা, দশম সংস্করণ, পৃঃ ২০)

আমাদের চরিত্রের একটি বিশেষ দোষ যা আমাদের উন্নতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা বিবেকানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি এড়াতে পারেনি। সেটি হল আমরা অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত স্বার্থ ভিন্ন আর কোনো কাজে আমরা উৎসাহ পাইনা। অনেক মনীষী এক্ষেত্রে দেশাত্মবোধের চেতনা ফুটিয়ে দেশের কল্যাণে আত্মবিসর্জনের উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তার আবেদন উন্নত নীতিজ্ঞান-বিশিষ্ট মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা দিয়ে সাধারণ মানুষকে মাতান যায় না। বিবেকানন্দ তাই এ বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষের মধ্যে গোষ্ঠীবোধ প্রস্ফুটিত না করতে পারলে একযোগে সামগ্রিক কল্যাণের কাজে তাদের নিযুক্ত করা যায় না। তার জন্য উচ্চতর আদর্শের কথা না তুলেও ভিন্ন পথে বেশী সাফল্য লাভ করা যায়। ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে গোষ্ঠীর বা সমষ্টির যে অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, সে বিষয় মানুষের জ্ঞান পরিস্ফুট করলে, গোষ্ঠীবোধ আপনি বিকাশ লাভ করবে। একথা বর্তমান যুগে সমাজবিজ্ঞানীরাও বলতে শুরু করেছেন। কিন্তু সেকালে তাঁর পূর্বে আর কেউ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বলে জানা নেই। সমাজ-সম্পর্কিত জ্ঞানের বিস্তার বা সমাজশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এমনভাবে সেকালে কেউ হৃদয়ঙ্গম করেন নি।

মূল কথা হল, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মানুষ সমাজের আশ্রিত জীব হয়ে জন্মায় বলে তার অনেক সুবিধা এসে যায়। সমাজের বিবাহাদি-

সম্পর্কিত ব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রণালী, তার আয়ত্তে যে সকল প্রযুক্তিবিদ্যা আছে, তার সাহিত্য, তার শিল্প, তার জ্ঞানভাণ্ডার—এ সবই ব্যক্তিবিশেষ উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়ে বসে। পূর্বপুরুষের সন্তান হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় উত্তরাধিকার-সূত্রে সে যেমন একটি নানা ইন্দ্রিয়ভূষিত দেহ পায়, এও তেমনি। তাই অনেক সমাজবিজ্ঞানী সংস্কৃতিকে সামাজিক উত্তরাধিকার বলে বর্ণনা করেন। সমাজের আশ্রয় হতে বিচ্ছিন্ন হলে মানুষ সাধারণ চতুষ্পদ জীবের সমস্থানীয় জীবই থেকে যায়। সংস্কৃতির সহিত তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। তা সহজেই প্রমাণ হয় একটি অনতিবিরল দৃষ্টান্ত হতে। মানবশিশুকে অনেক সময় নেকড়েবাঘ হরণ ক'রে নিয়ে পালন ক'রে থাকে, গল্প শোনা যায়। এমন শিশু পরে উদ্ধার হলে দেখা যায় যে, বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে চতুষ্পদ জীবের মতই আচারব্যবহার করে। তার কারণ, শৈশবে মানবসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং, সমাজব্যবস্থা ব্যক্তিবিশেষের বিকাশের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। সমাজের কল্যাণ-সাধন ব্যক্তিবিশেষের উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করে। কাজেই সমাজের জন্য ব্যক্তিবিশেষ যে কল্যাণসাধন করে, তা আত্মত্যাগ নয়, তা নিজের কল্যাণসাধনেরই সমস্থানীয়। ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া তাই বিশেষ দরকার। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ বিশেষ অবহিত ছিলেন। সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা কত গভীর তা বুঝাতে তিনি এই বলেছেন :

"সমষ্টির জীবনে ব্যক্তির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ ; সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি।

(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৩০)

তাই তিনি বলেছেন সমাজ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে, এই বোধ ফুটিয়ে তুলে স্বার্থবোধ দ্বারাই মানুষকে স্বার্থত্যাগে অনুপ্রাণিত করা যায়। যে কাজ সমাজের কল্যাণকর, তা পরোক্ষভাবে ব্যক্তিবিশেষেরও কল্যাণ আনে, এই চেতনা জাগলে, সামগ্রিকভাবে যা কল্যাণ আনে সে কাজে যোগ দিতেও মানুষ উৎসাহ পাবে। সুতরাং দেশের কল্যাণকর কার্যে উৎসাহ দিতে এই পথ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, তাতে সহজেই বেশী সাড়া পাওয়া যাবে। এই মূল সত্যটি তিনি এইভাবে বুঝিয়েছেন :

"স্বার্থ ই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের

দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত, স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ, স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্তও অসম্ভব।"

(বর্তমান ভারত, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪০)

তিনি এই সম্পর্কে আমাদের একটি সুন্দর বাণী দিয়ে গেছেন। তা হল "ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" প্রতি ভারতবাসী যদি এই বাণীর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করে, তা হলে, মুখে স্বদেশপ্রেমিক না হয়ে, তারা দেশের কল্যাণকর্মে স্বভাবতই আকৃষ্ট হবে। আমাদের বর্তমান কালে এই বাণীর ব্যাপক প্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমরা বর্তমানে সামগ্রিকভাবে দেশোন্নয়নমূলক কাজে বিশেষরকম ব্যাপৃত। একের পর একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে এবং সমগ্র দেশ জুড়ে তার কাজ চলেছে। এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য সকল ভারতবাসীর সহযোগিতা প্রয়োজন। তার অনুকূল মনোভাব দেশের মানুষের মধ্যে গড়ে তুলতে এর থেকে সুন্দর বাণী পাওয়া যাবে না।

উপরের আলোচনা হতে এটি প্রমাণিত হবে যে বিবেকানন্দের মনে ভারত-বিষয়ক চিন্তা বেশ বিরাট অংশ জুড়ে বসেছিল। ভারতের দুঃখ, দৈন্য ও দুর্দশা তাঁর মনে গভীর পীড়া দিত। কোন পথে তার দুর্দশা মোচন হবে তা নিবিড় ভাবে চিন্তা ক'রে তিনি কতকগুলি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর

পথে চলতে চলতে অনেক সময় মানুষ দুই রাস্তার সংযোগস্থলে এসে পড়ে। তখন প্রশ্ন ওঠে, কোন পথটায় মোড় ঘুরতে হবে। পথিকের ভাবী অভিজ্ঞতার রূপটি কেমন হবে, তা নির্ভর করে কোন পথে সে মোড় নিল তার উপর।

জাতির ইতিহাসেও এইরকম মোড় ফেরবার দিন আসে। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এইরকম মোড় ঘোরবার দিন এসেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। প্রাচীন শিক্ষা ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা সম্মুখীন হয়েছিল এক মোড় ঘোরবার সমস্যার। কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার সংযোগে এমন একটি অভিনব পরিস্থিতি রচিত হয়েছিল যা ভারতীয় সংস্কৃতির সামনে একটি সম্ভাব্য নূতন পথ খুলে দিয়েছিল। একটি ছিল যে পথে সে অভ্যস্ত সেই গতানুগতিক পথ। আর একটি ছিল সম্পূর্ণ নূতন পথ। এই অভিনব পথের সম্ভাবনা কি ভাবে খুলে গিয়েছিল তা বুঝতে হলে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজ বাংলা সুবার শাসন-ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ে। বাংলা সুবা তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। তারপর মীরকাসেমের পতনের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই সমগ্র সুবার শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করে। তখন ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। এইরূপে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার চক্রে বণিকের মানদণ্ড হঠাৎ একদিন শাসকের রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হল। ইংরেজ তখনো ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তি হয়ে ওঠেনি। তবে সে অবস্থায় উন্নীত হতে তার আর বেশীদিন লাগেনি। সে সময় একটিমাত্র রাজশক্তি তখনও ছিল যা ইংরেজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। তা হল মারাঠা রাষ্ট্রগুলি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর সে শক্তি চূর্ণ হয়ে গেল এবং রাজশক্তি হিসাবে ইংরেজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবার গৌরব অর্জন করল। ভারতের গগনে এক নূতন সার্বভৌম রাজশক্তির উদয় ঘটল।

প্রশ্ন হল, তার ফলে ভারতের সংস্কৃতি কোন পথ নেবে। অতীতের ইতিহাসে কত নূতন রাজশক্তির উদয় হয়েছে, আবার পতন হয়েছে; কিন্তু তার ফলে ভারতের আর্থনীতিক বা সামাজিক বিন্যাস বেশী রকম নাড়া পায়নি। মৌর্য সাম্রাজ্য

এসেছে, মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে। গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। কিন্তু ভারতের সংস্কৃতি তার ফলে বিন্দুমাত্র আন্দোলিত হয়নি। বেদে প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম তার নির্দিষ্ট পথে একরকম চলে এসেছে। এমন কি বৌদ্ধ ধর্মের দীর্ঘ সহস্র বৎসরব্যাপী প্রভাবও তাকে সে পথ হতে বিচলিত করেনি। পরে নূতন ধর্ম নিয়ে নূতন বিদেশী মানুষ এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এককালে মহাপ্রতাপশালী মুঘল সাম্রাজ্য দিল্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাতেও ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন বেশী রকম নাড়া খায়নি। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান এসে বাস করতে সুরু করেছে। ধর্মের বিভিন্নতার ভিত্তিতে তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য কিছু দেখা দিয়েছে, কিন্তু ভারতবাসী প্রধানত হিন্দুই রয়ে গিয়েছে। সম্ভবত ভারতের সমাজ রাজশক্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নয়। তাই রাজশক্তির উত্থান-পতনের সঙ্গে সমাজবিন্যাসের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সমাজ ও সংস্কৃতি তা হতে মুক্ত থেকে নিজের পথেই চলে।

এখন এই যে নূতন রাজশক্তির উদয় হল তা কি ভারতের সংস্কৃতি ও সমাজকে প্রভাবান্বিত করবে? উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ যখন একচ্ছত্র রাজশক্তিরূপে আবির্ভূত হল তখন প্রশ্ন উঠেছিল ভারতীয় সমাজ তাকে উপেক্ষা ক'রে প্রচলিত রীতিতেই চলবে কি? কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল যার জন্য তা চলবে না, এই রকম অনুমান করাই সঙ্গত ছিল। প্রথমত, ইংরেজ শুধু অন্য বিদেশী রাজশক্তিদের মত এক নূতন রাজশক্তি মাত্র ছিল না। তারা কর্মনিষ্ঠ, উৎসাহী ও অধ্যবসায়ী। তুলনায় ভারতীয় সমাজ প্রাচীন, জরাগ্রস্ত ও ভগ্নোদ্যম। দ্বিতীয়ত, তা বিভিন্ন-ধর্মী। হিন্দুদের মধ্যে প্রচারিত উপাসনারীতির সঙ্গে তার ধর্মের বিশেষ পার্থক্য। তারা নিরাকার উপাসনার পক্ষপাতী। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এ বিষয় ইংরেজের প্রভাব বেশী। তারা নিজধর্ম প্রচার করত সোজাসুজি নয়, বিশেষ কৌশলে বুদ্ধি ও যুক্তির প্রয়োগে। ইংরেজ ধর্মযাজক এ বিষয় সুদক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ। কাজেই তার ফলপ্রদ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। তৃতীয়ত, ইংরেজ শুধু একটি বলবান রাজশক্তি নয়, তা এমন একটি নূতন সংস্কৃতির বাহক যা আর্থনীতিক ক্ষেত্রে দারুণ বিপর্যয় আনবার ক্ষমতা রাখে।

বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা অভ্যস্ত। ফলে নূতন প্রাকৃতিক তথ্যসন্ধানে তারা সফল হয়েছিল। সেই তথ্যের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে কাজে লাগাবার কৌশল মানবসমাজে তারা প্রথম অর্জন করেছে। ইংরেজ বালক ওয়াটস কেতলির ঢাকনাকে ফুটন্ত জলের বাষ্প নাড়িয়ে দিতে পারে দেখে আবিষ্কার

করেছিল যে উত্তাপের ফলে জল যখন বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, তা আত্মবিস্তারের জন্ত অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারী হয়।

এই বিদ্যাকে প্রযুক্ত ক'রে পরে যখন তিনিই বড় হয়ে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নির্মাণ করলেন তখন মানবের ইতিহাসে এক নূতন সমাজ-বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিল। তার প্রভাব এমন সুদূরবিস্তারী, তা আর্থনীতিক বিকাশকে এমনভাবে পরিবর্তিত ক'রে দিল যে তাকে বিপ্লব বলা হয়ে থাকে। এই নূতন-আয়ত্ত প্রযুক্তিবিদ্যার বলে ইংরেজ তখন যন্ত্রভিত্তিক শিল্পে অগ্রণী। তাদের দেশে অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষেই এই শিল্পবিপ্লব সুরু হয়ে গেছে। তারা এমন একটি নূতন শক্তির অধিকারী হয়ে দেখা দিল, যার সমাজবিকাশের ওপর প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এমন শক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতা ভারতের জরাগ্রস্ত, স্তিমিত, সংস্কারবদ্ধ সমাজকে রীতিমত নাড়া দেবে, নিঃসন্দেহ। ফলে, ভারতের সংস্কৃতির নূতন পথে মোড় নেওয়া অবধারিত।

ভারতের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তায় বিবেকানন্দ, ফলটি যে এইরূপ হবে অনুমান করেছিলেন। তিনি তাই বলেছিলেন যে রাজশক্তি হিসাবে ইংরেজের ভারতে আবির্ভাব একটি নূতন সম্ভবনার ইঙ্গিতে পূর্ণ। পূর্বে যে সব জাতি এখানে এসেছিল তাদের সহিত ইংরেজের তুলনা করা ভুল হবে। কারণ ইংরেজ তাদের থেকে স্বতন্ত্র। তারা প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রযুক্তিবিদ্যার বলে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তাদের শিল্পে নিয়োগ করেছে। ফলে, উৎপন্ন পণ্য তারা এখানে নিয়ে এসেছে সমুদ্রের পণ্যবীথিকা বেয়ে। কাজেই তারা এক অভিনব মহাশক্তির আধার। তাদের সংস্পর্শ ভারতের ইতিহাসকে নূতন পথে পরিচালিত করতে বাধ্য। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন :

"সে ইংলণ্ডের ধ্বজা কলের চিমনি, বাহিনী পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র জগতের পণ্যবীথিকা। এবং সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।

এই জন্যই পূর্বে বলিয়াছি এটি অতি অভিনব ব্যাপার ইংলণ্ডের ভারত-বিজয়। এ নূতন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে এবং তাহার পরিণামে ভারতে কি পরিবর্তন প্রসারিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গতকাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।"

(বিবেকানন্দ, বর্তমান ভারত)

এই পরিবেশে ইংরেজ যখন আমাদের শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করল তখন তার খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা শিখরদেশে উন্নীত। তার কতকগুলি কারণ

বর্তমান ছিল। ক্ষাত্রশক্তিতে উৎকর্ষ দেখিয়ে ইংরেজ জাতি রণক্ষেত্রে বিজয়গৌরব অর্জন ক'রে কীর্তি স্থাপন করেছে। বাংলা সুবা তাদের করতলগত। দক্ষিণে টিপুসুলতান নিহত, উত্তরে অযোধ্যার নবাব-পরিবার হৃতসর্বস্ব। প্রবল পরাক্রান্ত মারাঠা-শক্তিও তিনবার মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরাজয়ের কালিমা মেখে ভূলুন্ঠিত। তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে লব্ধ প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্য ইংরেজের হাতে প্রকৃতির বিপুল শক্তিকে ধরে এনে দিয়েছে। তারা স্বদেশে নূতন শিল্পবিপ্লব ঘটিয়েছে। তারা তাই আত্মবলে দৃপ্ত এবং আত্মপ্রতিষ্ঠায় গর্বিত। সুতরাং ভারতবাসী আবিষ্কার করল যে, কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরার ফলে যে জাতি আমাদের প্রশাসকের পদে অধিষ্ঠিত হল তারা বীর্যবান, জ্ঞানী এবং অমিত-শক্তির অধিকারী। তাদের প্রতিষ্ঠা, তাদের শৌর্য, তাদের শক্তি ভিন্নদেশীয় শাসক হওয়া সত্বেও আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

অপর পক্ষে, তুলনায় আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি তখন অধঃপাতের অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। সমাজের নেতারা কোনো রকমে সমাজকে জীবিত রাখতে পারলেই যথেষ্ট হয়েছে, মনে করতেন। তাই তাঁরা ঘোরতররূপে রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিলেন। যা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি তা ভাল কি মন্দ, তার অতীতে কার্যকারিতা থাকলেও বর্তমানে প্রয়োগক্ষেত্র আছে কিনা, এ বিষয় তাঁরা চিন্তা করতেন না। তাঁরা মনে করতেন কোন রকমে টিকে থাকাটাই যথেষ্ট। তাই নানা বিধিনিষেধের কৃত্রিম বেড়া সৃষ্টি ক'রে জাতির জীবনকে তাঁরা স্তিমিত ক'রে দিয়েছিলেন। সুতরাং বাহিরের মানুষ সেদিনকার হিন্দুসমাজের অবস্থা দেখে যদি এ রকম সিদ্ধান্ত ক'রে থাকে যে সংস্কৃত-সাহিত্য নানা বিধিনিষেধ ও তার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিয়ে ভরা, তা হলে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

এদিকে সমাজ জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ায় মানুষ তার মনের সজীবতা হারিয়ে ফেলেছিল। স্বাধীন ভাবে চিন্তাশক্তির ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল। একই কারণে মানুষের নীতিবোধ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ফলে এমন অনেক প্রথা ও রীতি প্রচলিত হয়েছিল যা অন্যায় ও অধর্মকে উৎসাহ দিয়ে সমাজকে আরও হীনবল ক'রে তোলে। জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকার ত্বরান্বিত করবার জন্য সতীদাহপ্রথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তথাকথিত কৌলীন্যধর্ম রক্ষার জন্য বৃদ্ধের তরুণী বিবাহ এবং এক পুরুষের বহুবিবাহ রীতিমত প্রচার লাভ করেছিল। পর্দাপ্রথা নারীর জীবনকে ভীষণভাবে সংকুচিত করে দিয়েছিল। গৌরীদান-প্রথা স্ত্রী শিক্ষাকে

আদৌ অবকাশ দিত না। ফলে, আমরা একদিকে যেমন রক্ষণশীল, কুসংস্কারাবদ্ধ, ঘৃণিত সমাজব্যবস্থায় উৎসাহী হয়ে পড়েছিলাম, অপর দিকে তেমন আমাদের চরিত্র হতে সকল মহত্ব নির্বাসিত হয়েছিল। সেদিনকার ভারতীয় হিন্দুসমাজের মানুষের মনের অবস্থার একটি সুন্দর ছবি স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যের মধ্যে পাই। তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতি বিদ্বেষ, আছে দুর্বলের যেন তেন প্রকারেণ সর্বনাশ সাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে।"

(বিবেকানন্দ, বর্তমান ভারত)

এহেন অবস্থায় এই দুই সংস্কৃতির যদি সংঘর্ষ হয় তাহলে সেটা দুর্বলের সহিত বলবানের সংঘাতের সমস্থানীয় হয়ে দাঁড়ায়। একটি সংস্কৃতি যৌবনদৃপ্ত, প্রগতি-শীল, আত্মবিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত। অপরটি জরাজীর্ণ, অবনতির নিম্নতম সোপানে নিপতিত এবং আত্মবলে বিশ্বাসহীন। এই সংঘাতের ফলে আমরা কি একেবারে প্রাচীন সংস্কৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে নূতন সংস্কৃতির আঁখি-বিভ্রান্তিকর রূপ দেখে তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করব? এ প্রশ্নও অনেকের মনে সেদিন জেগেছিল।

এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে যে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মৃত্যু অবধারিত সে বিষয় একাধিক ইংরেজ মনীষীর মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাঁদের ধারণা, পশ্চিমের যে সংস্কৃতির ইংরেজ ছিল বাহক এবং ধারক তুলনায় তার উৎকর্ষ এত বেশী যে একবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত পরিচয় ঘটলেই প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ্ন এদেশের মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাবে। তার জন্য বিশেষ চেষ্টা বা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু ইংরেজি শিক্ষার। এ বিষয় লর্ড মেকলের অভিমতখানি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি সে সময় ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী এবং তাঁর উপদেশমতই পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানশিক্ষণ সরকারের উৎসাহে এদেশে প্রথম প্রবর্তন করা হয়েছিল। তিনি তাঁর পিতাকে লিখিত এক চিঠিতে এ সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন;

"এই শিক্ষার হিন্দুদের উপর প্রভাব বিস্ময়কর। যে হিন্দু ইংরেজি শিক্ষালাভ করেছে সে অন্তরের সহিত নিজ ধর্মে সংযুক্ত থাকতে পারে না। কেহ কেহ সুবিধা আছে বলে তা পরিহার করে না, কিন্তু অনেকে নিজেদের সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী

বলে প্রচার করে এবং কেহ কেহ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের শিক্ষাবিষয়ক নির্দেশ অনুসারে কাজ হলে ত্রিশ বৎসর পর বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজে আর একটিও পৌত্তলিক থাকবে না। অথচ এটি সংঘটিত হবে ধর্মান্তরীকরণের চেষ্টা ব্যতীত এবং ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতায় কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না ক'রে কেবলমাত্র জ্ঞানের স্বাভাবিক প্রচারপথে চিন্তনের ফলে। এই সম্ভাবনা আমার অন্তরকে খুশীতে ভরে দিয়েছে।"

(লাইফ এণ্ড লেটার্স অব লর্ড মেকলে, ২য় খণ্ড, পৃ ৪৬৪)

এইভাবে এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে হিন্দুসমাজে ধর্ম সম্বন্ধে আলোড়নটাই উনবিংশ শতাব্দীতে সব থেকে বড় হয়ে উঠল। তার একটা কারণ ছিল। হিন্দুধর্ম বিকাশের পথে নানা অবস্থার মধ্যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যাকে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বলি সেই রূপটি গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য হল, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁকে একটি বিগ্রহরূপে কল্পনা ক'রে সেই বিগ্রহের সেবা-পূজার ব্যবস্থা। তাকে হিন্দুরা বলে থাকে সাকার উপাসনা। কিন্তু ইংরাজেরা তাকে পৌত্তলিকতা বলেই গ্রহণ করল। খৃষ্টানদের, বিশেষ ক'রে প্রোটেস্টাণ্ট শ্রেণীর খৃষ্টানদের মধ্যে বিগ্রহপূজার বিরুদ্ধে সংস্কার আছে। তাই খৃষ্টান মিশনারিরা হিন্দুধর্মকেই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করল।

তার দ্বিতীয় কারণ হল, আমাদের নিজেদের মধ্যেই আত্মশ্লাঘার অভাব-বোধ। আমরা তখন এমনভাবে অবনতির চরম অবস্থায় নেমে গিয়েছিলাম যে নিজেদের সংস্কৃতির উপরেই শ্রদ্ধা হারিয়েছিলাম। অপর পক্ষে যে নূতন ধর্মযাজক-সম্প্রদায় বিগ্রহপূজাকে নিন্দা করতে সুরু করলেন, তাঁরা সেই ধর্ম প্রচার করেন যা আমাদের বিজেতা ইংরেজ জাতির ধর্ম। তাদের শৌর্য, তাদের প্রযুক্তিবিদ্যা-ভিত্তিক নূতন শক্তিতে অধিকার, তাদের প্রতিষ্ঠা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না ক'রে পারল না। কাজেই নিজেদের নিকৃষ্ট বিবেচনা ক'রে তারা যার নিন্দা করে তাকে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে আমাদের সংকোচ বোধ হল।

এই দুই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে এই দুই সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে আমাদের দেশে ধর্মের ক্ষেত্রে বিপুল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতার সামিল কিনা, সাকার পূজা উৎকৃষ্ট না নিরাকার পূজা উৎকৃষ্ট, এই প্রশ্নটি দেশের মানুষের মনে খুব বড় ক'রে দেখা দিয়েছিল। একদিকে,

ইংরেজ ধর্মযাজক-সম্প্রদায় হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিকতা-দোষদুষ্ট ঘোষণা ক'রে হিন্দুদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অপর দিকে, ইংরেজি শিক্ষার প্রচারের ফলেও নবীন হিন্দুযুবকদের মনে হিন্দুধর্ম বিকৃত, নিকৃষ্ট ও কুসংস্কারপূর্ণ বলে প্রতিভাত হল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের জন্য হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে যাঁরা পড়তে সুরু করলেন তাঁদের মধ্যে যারা তুলনায় মেধাবী তাঁরাই এইভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি বীতরাগ হয়ে পড়লেন। এমন কি অনেকে খৃষ্টধর্মও গ্রহণ করলেন। এই সময় ডেরোজিয়ো নামে এক ইঙ্গ-ভারতীয় তরুণ অধ্যাপক হিন্দুকলেজের ছাত্রদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে পড়েন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে কুসংস্কারমুক্ত হবার জন্য মদ্য সেবন ও গোমাংস ভক্ষণ করতে সুরু করলেন। অনেকে ধর্ম ত্যাগ করলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে উভয়েই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথমে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে চান নি বা অন্যে করে তাও বরদাস্ত করেননি। তাঁরা এখানে এসেছিলেন ব্যবসায় করতে, ঘটনাচক্রে শাসনভার যখন আরোপিত হল তখনও সেটাই রয়ে গেল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। এদেশী ধর্ম বা সমাজ ভাল কি মন্দ তার সঙ্গে তাঁদের স্বার্থ বিশেষ জড়িত নয়। অপর পক্ষে, বিদেশী প্রভুজাতি হয়ে ধর্মে হস্তক্ষেপ করলে ভারতীয়দের মধ্যে নানা প্রতিকূল আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে। কাজেই তাঁরা নিজেরা যেমন ধর্ম নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চাইতেন না, তেমন এও চাইতেন না যে য়ুরোপীয় ধর্মযাজকগণ এখানে এসে প্রচারকার্য চালান। তাঁরা প্রথম দিকেও তা নিষেধই ক'রে দিয়েছিলেন। সেইজন্যই কেরি ও মার্শম্যান তাঁদের খৃষ্টধর্ম-প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন ইংরেজের এক্তিয়ারের বহির্ভূত-স্থান শ্রীরামপুরে। একই কারণে ইংরেজি শিক্ষার প্রচারেও প্রথমদিকে ইংরেজ সরকার উৎসাহিত বোধ করেননি। তাঁরা দেশীয় শিক্ষাপ্রণালীকেই উৎসাহ দিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য কলিকাতায় মাদ্রাসা ও কাশীতে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের সৃষ্টি। কলিকাতায় যে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়েছিল তা হিন্দুদেরই উৎসাহে এবং কয়েকজন বেসরকারী ইংরেজের প্ররোচনায়।

পরে অবশ্য ইংরেজ সরকারের নীতি পরিবর্তিত হয়েছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে

মেকলের সুপারিশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইংরেজি সাহিত্য-শিক্ষা প্রচার করবার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন। মেকলের ধারণা ছিল যে হিন্দুধর্ম একেবারেই অন্তঃসার-হীন। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যের সহিত পরিচয় ঘটলে হিন্দুর ধর্ম ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাঁর এই বিশ্বাসের পরিচয়, তাঁর পিতাকে লিখিত তাঁর চিঠির যে অংশ উদ্ধার করা হয়েছে, তা দেখে।

ঠিক এই সূত্রেই এদেশের রঙ্গমঞ্চে একটি তৃতীয়পক্ষের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের ফলে। ইংরেজি শিক্ষা ভাল রকম প্রচলিত হবার পূর্বেও এদেশে কেহ কেহ ইংরেজি শিক্ষায় নিজ নিজ চেষ্টায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। রামকমল সেন তাঁর ইংরেজি-বাংলা অভিধানের ভূমিকায় লিখেছেন যে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হবার পর থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার একটা আবশ্যকতা দেখা যায়। এইসময় যাঁরা ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর অন্যতম। দ্বারকানাথ ব্যবসায় ও বাণিজ্যে বেশী অনুরাগী ছিলেন এবং ফলে দেশের অন্যতম প্রধান বিত্তবান ব্যক্তির মর্যাদায় আধষ্ঠিত হয়েছিলেন। রামমোহনের মতিগতি ভিন্ন ধরণের ছিল। তাঁর শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য ছিল যেমন গভীর, তেমন ব্যাপক। শুধু ইংরেজি নয়, সংস্কৃত ও ফারসী সাহিত্যেও তাঁর প্রগাঢ় অধিকার ছিল। তিনি ইংরেজের সম্পর্কে এসে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু তা বলে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন নি। তিনি প্রাচীন উপনিষদ ও বেদে একেশ্বরবাদের অস্তিত্বের আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই কারণে যাঁরা অনুরূপ ভাবে সাকার উপাসনায় শ্রদ্ধা হারিয়েছেন তাঁদের তৃপ্তির জন্য 'আত্মীয় সভা' নাম দিয়ে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এক ধর্মসভা স্থাপন করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তাই পরিণতি লাভ ক'রে ব্রাহ্মসমাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ছিলেন দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দ্বারকানাথ রামমোহন থেকে প্রায় বাইশ বছরের ছোট ছিলেন, কিন্তু তা সত্বেও উভয়ের মধ্যে গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। রামমোহন যখন কলিকাতায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, দেবেন্দ্রনাথ তাতে ভর্তি হন। এই ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি রামমোহনের আদর্শের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হন। সুতরাং তিনি যে রামমোহন-স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করেন। ওই

সময় হতেই ব্রাহ্মসমাজ একটি স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ নেয়, ধরা যেতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথ সাকার উপাসনার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সেই বিরোধের প্রেরণা ছিল কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি সুগভীর ভক্তি। ঈশ্বর অশেষ শক্তির আধার, তিনি বিশ্বমানবের পিতা-স্বরূপ, তাঁর নিজস্ব কোন ও স্থূল রূপ নেই—এই মোটামুটি তাঁর ধর্মমতের মূল উপাদান। যিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, যাঁর প্রকট রূপ নেই, তাঁকে মৃণ্ময় মূর্তিতে রূপ দেওয়া তাঁর সংস্কারে অত্যন্ত বাধত। তাই তিনি সাকার উপাসনা কোনো মতেই অনুমোদন করতে পারতেন না। প্রথম জীবনে অবশ্য রামমোহনের মত তাঁর উপনিষদের শিক্ষায় বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ঠিক বলতে 'ঈশ' উপনিষদের প্রথম বাক্য 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' তাঁর মূল প্রেরণার উৎস ছিল। পরে যখন তিনি উপনিষদের বাণীর মর্মার্থ ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম করলেন, তিনি উপনিষদের উপরও বীতরাগ হলেন। উপনিষদের সর্ব-ব্রহ্মবাদকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। সেও কিন্তু সেই একই কারণে—ঈশ্বরের প্রতি অত্যধিক ভক্তি হেতু। যিনি ঈশ্বর, যিনি সব থেকে পবিত্র, দেবেন্দ্রনাথের ধারণায় তিনি তাঁর সৃষ্ট জীব, মানুষ হতে পৃথক। মানুষ পাপ করে, মানুষ অপবিত্র, কাজেই মানুষ কখনও ঈশ্বরের অঙ্গ বা অংশ হতে পারে না। অথচ উপনিষদের মূল শিক্ষা হল, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, বিশ্বের সকল বস্তু, বিশ্বের সকল জীব, বিশ্বের সব কিছু জড়িয়ে, সব কিছু নিয়ে তাঁর অবস্থিতি। অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয় 'তৎ ত্বমসি'। যিনি ব্রহ্ম, তুমিও তিনি। দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরভক্তি এই বাণীকে গ্রহণ করতে পারল না। না পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনা, না উপনিষদের অদ্বৈতবাদ, কোনটিই তাঁর সমর্থন পেল না।

একদিক হতে দেখতে গেলে তাঁর ধর্মমত অনেকটা খৃষ্টানদের একেশ্বরবাদের সমস্থানীয়। উভয়েই এমন এক ঈশ্বরে আস্থাভাজন যিনি তাঁর সৃষ্টি হতে পৃথক। উভয়েই সাকার উপাসনার ঘোরতর বিরোধী এবং হিন্দুর পৌরাণিক পূজা-পদ্ধতিকে পৌত্তলিকতার সমস্থানীয় মনে করেন। তা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্ট-ধর্মের বিরোধী হয়ে পড়লেন। মনে হয় তার কারণ হল, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাবে প্রতীক-পূজার বিরোধী ছিলেন বলে। খৃষ্টানরা নিরাকার উপাসক হলেও আচরণে একেবারে অবিমিশ্র নিরাকারবাদী ছিলেন না। যাঁরা ক্যাথলিক তাঁরা ত খৃষ্টের মূর্তিকে গির্জায় প্রতিষ্ঠা করেই পূজা করেন। তাঁদের এই উপাসনা-পদ্ধতিকে 'ম্যাস্' বলে। তা অনেকটা আমাদের মন্দিরে বিগ্রহপূজার মত। যাঁরা প্রোটেস্ট্যান্ট তাঁরা অবশ্য তার বিরোধী। কিন্তু তাঁরাও খৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে

গ্রহণ করেন। তা ত অবতার হওয়ারই মতন।

যিনি ঈশ্বর তিনি কোনো মর্ত্যরূপ ধারণ করবেন, এ ধারণাও দেবেন্দ্রনাথের কাছে পীড়াদায়ক হত। অবতারবাদও ত এক ধরণের সাকার উপাসনা। সেই কারণে খৃষ্টধর্মকেও তিনি ব্রাহ্মধর্মের পরিপন্থীরূপে দেখেছিলেন। সুতরাং তিনি অবিমিশ্র নিরাকারবাদী ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতি বিরাগ সর্বজনবিদিত। তাঁর উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের প্রতিও পরবর্তী জীবনে যে বিরাগ এসেছিল তার কারণ তাঁর আত্মজীবনী হতে উদ্ধৃত নীচের উক্তি হতে পাওয়া যায়:

"ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য উপাসকের সম্পর্ক, এইটিই ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ। যখন শংকরাচার্যের 'শারীরিক মীমাংসা' বেদান্ত-দর্শনে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত দেখিলাম তখন আর তাহাতে আমাদের আস্থা রহিল না; আমাদের ধর্ম পোষণের জন্য তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মনে করিয়াছিলাম যে বেদান্ত-দর্শনকে ছাড়িয়া কেবল উপনিষদকে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্মের পোষকতা পাইব; এইজন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সমস্ত উপনিষদের উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন উপনিষদে দেখিলাম 'সোঽহমস্মি', তিনিই আমি, 'তত্ত্বমসি', তিনিই তুমি, তখন আবার সেই উপনিষদের উপরেও নিরাশ হইয়া পড়িলাম।"

(মহর্ষির আত্মজীবনী, পৃ ১২৩-২৪)

তিনি যে ঈশ্বরের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি হেতু খৃষ্টধর্মকেও সমর্থন করতে পারেন নি তার সমর্থনও তাঁর নিজের বচনে পাই। ঈশ্বর মানুষের দেহে অবতীর্ণ হয়েছেন বিশ্বাসে তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করাও তাঁর মতে সাকার উপাসনার সমস্থানীয়। সেই কারণেই যীশুখৃষ্ট যে পুত্ররূপী ঈশ্বর, খৃষ্টানদের এই তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। কেশব সেনের নেতৃত্বে যখন একদল প্রগতিশীল ব্রাহ্ম 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' স্থাপন করেন, সেই উপলক্ষ্যে তাঁর উদ্বোধন সভায় মহর্ষি একটি বক্তৃতায় এবিষয় উল্লেখ করেন। তা হতে প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্ধৃত হল:

"আমরা কত প্রকারের অবতার অতিক্রম করিয়া ১১ই মাঘে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। অতএব আমরা কোন প্রকার অবতারের নাম-গন্ধও সহ্য করিতে পারি না। অবতারেরা ক্রমে ক্রমে হৃদয়-মন সকলি কাড়িয়া লয়। অতএব সাবধান হইতে হইবে। যদিচ ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে কোন পুত্তলিকা আক্রমণ করিতে

পারে নাই, তথাপি তাহার বাহিরে খৃষ্ট-বিভীষিকা সকলকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, কত ব্রাহ্ম এখানে আসিতে পারিত, যদি খৃষ্ট-বিভীষিকা না থাকিত।"

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির স্থাপন উপলক্ষ্যে মহর্ষির ভাষণ)

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-সম্পর্কিত আন্দোলনে তিনটি বিভিন্ন পক্ষ জড়িত হয়ে পড়েছিল। একদিকে ছিল প্রাচীন হিন্দুসমাজ তাদের সাকার উপাসনা নিয়ে। অন্য দিকে ছিল খৃষ্টান-সম্প্রদায়, যারা পৌরাণিক বিগ্রহপূজাকে পৌত্তলিকতা বলে ঘৃণা করত। আর তৃতীয় দল হল নূতন ব্রাহ্মসমাজ যা ধীরে ধীরে এক নূতন ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হতে চলেছিল। তার সহিত খৃষ্টান ধর্মের আংশিক মতানৈক্য থাকলেও হিন্দুর সাকার উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে উভয়েই এক দিকে। সুতরাং এই আলোড়নের বিষয়বস্তু হল একটি বিতর্ক। তা যে প্রশ্ন তোলে তা হল, একেশ্বরবাদ-ভিত্তিক নিরাকার উপাসনা হিন্দুর সাকার উপাসনার পরিবর্তে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। সে যুগে শিক্ষিত হিন্দুর মনে এই প্রশ্নটি খুব বড় ক'রে জেগেছিল। এবং তার একান্ত মনঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। যে-দ্বন্দ্ব তার মনে এই ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল তার একটি সুন্দর চিত্র রামমোহন-রচিত একটি কবিতায় পাই। তার অংশ নীচে উদ্ধৃত হল :

মন একি ভ্রান্তি তোমার
আবাহন বিসর্জন বল কর কার ॥
যে বিভু সর্বত্র থাকে ইহাগচ্ছ বল তাকে
তুমি কেবা, আন কাকে, একি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে
ইহ তিষ্ঠ বল তাঁরে, একি অবিচার।
একি দেখি অসম্ভব বিবিধ নৈবেদ্য সব
তাঁরে দিয়া কর স্তব এ বিশ্ব যাঁহার।

শিক্ষিত হিন্দুর মনে এই যে বিভ্রান্তি তা ভারতের সমাজকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করেছিল। যে সমস্যা উঠেছিল তার সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত জাতির যাঁরা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাঁদের প্রধানত এই ধর্মসম্বন্ধীয় বাদানুবাদে জড়িত হয়ে পড়তে হয়েছিল। বাস্তবিক বলতে কি, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধর্মসমস্যা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে সে যুগের যাঁরা মনীষী তাঁদের দৃষ্টি প্রধানত এই বিষয়েই নিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ফলে, তাঁদের শক্তি সামর্থ্য বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যে পরিচালিত হতে পারে নি।

মানসিক সংক্ষোভের বেদনা ত ছিলই, উপরন্তু তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মশক্তি যে গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত হতে পারে নি, সেটিও দেশের অতিরিক্ত দুর্ভাগ্য। যে সব দিকপাল সে সময় এই ধর্মবিষয়ক আন্দোলনে প্রায় সামগ্রিক ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্য মনীষীরা প্রায় অল্পবিস্তর সকলেই এ বিষয় জড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

সুতরাং দেশের শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে মানসিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ক'রে একটি শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই ধর্মসমস্যার একটি সন্তোষজনক মীমাংসার প্রয়োজন হয়েছিল। হিন্দু সেদিন বিভ্রান্ত, সে তার ধর্মের ওপর শ্রদ্ধা হারাতে বসেছে। কাজেই নিজের সংস্কৃতির উপরও তার আস্থা হারাতে বসেছিল। যে জাতি আত্মবিশ্বাস হারাতে বসেছে, নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারছে না, তার থাকে কি? কাজেই এই সাকার উপাসনা বনাম নিরাকার উপাসনার বিতর্কের একটি সন্তোষজনক মীমাংসার সেদিন বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এই প্রশ্নের সমাধান কিন্তু সেদিন শিক্ষিত সমাজে কেউ দিতে পারেন নি। যিনি সমাধান ক'রে দিয়েছিলেন তিনি হলেন এক অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্রাহ্মণ। অশিক্ষিত হয়েও অপরিসাম ধীশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয়ে এই উপাসনা পদ্ধতি-সংক্রান্ত সমস্যাটির তিনিই সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে বিতর্কের উপর যবনিকা টেনে দিয়েছিলেন। তাঁকে আমরা পরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নাম দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। কিন্তু শুধু বাণী পেলে ত হল না, তার উপযুক্ত প্রচার চাই। তা না হলে জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছাবে কি ক'রে। আমাদের পরম সৌভাগ্য সেদিন এক শিক্ষিত প্রতিভাবান তরুণ বাঙালী তাঁর ভাষ্যকারের পদের অধিকারী হয়েছিলেন। ইংরেজি-শিক্ষিত হয়েও, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পরিচিত হয়েও এই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণঠাকুরের মধ্যে তিনি এমন নিধির সন্ধান পেয়েছিলেন যে, তাঁকে গুরুত্বে বরণ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। পরবর্তী জীবনে তাঁরই আশীর্বাদকে পাথেয় ক'রে তিনি মার্কিন দেশে গিয়ে তাঁর গুরুর বাণীর মর্মকথা শুনিয়ে বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন। সে মর্মকথা এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে মানসিক বেদনা হতে তার মনকে পরিত্রাণ ক'রে শিক্ষিত বাঙালীকে তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছিল। তার ধর্মকে সে নূতন ক'রে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিল এবং ধর্মবিষয়ক বিতর্কে মনকে ভারাক্রান্ত না ক'রে অন্য কার্যে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ

পেয়েছিল। সম্ভবত তার ফলেই পরবর্তীকালে দেখি দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-আন্দোলনের কাজে বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যোগ্য গুরুর সেই যোগ্য শিষ্য হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মনে হয়, হিন্দু জাতিকে ধর্মসম্পর্কিত বিতর্ক হতে মুক্তি দিয়ে, নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর নূতন ক'রে প্রত্যাবিষ্ট করাই বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এই ধর্মসম্পর্কিত সমস্যার সমাধান যে পথে হয়েছিল তার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস-খানি বিবৃত করবার পূর্বে কতকগুলি প্রাথমিক কথা বলবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করবে।

ধর্মবোধ মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি। তার ভিত্তি হল অন্য জীবের সহিত তুলনায় মানুষের জীবনের বিশেষ পরিবেশ। অন্য জীবের ধর্মবোধ নেই, কারণ তাদের বুদ্ধিশক্তি মানুষের মত প্রখর নয়। তারা প্রধানত বৃত্তিচালিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। অতীতের স্মৃতি তাদের বিশেষ নেই, ভবিষ্যত সম্বন্ধেও তাদের বিশেষ ভাবনা নেই। তারা একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বর্তমানকে ঘিরেই জীবনধারণ করে।

মানুষের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্র। সে ঠিক বৃত্তিচালিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে না। সে জীবনে যে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় তার বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে সমাধান করে। সে সাধারণ জীব হতে অনেকখানি বেশী জানে, অনেক বেশী বোঝে। তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয় যার সঠিক উত্তর সে পায় না। এই যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সে কোথা হতে আসে সে জানে না। মৃত্যুর গভীর রহস্য সে ভেদ করতে পারে না। জীবনের আদি রহস্যে-ভরা, জীবনের অন্তও রহস্যাবৃত। মাঝখানে খালি একটুখানি আলোর জগত। তাই নিয়ে জীবন। সে জীবন স্থাপিত হয়েছে নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে। অন্য জীবজন্তুর প্রতিকূলতা আছে, প্রকৃতির প্রতিকূলতা আছে। ঝড়ের তাণ্ডব, বিদ্যুতের দাহিকাশক্তি, ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার সহিত সে পরিচিত। এই পরিবেশের মধ্যে সে অবলম্বন খোঁজে, সহায় খোঁজে। বিপদ হতে রক্ষার জন্য, বিশেষ অভিলাষ পূরণের জন্য সে অন্য বৃহত্তর শক্তির সহায়তা কামনা করে। এই অবলম্বনের আকুতিই হল ধর্ম-বোধের ভিত্তি। সমস্যাটা ততখানি জ্ঞানের নয়, যতখানি হৃদয়বৃত্তির। শান্তির জন্য, নির্ভরের জন্য, মনোবল সঞ্চয়ের জন্য তার বেশী প্রয়োজন।

এইভাবে আদিম যুগে মানুষ, একদিন যে অজ্ঞাত শক্তি তাকে পৃথিবীর বক্ষে একান্ত অসহায় অবস্থায় স্থাপন করেছিল, তাকে প্রার্থনা জানিয়েছিল। তখন ধর্মের

রচনা করে। পিতা হতে গোষ্ঠীপতি সমৃদ্ধ, গোষ্ঠীপতি হতে ঈশ্বর না জানি আরও কত বেশীগুণ ঐশ্বর্যবান। তাই ঈশ্বরের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় মানুষের মৃন্ময়ী ধরিত্রী-মাতার সমতল বক্ষে নয়, তা নির্দিষ্ট হয় দুরদুর্গম স্থানে পাহাড়ের শিখরদেশে। গ্রীক দেবদেবীর বাসস্থান কল্পিত হয়েছিল পারনেসাস গিরি-শিখরে। পরবর্তী কালে মানুষের কল্পনা আরও শক্তিশালী হলে ঈশ্বরের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল আরও দুরদিগম্য স্থানে, মর্ত্যভূমিতে নয়, উর্ধ্ব আকাশে অবস্থিত স্বর্গে। মানুষ তখন তাঁকে প্রশস্তি নিবেদন করেছিল 'আওয়ার ফাদার হুইচ আর্ট ইন হেভন' বলে।

এই ভাবেই একেশ্বরবাদ তার পূর্ণ রূপটি গ্রহণ করেছিল। সুতরাং বিশ্লেষণ করলে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রথম, একেশ্বরবাদে ঈশ্বরের সহিত ভক্তের সম্বন্ধটা ব্যক্তিগত, যেমন পিতার সহিত বা রাষ্ট্রপতির সহিত সম্পর্ক। এখানে ধরে নেওয়া হয় যে ঈশ্বরও ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট সত্তা, ভক্তও ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট সত্তা। ঈশ্বর প্রভূত শক্তির আধার। ভক্ত একান্ত অসহায় ও তাঁর উপর নির্ভরশীল। ভক্ত তাঁর কাছে বিপদে রক্ষা চায়, আকাঙ্ক্ষাপূরণে সহায়তা চায়, আবার অহৈতুকী ভক্তি-হেতু কেবল শ্রদ্ধানিবেদনেই তৃপ্তি পায়।

দ্বিতীয় বিষয় যা লক্ষ্য করবার তা হল ভক্ত ও ঈশ্বর—এরা দুটি বিভিন্ন তত্ত্ব, তারা দুটি পৃথক সত্তা। সুতরাং একেশ্বরবাদ ঠিক একবাদ নয়, তা দ্বৈতবাদ। তা দুটি বিভিন্ন ধরণের সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। প্রকৃত একবাদ বলে বিশ্বে কেবল একটিমাত্র সত্তা বিরাজমান, আর কোনো সত্তা নেই। একেশ্বরবাদ তা বলে না, তা বলে বিশ্বে দুটি পৃথক শ্রেণীর সত্তা আছে। একটি হলেন স্রষ্টারূপী ঈশ্বর এবং অপরটি হল তাঁর সৃষ্ট জগত। তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নয়, তারা পরস্পর হতে পৃথক। সুতরাং একেশ্বরবাদ প্রকৃত পক্ষে দ্বৈতবাদী।

সেই কারণেই একেশ্বরবাদ বৈজ্ঞানিক যুক্তির সম্মুখে ভাল রকম নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। মানুষের বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত অগ্রসর হতে থাকে, ততই সে দেখে যে, একেশ্বরবাদের এই দ্বৈতবাদকে সমর্থন করা শক্ত। সে দেখে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সকল যুক্তি ইঙ্গিত করে যে সমগ্র বিশ্ব একটি মাত্র মহাশক্তির লীলাভূমি। সেই মহাশক্তি বহু-বিস্তৃত, বিচিত্র, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে ক্রিয়া করে। সেই মহাশক্তির কর্মপদ্ধতি ঠিক মানুষের কর্মপদ্ধতির মত নয়। মানুষ যখন কিছু নির্মাণ করে সে বাহির হতে করে। প্রকৃতি যা রচনা করে তা সৃষ্ট বস্তুর অভ্যন্তর থেকেই করে। মায়ের

গর্ভে যখন নূতন জীবন সঞ্চার হয়, তা ধীর গতিতে রূপ হতে রূপান্তর গ্রহণ করে এবং অবশেষে মানব শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। তার পরে ও তার অভ্যন্তরে যে সৃষ্টিশক্তি ক্রিয়া করছে তা তার মধ্যে কাজ ক'রে যায়। তার ফলে ক্রমশ বালকে রূপান্তরিত হয়, বালক হতে যুবকে, তবে সে মানুষের পরিণত রূপটি পায়। এখানে বাহির হতে কেউ এ কাজ সম্পাদন করে না। তার দেহের অভ্যন্তরেই প্রতি কোষের মধ্যেই সে-শক্তি অবস্থিত হয়ে ক্রিয়া করছে। কাজেই বিশ্বশক্তির ক্রিয়া করবার রীতি মানুষ হতে বিভিন্ন। তা সৃষ্টির অভ্যন্তরে থেকেই ক্রিয়া করে এবং সেই কারণে তার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা চলে না। তা সম্ভবত নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে বর্তমানে এমন শক্তিশালী দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে যা আকাশের অভ্যন্তর দেশে লক্ষ লক্ষ আলোক বৎসরের দূরত্বেরও নাগাল পায়। তবু কোথাও ঈশ্বর-অধিষ্ঠিত স্বর্গের সন্ধান মেলে না।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে ঈশ্বরের রূপ ভিন্ন রকম হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আর সৃষ্টি হতে পৃথক থাকেন না। তাঁর সৃষ্টি হতে পৃথক কোন প্রকাশ থাকে না। তাঁর ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করাও শক্ত হয়ে পড়ে। সীমার মধ্যেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। যেখানে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তার বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে একটি মাত্র সত্তা ক্রিয়া করছেন সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রকাশের সম্ভাবনা কোথায়? এই মতকেই বলা হয় সর্বেশ্বরবাদ।

সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম যে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে তার জন্য দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ হল, অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা। যে গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ, যার চিন্তাশক্তির দৌড় অল্প তা এমন ধর্ম গড়ে তোলে যেখানে বহু দেবতা উপাসনার অধিকারী হন। যেখানে কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা আরও ব্যাপক এবং চিন্তাশক্তি আরও প্রখর সেখানে মানুষ একক-ঈশ্বরের ভক্ত হয়। আবার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি পেলে একেশ্বরবাদ পরিত্যক্ত হয়ে সর্বেশ্বরবাদ গৃহীত হয়। এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ধর্মের সৃষ্টি হয়। কোনো ধর্ম বহু-ঈশ্বরবাদী, কোনো ধর্ম একেশ্বরবাদী, আবার কোন ধর্ম সর্বব্যাপী, নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়।

আরও একটা শক্তি আছে যা ধর্মের বৈচিত্র্য-সংঘটনের সপক্ষে ক্রিয়া করে। ঈশ্বরকে যে ভক্তি নিবেদন করা হবে তা কি ভাবে হবে? এটা অনুষ্ঠানের বা রীতির প্রশ্ন। সেকালে বৈদিক যুগে হিন্দুরা অর্ঘ্য নিবেদন করত অগ্নিতে

ঘৃতাহুতি দিয়ে। সেখানে একটি প্রাকৃতিক শক্তি ঈশ্বরের প্রতীক হত। তার পরে দেখি যে, মানুষ যখন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়েছে সে প্রার্থনা-সভায় ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তুতি নিবেদনকে উপযুক্ত উপাসনারীতি বলে গ্রহণ করেছিল। এই ভাবে নিরাকার উপাসনা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেছিল। খৃষ্টধর্ম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ইসলামধর্মও তার সুন্দর উদাহরণ। আবার দেখি এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা একটি বিশেষ মূর্তির নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন না ক'রে তৃপ্তি পান না। তাঁরা উপাসনার সুবিধার জন্য বিগ্রহ স্থাপন ক'রে তাঁকে ঈশ্বরের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার ক'রে তাঁর সেবা ও পূজা করেন। রুচির বিভিন্নতাই এখানে বিভিন্ন রীতির উপাসনায় মানুষকে উৎসাহিত করে। এই ভাবে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের সাকার পূজার রীতি প্রবর্তিত হয়।

সুতরাং অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার ভিত্তিতে এবং রুচির ভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরের রূপ সম্বন্ধে এবং উপাসনার রীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থার বা ধারণার জন্ম হয়। আমাদের দেশের মনীষীরা এটা বুঝতে চেষ্টা করতেন এই দুটি সংঘটক কারণের সূত্রেই। এই ভাবেই অধিকারভেদ এবং রুচিভেদ অনুসারে ধর্মের বিভিন্নতার ব্যাখ্যা এসেছে। এই মৌলিক সত্যটি আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হতেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। গীতায় তার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতায় বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তের এক শ্রেণীবিভাগ সূচিত হয়েছে। সেখানে সকল সম্ভাব্য ভক্তকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে— আর্ত, অর্থার্থী, ভক্ত ও জিজ্ঞাসু। যে মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করে যখন বিপদে পড়ে তখন, সে হল আর্ত শ্রেণীর ভক্তের উদাহরণ। যার কোনো বিপদ নেই অথচ বিশেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ঈশ্বরকে স্মরণ করে সে অর্থার্থী। এরাও ভক্ত, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর। এরা ঈশ্বরকে স্মরণ করে নিজের স্বার্থে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কিন্তু যিনি ভক্ত তিনি কোনো উদ্দেশ্য না রেখে আপনা হতেই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ। সেই জন্য তাকে অহৈতুকী ভক্তি বলা হয়ে থাকে। মীরার ভক্তি বা শ্রীচৈতন্যের ভক্তি বা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তি এই শ্রেণীর।

আর যিনি জিজ্ঞাসু তিনি ঈশ্বরকে ততটা ভক্তি করতে চান না যতটা জানতে চান। তাঁর হৃদয়বৃত্তি তত প্রখর নয় যতটা বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর। তাই প্রীতির পথে না গিয়ে জ্ঞানের পথে পরমসত্তার পরিচয় পেতে চান। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হলেন এই শ্রেণীর ভক্ত। গীতায় এই শ্রেণীর ভক্তকেও স্বীকৃতি দেওয়া

হয়েছে। এখানে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত ভক্তের মত নয়। রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গিই উভয়ের এই বিভিন্নতার কারণ।*

সাধারণত প্রচলিত ধর্মগুলি এক একটি বিশেষ শ্রেণীর হয়ে থাকে। কোনোটি একাধিক দেবতায় বিশ্বাসী, কোনোটি একেশ্বরবাদী, কোনোটি আবার উভয় হতেই পৃথক। কিন্তু এমন ধর্মও দেখা যায় যাতে সব শ্রেণীর ধর্ম-সম্পর্কিত মতই স্থান পেয়েছে। হিন্দুধর্ম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার কারণ হিন্দুধর্ম বহু প্রাচীন কাল হতে আপনা-আপনি গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ধর্মমত গৃহীত হয়েছে, হিন্দুধর্ম তাদের সকলকেই তার প্রশস্ত বক্ষে স্থান দিয়েছে, কাউকে বর্জন করেনি। কোনো একটি মাত্র মনীষী দ্বারা তা স্থাপিত হয়নি, তা আপনি বিকাশলাভ করেছে। এই জন্যই তা এমন বৈচিত্র্যে ভরা।

বহু দেবতাবাদেরই কথা ধরা যাক। তার নিদর্শন প্রাচীন বৈদিক যুগে পাওয়া যায়। বেদের প্রথম যুগে ঋষি যেখানেই প্রকৃতির বক্ষে শক্তির বা সৌন্দর্যের আবিষ্কার করেছেন, সেখানেই তার ওপর দেবত্ব আরোপ ক'রে স্তুতি রচনা করেছেন। এইভাবে সমুদ্র বরুণরূপে দেবত্বপদে অধিষ্ঠিত হয়েছে, আকাশ দ্যৌ রূপে, সূর্য সবিতা রূপে। আবার প্রভাত-গগনের রাঙিমায় যে সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাস দেখা যায় তা উষা নামে দেবত্বের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। আবার বেদেরই শেষের যুগে দেখি এই বহু দেবতার মধ্যে এক অতিদেবতা আবিষ্কৃত হলেন, যিনি পৃথিবীযুক্ত বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক'রে আছেন। বিভিন্ন দেবতারা তাঁর মধ্যে বিলীন হলেন। তাঁকে বলা হল 'পুরুষ'। বেদের ঋষি বললেন 'পুরুষ এবেদং সর্বং যৎ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্'। এই সব কিছু যা হয়েছে বা যা হবে, তারা সবই 'পুরুষ'। উপনিষদের যুগে এই 'পুরুষ' ব্রহ্ম নামে পরিচিত হলেন। যিনি সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন তিনিই ত ব্রহ্ম। এই ভাবে প্রাচীনকালেই বহু-দেবতাবাদ হতে সর্বেশ্বরবাদের বিকাশ ঘটল।

সর্বেশ্বরবাদের ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক। কাজেই তাঁকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা ক'রে ভক্ত বা ভগবানের মধ্যে প্রীতির বিনিময় সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনায় যিনি বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি-সমন্বিত তাঁর কোনো অসুবিধা নেই। তিনি

---

* চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভারতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

গীতা ।৭।১৬-১৭

পরমসত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেই সন্তুষ্ট। কিন্তু যাঁর মধ্যে হৃদয়বৃত্তি প্রবল, তিনি ত তাতে তৃপ্তি পাবেন না। তিনি চাইবেন হৃদয়বৃত্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিরূপে ঈশ্বরকে পেতে। এই কারণেই বোধ হয় পরবর্তী যুগে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। এইভাবে সর্বেশ্বরবাদের জন্মের পর হিন্দুসমাজে একেশ্বরবাদ ও সাকার উপাসনার উৎপত্তি হয়েছিল। বাস্তবিক ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের আবির্ভাব হিন্দুধর্মে ঘটেছিল অনেক পরে। বৈদিক যুগে পাই বহু দেবতা হতে এক সর্বব্যাপী দেবতার বিকাশ। উপনিষদে তিনি সর্বেশ্বরবাদের ব্রহ্মে রূপান্তরিত হয়েছেন। তারপর ষড়দর্শনের যুগেও একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভাল রকম প্রকটিত হয়নি। ষড়দর্শনের মধ্যে না বেদান্ত বা মীমাংসা দর্শনে, না ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শনে, না সাংখ্যে ঈশ্বরের স্বীকৃতির উল্লেখ আছে। তাঁকে আমরা প্রথম পাই কেবলমাত্র যোগ-দর্শনে। সেখানেও তিনি পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নন। সৃষ্টির ব্যাখ্যায় নানা তত্ত্বের মধ্যে তিনিও একটি তত্ত্ব মাত্র।

মনে হয় হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনা-সমন্বিত পৌরাণিক সংস্করণ বৌদ্ধধর্মের অনুসরণেই প্রচলিত হয়। ভগবান বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাতে ঈশ্বরের স্থান ছিল না। তিনি এক নৈতিক ধর্ম স্থাপন করেন যা সর্বজীবের প্রীতি ও সেবাকেই উচ্চতম স্থান দিয়েছিল। তাকে তিনি বলেছিলেন 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর ধরে ভগবান বুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত এই নৈতিক আচার পালনই বৌদ্ধদের ধর্মরীতি ছিল। কিন্তু একদিন এল যখন তাঁর ভক্তগণ এই নীরস, নীতিভিত্তিক উপাসনা-পদ্ধতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। যিনি পরম কারুণিক মহর্ষি, যিনি বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য সংসার ত্যাগ করেছিলেন, তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদনের জন্য তাঁদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ভক্তের এই দাবী পূরণের জন্যই বৌদ্ধধর্মের এক নূতন রীতি প্রবর্তিত হল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। সে রীতি নৈতিক বিধান পালনের পরিবর্তে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি মন্দিরে স্থাপন ক'রে তাঁকে শ্রদ্ধানিবেদনকেই উৎকৃষ্টতর উপাসনা-পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করল। তার এই উৎকর্ষ সূচিত করবার জন্য তার নাম দেওয়া হল 'মহাযান' আর তুলনায় পূর্বের রীতির নিকৃষ্টতা বোঝাতে তার নূতন নামকরণ হল 'হীনযান'। মনে হয় তারই অনুসরণে সম্ভবত একই সময়ে পৌরাণিক হিন্দু-ধর্মের সাকার উপাসনা রীতি প্রবর্তিত হয়।

সুতরাং হিন্দুধর্মে সর্বশ্রেণীর উপাসনারীতিই স্থান পেয়েছে। তাতে বহু দেবতাবাদ আছে, একেশ্বরবাদ আছে, সর্বেশ্বরবাদ আছে। তাতে নৈর্ব্যক্তিক

উপাসনার রীতিও আছে আবার সাকার উপাসনার রীতিও আছে। এ বিষয় হিন্দু-ধর্ম অনন্যসাধারণ। তা কোনো বিশেষ মহামানব কর্তৃক স্থাপিত হয়নি। বিভিন্ন যুগের মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও রুচির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বলেই এমনটি ঘটেছে। এ বিষয় তাকে ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অন্য রাষ্ট্রের সংবিধান দেশের রাজনৈতিক নেতারা রচনা করেন। কাজেই তা জটিল হয় না, তা একটি বিশেষ ঐক্যবদ্ধ রূপ নেয়। কিন্তু ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বহু দিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। অন্য দেশে যেমন বিপ্লবের পর পুরাতন সংবিধান একেবারে মুছে ফেলে নূতন সংবিধান রচনা হয় এখানে তা হয়নি। পুরাতন সংবিধান রয়ে গেছে, পরে বিভিন্ন কালে যেমন প্রয়োজন হয়েছে নূতন ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এইভাবে ধীরে ধীরে তা বিকাশ লাভ করেছে। তাই দেখি তাতে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য রাষ্ট্রবিন্যাসের অস্তিত্ব রয়ে গিয়েছে। তারা সংবিধানকে বৈচিত্র্য দিয়েছে অথচ সব কিছু জড়িয়ে এমন একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে যা তাদের সহাবস্থিতি সম্ভব করেছে। তাতে রাজাও আছেন, সামন্তও আছেন, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক-নাগরিকও আছেন।

হিন্দুধর্মের এই বিশেষত্ব রামকৃষ্ণ পরমহংসের নৈসর্গিক মনীষা সহজেই ধরে ফেলেছিল। তিনি তাই উনবিংশ শতাব্দীর এই ধর্ম-আন্দোলনের যুগে এমন এক নূতন বাণী শুনিয়েছিলেন যা অন্য কেউ শোনাতে পারেন নি। তিনি সকল প্রচলিত ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রুচিভেদে মার্গভেদের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন। তিনি নিজে ভক্তিমার্গে অনুরক্ত হয়েও তাই তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দকে অদ্বৈত-সাধনায় উৎসাহিত করেছিলেন। এই উক্তির সমর্থনে নীচে বিবেকানন্দের একটি প্রবন্ধের অংশ উদ্ধৃত করা হল :

"চিকিৎসকেরা যেমন বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা বিভিন্ন ভাবে করেন, বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন তিনিও তেমনি বিভিন্ন লোকের জন্য বিভিন্নরকম সাধনা নির্দেশ করতেন।

• • • •

সাধারণত তিনি দ্বৈতবাদই শিক্ষা দিতেন, অদ্বৈতবাদ শিক্ষা না দেওয়াই ছিল তাঁর নিয়ম। তবে তিনি আমায় অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন, এর আগে আমি ছিলাম দ্বৈতবাদী।"

(বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃ ৩১৩)

রামকৃষ্ণ পরমহংস তাই ধর্ম সম্বন্ধে অনুদার মনোভাব সমর্থন করতেন না।

কোনো বিশেষ ধর্ম যে অন্য ধর্ম হতে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট সে প্রশ্ন তাঁর মতে আদৌ ওঠে না। আমার তৃষ্ণা পেয়েছে, আমি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল চাই। সে জল পুষ্করিণী হতে এল, কি কূপ হতে এল, কি নদী হতে এল সে প্রশ্ন অবান্তর। তৃষ্ণা নিবারণের শক্তি ত তাদের সকলেরই বর্তমান। যে দৃষ্টিভঙ্গি তাদের কোন একটিকে বিশেষ পক্ষপাত দেখায় তাকে তিনি নিন্দা ক'রে 'মতুয়ার বুদ্ধি' বলতেন। তাঁর স্বাভাবিক রীতিতে সহজ সরল ভাষায় তাঁর এই মতটি এই ভাবে ভক্তদের কাছে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন :

"আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খৃষ্টান এরাও পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া ক'রে বসে।...

এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ; ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০)

সাকার আর নিরাকার পূজার তুলনাও একই কারণে তিনি অপ্রাসঙ্গিক মনে করতেন। অধিকার অনুসারে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ব্যবস্থা ভাল, এই ছিল তাঁর মত। তিনি সরল সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে নিজের অননুকরণীয় ভাষণ-রীতিতে তা এই ভাবে বুঝিয়েছেন :

"তুমি মাটির প্রতিমা-পূজা বলছিলে। যদি মাটিরই হয় সে পূজারও প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন, অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয় মা সেইরূপ খাবার ব্যবস্থা করেন।

এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন—যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলাও, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়। বুঝলে?"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ২২)

যে বাণী মানুষের মনকে সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি হতে মুক্তি দিয়ে ঔদার্যমণ্ডিত করে তা শুধু উচ্চারিত হলেই সার্থক হয় না। তার বহুল প্রচারের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ভাষ্যকারের। আমাদের দেশের পরম সৌভাগ্য বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা এমন এক গুণী ভাষ্যকার পেয়েছিলাম। তিনি গুরুর কাছে যা শিক্ষা করেছিলেন তা কর্মে, ভাষণে, জীবনে প্রতিফলিত করেছিলেন। তাঁর প্রচার তিনি দেশবাসীর

মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। অন্তরের মধ্যে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পশ্চিমের মানুষের মধ্যেও এই প্রচারকার্যে তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্যজাতির প্রযুক্তি-বিদ্যাভিত্তিক চোখ-ঝলসানো ঐশ্বর্য আমাদের দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে নিজ ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহপরায়ণ করেছিল। তাদের কাছে হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ঘাটন করলেই এই ব্যাধির সব থেকে ভাল চিকিৎসা হবে। তিনি তাই অন্তর হতে উত্থিত এক আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগোতে যখন সমগ্র বিশ্বের ধর্ম মহাসভা আহূত হয়, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে তাতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

সেই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অনাহূত এসে তিনি যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তা বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতিনিধির হৃদয় জয় করেছিল। সেদিন পশ্চিমের মানুষের চোখে তাঁর মনীষা শুধু স্বীকৃতি পায় নি, ভারতবাসী হিন্দু নিজ ধর্মের উপর আবার আস্থা ফিরে পেয়েছিল। এ বিজয়ের ফল দ্বিমুখী। একদিকে বহির্জগতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা, অপর দিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংঘাতে ধর্ম নিয়ে যে তুমুল আন্দোলন দেশবাসীর মনকে বিক্ষিপ্ত করেছিল, তার উপর যবনিকাপাত। বিবেকানন্দ সেদিন হিন্দুর আত্মবিশ্বাসকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আত্মধর্মে শ্রদ্ধা ফিরিয়ে এনে দিয়েছিলেন এবং সকল দেশবাসীর সামনে ধর্মসম্বন্ধে সহনশীলতার এক পবিত্র আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। মনে হয় সকল কীর্তির মধ্যে এইটিই বিবেকানন্দের মহত্তম কীর্তি।

এই বিজয় গৌরবের প্রধান অস্ত্র ছিল আর কিছু নয়, হিন্দুধর্মের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ। তাঁর শিকাগো ধর্মসভায় প্রদত্ত ক্ষুদ্র ভাষণটি আলোচনা করলেই তার সত্যতা প্রমাণিত হবে। হিন্দুধর্মের এত সুন্দর প্রশস্তি বোধ হয় আর কখনও রচিত হয় নি।

হিন্দুধর্মের প্রাচীনতা, বৈচিত্র্য ও সহনশীলতা এখানে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখান হয়েছে। ভাষণের প্রথম অংশটিতেই তার মর্মার্থ উদ্ঘাটিত হয়েছে :

"সর্ব ধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

* * *

যে ধর্ম জগতকে চিরকাল পরমতম সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করবার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে

করি। আমরা শুধু ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরাজি 'এক্সক্লুসান' শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিতেছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।"

এই দিগ্বিজয়ের সব থেকে বড় সুফল হল তাঁর দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবাসী তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতে আবার বলতে পেরেছিল "ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর।" বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। তাঁর এই মহতী কীর্তি বাঙালী তথা ভারতবাসীকে ধর্ম-আন্দোলনের বিক্ষোভ হতে মুক্তি দিয়েছিল।

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশে নানা ভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের ব্যবস্থা হয়েছে। উৎসব, মেলা, স্মারক-গ্রন্থ, প্রতিকৃতি-উন্মোচন, বা মর্মরমূর্তি স্থাপন—এ গুলি তার অঙ্গ। এমন কি তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের একটি পরিকল্পনাও কার্যকরী হতে চলেছে। এমন ভাবে যে দেশের লোক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে মাতবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, বরং তা খুবই স্বাভাবিক। যিনি দেশের ধর্ম ও দর্শনকে বিদেশের মানুষের কাছে প্রচার ক'রে তাদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করেছেন, যাঁর ভারত-চিন্তা ভাবী স্বাধীন ভারতের এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত ক'রে দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করেছে, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসীর জন্ম যিনি সাম্যের ভিত্তিতে ঐশ্বর্যবন্টনের প্রয়োজনীয়তার কথা দেশবাসীকে সেই সুদূর অতীতে শুনিয়ে গেছেন, তাঁর প্রতি দেশবাসীর হৃদয় নুয়ে পড়বে না ত কি?

কিন্তু একটা বিষয় সাধারণত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কি যে তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেশময় আপনা-আপনি রচিত হচ্ছে? রামকৃষ্ণ-মিশনের নানা কল্যাণপ্রতিষ্ঠান এবং সেগুলিকে যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় পরিচালিত করেন, এই উভয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না, যদি না উপযুক্ত কর্মীর সেবা পাওয়া যেত। তাঁদের কর্মনৈপুণ্য, তাঁদের স্বার্থবিহীন নিবেদিত-জীবন এবং তাঁদের জনকল্যাণে সুগভীর অনুরাগ তা সম্ভব করেছে। তাই দেখি তাঁদের কর্ম-বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, চিকিৎসালয়, পাঠাগার, সমাজ-শিক্ষাকেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রভৃতির রূপ নিয়ে দেশের নানা স্থানে গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক কালে দেশে এই ধরণের যে প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা সবই এই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ কলিকাতার আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিকেন্দ্র আজ দেশের গর্বের বস্তু। কলিকাতার দক্ষিণে নরেন্দ্রপুরে অবস্থিত আবাসিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কলিকাতার উত্তরে রহড়ায় অবস্থিত আবাসিক অনাথবিদ্যালয় নিজ উৎকর্ষগুণে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছে। বিহার প্রদেশে রঁাচির নিকটে যক্ষা-চিকিৎসাকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যনিবাস পীড়িতের সেবায় দক্ষতা অর্জন ক'রে একটি আদর্শ স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হয়েছে।

এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই রামকৃষ্ণ-মিশন-প্রতিষ্ঠিত এবং মিশনের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত। যা ছিল জনমানবহীন জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল তা হয়ে উঠেছে একটি সমৃদ্ধ জনপদ। সেখানে মনোরম পরিবেশের মধ্যে খেলাধুলা, পড়াশোনা, সভা-সমিতি, মেলা প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো নানা উৎসব লেগে রয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিরই উদ্দেশ্য হল এই ভাবে পাঠ, আলোচনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে এমন মানুষ গড়ে তোলা, যারা হবে একাধারে চরিত্রবান্ ও কল্যাণব্রতী।

আবার এমন নিবেদিত-প্রাণ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ও গড়ে উঠত না, যদি না তাঁরা বিবেকানন্দ প্রবর্তিত এক অভিনব ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতেন। ভারতবর্ষ চিরকালই সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ। সংসার ত্যাগ ক'রে অধ্যাত্ম-সাধনায় আত্মনিয়োগ করবার মানুষের এ দেশে কোনো দিনই অভাব হয় নি। তবে তাঁদের সঙ্গে তুলনায় এই নূতন সম্প্রদায়টির দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বড় রকম পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়; অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা সাধনতত্ত্ব নিয়ে সমাজের বাইরে থাকেন। তাঁরা ভজন-পূজন বা যোগাভ্যাসের দ্বারা একা-একা সিদ্ধি লাভ করেন। মানবসমাজের তাঁদের নিকট হতে কোনো সেবা পাবার সুযোগ নেই, কারণ তাঁরা সংসার হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বৌদ্ধযুগে সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হত। তাদের সংঘ বলা হত। সেই সংঘে যাঁরা শরণ নিতেন তাঁদের সঙ্গে সমাজের কল্যাণের যোগ ছিল বলে জানা নেই। তাঁরা মুক্তির সাধন করতেন কল্যাণকর্মে বড় একটা আত্মনিয়োগ করতেন না। এই কারণে বিবেকানন্দের ভগবান বুদ্ধের উপর একটি গুরুতর অভিযোগও ছিল। সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রকম সংঘজীবনে আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁর মতে আমাদের দেশের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-মিশনেই প্রথম দেখি একটি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক নূতন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এঁরা সংসার ত্যাগ করেছেন নিশ্চিত, কিন্তু সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হন নি। নানা কল্যাণকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের সেবা এঁদের সঙ্গে সমাজকে সর্বদা সংযুক্ত রেখেছে। তাঁরা সাধন-ভজন করেন সত্য কিন্তু তা বলে কল্যাণ-স্পর্শ হতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করেন না। সমাজসেবাও তাঁদের ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির এই বিস্ময়কর পরিবর্তন তাঁদের এমন কর্মদক্ষ, এমন ন্যায়পরায়ণ এবং জনসেবায় উন্মুখ ক'রে গড়ে তুলেছে। এই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ই বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এই অভিনব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল বিবেকানন্দের মনে দুটি বিভিন্নধর্মী গুণের একত্র সমাবেশ হয়েছিল বলে। এক দিকে যেমন তাঁর মনীষা ছিল অনন্য-সাধারণ, তেমনি হৃদয়বৃত্তি ছিল প্রবল। তাঁর মনীষা তাঁকে শঙ্করাচার্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। শঙ্করাচার্যের বিভিন্ন রচনায়, বিশেষ ক'রে ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদগুলির উপর লিখিত ভাষ্যে তাঁর প্রজ্ঞার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ নৈপুণ্য, গভীর ধী-শক্তি এবং প্রাঞ্জল ভাষা এগুলিকে দার্শনিক রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গড়ে তুলেছে। সেই জন্যই বেদান্ত-দর্শনের উপর তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা এবং শঙ্করাচার্যের জন্য প্রগাঢ় ভক্তি।

অপর পক্ষে তাঁর হৃদয়বৃত্তি তাঁর মনকে ভগবান বুদ্ধের মত মানবসমাজের নানা দুঃখকষ্টের প্রতি টেনেছে। বুদ্ধ স্বয়ং ছিলেন একান্ত ভাগ্যবান মানুষ। রাজবংশে তাঁর জন্ম, পিতা স্নেহশীল। সেই পিতা তাঁর সমস্ত রাজশক্তি, সকল ঐশ্বর্য নিয়োগ করেছিলেন পুত্রকে দুঃখকষ্টের স্পর্শ হতে মুক্ত রাখতে। কিন্তু পুত্রের হৃদয়ভরা করুণা। তাই ত তিনি মানবজীবনের দুঃখমোচনের জন্য সদ্যোজাত পুত্র, অনুরাগিণী পত্নী ও স্নেহশীল পিতাকে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগের এই অপূর্ব দৃষ্টান্ত সেকালের মানুষের হৃদয়কে এমন মুগ্ধ করেছিল যে তারা তাঁর নাম দিল 'পরম কারুণিক মহর্ষি'। বর্তমান কালে তাঁর অনন্যসাধারণ করুণার দৃষ্টান্ত বিবেকানন্দকেও কম মুগ্ধ করে নি। ভগবান বুদ্ধের দর্শনকে বিবেকানন্দ গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর করুণার জন্য শঙ্করাচার্যের মতই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

এই কারণে দেখি উভয় মনীষীর প্রতিই তাঁর ছিল সমান শ্রদ্ধা এবং উভয়ের গুণকে একত্র অধিষ্ঠিত হতে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁদের উভয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল, তা নীচে উদ্ধৃত তাঁর উক্তির দ্বারা ভালো ভাবে প্রমাণিত হবে:

"তারপর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি হৃদয়, অনন্ত মহৎগুণ, তিনি ধর্মকে সর্ব-সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে জ্ঞানের প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এক্ষণে চাই, এই প্রখর জ্ঞানসূর্যের সহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও দয়া সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা বিচারপূত হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চন-যোগ হইবে।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ)

এই মণিকাঞ্চন-যোগ বিবেকানন্দের মধ্যেই ঘটেছিল। তাই আমরা তাঁকে দেখি দুই রূপে। এক রূপে তিনি বেদান্তের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক এবং অপর রূপে তিনি দরিদ্রনারায়ণের পূজারী। এই কারণেই তিনি একাকী নিজের আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারেন নি। এই কারণেই দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীর কল্যাণ-সাধনে তিনি ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। বুদ্ধদেবকে বলা হত পরম কারুণিক মহর্ষি। তাঁর সেই কারুণিকত্ব বিবেকানন্দের কি গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, নীচে উদ্ধৃত তাঁর বচন হতে তার ভালো পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন:

"আমি সেই গৌতম বুদ্ধের মতো চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি এই সম্বন্ধে কখনও প্রশ্ন করেন নাই, এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয় ইহাই তাঁহার চিন্তা ছিল।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ)

তাঁর কল্যাণবুদ্ধির প্রতি এই আকর্ষণই তাঁকে অদ্বৈতবেদান্তের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি এই ব্যবহারিক জগতেই সমাজের মাঝখানে বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিবেদনের মধ্যেও বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর কর্মক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা এই বলে:

"বেদান্ত বলেন এইরূপে কার্য কর সকল বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি কর, সকলেতেই তিনি আছেন জানো, আপনার জীবনকে ঈশ্বরানুপ্রেরিত, এমন কি ঈশ্বর স্বরূপ চিন্তা কর; জানিয়া রাখো, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য, কারণ ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইব?"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ)

এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই তিনি সেই নীতি গড়ে তুলেছেন যা হল রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সমাজসেবামূলক কার্যের প্রেরণা। তা বলে মানুষের নিকট মানুষ রূপেই ঈশ্বর ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রকট। কাজেই মানব জাতির সেবা ঈশ্বরসেবারই সমস্থানীয়।

এই অভিনব জীবনবেদের প্রতিষ্ঠাই বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসী এমন নিপুণ সমাজসেবী হয়ে

দেশের সকল মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। সেই কারণেই তাঁরা যা স্পর্শ করেন, তাই সোনা হয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ মিশনই বিবেকানন্দের স্মৃতিকে দেশের মানুষের স্মৃতিপটে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার ক্ষমতা রাখে। তাই তাঁর চরণে জন্মশতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দুই মনীষী

স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ একই যুগের মানুষ ছিলেন। এক রকম তাঁরা প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রজ এবং বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র দু' বছর। আবার উভয়ের জন্মক্ষেত্র একই। উভয়েই কলিকাতা মহানগরীর সন্তান। আরও আশ্চর্য কথা, তাঁরা জন্মেছিলেন এক পাড়াতেই। উভয়েরই পৈতৃক ভদ্রাসন উত্তর কলিকাতায় অবস্থিত। বিবেকানন্দের পিতার নিবাস ছিল বাগবাজারে আর রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক গৃহ ছিল জোড়াসাঁকোয় অবস্থিত। এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাঁদের উভয়েরই তরুণ বয়সে পরস্পরের সহিত সংযোগ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দীপেন্দ্র নরেন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে আসতেন। সেকালের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র সঞ্জীবনীর সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। তাঁর বিবাহ হয়েছিল রাজনারায়ণ বসুর কন্যার সহিত। এই মহিলার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, তাঁদের সেই বিবাহ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত কয়েকটি সংগীত গাওয়া হয় এবং বিবেকানন্দ স্বয়ং তা গেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন তরুণ উদীয়মান কবি। আর বিবেকানন্দ তখন ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত, প্রতিভাদীপ্ত তরুণ যুবক। সঙ্গীতে ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। সুগায়ক হিসাবে কিছু খ্যাতিও তিনি অর্জন করেছিলেন। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ-রচিত গানগুলি গাইবার ভার পড়েছিল তরুণ গায়ক নরেন্দ্র নামে পরিচিত বিবেকানন্দের উপর। সেই উপলক্ষ্যে তাঁরা নিশ্চয় পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সন্নিধি লাভ করেছিলেন।

অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, উত্তর জীবনে যখন উভয়ে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকৃতি লাভ করেন তখন তাঁদের পরস্পরের সহিত সংযোগের কোনো প্রমাণ আমরা পাই না। রবীন্দ্রনাথের উত্তর জীবনে অন্য সমকালীন স্বদেশবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতার অনুরূপক্ষেত্রে একাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর কথা এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। এঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ত ছিলই এমন কি প্রীতির বন্ধনও বর্তমান ছিল। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে এই অবস্থার ব্যতিক্রমের সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের অনুজ হলেও তাঁর মত দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারেন নি। সেই কারণেই সমসাময়িক হলেও রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁর একই সময়ে অবস্থিতির কাল অনেক সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। বিবেকানন্দের পরলোক গমনের পরেও রবীন্দ্রনাথ প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। অবশ্য বিবেকানন্দ নাটকীয় ভাবে তাঁর শিকাগোয় প্রদত্ত ভাষণের পর বিশ্ববিখ্যাত মানুষের মর্যাদা পেয়েছিলেন। তবে কি এমন অনুমান করা সঙ্গত হবে যে, বিবেকানন্দের জীবনকালে রবীন্দ্রনাথ তেমন বৈশিষ্ট্য লাভ করেন নি বলেই পরস্পরের সহিত আকৃষ্ট হন নি? বিবেকানন্দের জীবনে খ্যাতি লাভ অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে হঠাৎ সংঘটিত হয়েছিল বলেই অনেকে এরকম ধারণা করেন। শিকাগোতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মহাসম্মেলনে প্রদত্ত হিন্দু ধর্মের সমর্থনে ভাষণ একদিনে বিশ্বময় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর অভ্যুত্থান যেন উল্কার গতিতে, উল্কার দীপ্তি নিয়ে। একদিনেই তিনি বিশ্ববিশ্রুত দেশ-নেতার গৌরব নিয়ে জাতির সম্মুখে উদিত হয়েছিলেন। সেদিন হতে বিবেকানন্দের অবশিষ্ট জীবনে তাঁর সহিত তুলনায় রবীন্দ্রনাথ তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি।

অবশ্য দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে সে সময় একাধিক মনীষী আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' প্রকাশ হয়ে গেছে। বইখানি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তার মধ্যে ভাবী বৃহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখে তিনি রবীন্দ্রনাথকে আশীর্বাদও করেছিলেন। তারও এক বৎসর পূর্বে 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য রচিত হয়েছিল। ঠাকুর বাড়ীতে তার যে অভিনয় হয়েছিল তাতে দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটিকাটির অভিনয় দেখে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এই উদীয়মান কবির জন্য কবিতায় একটি প্রশস্তি রচনা ক'রে দিয়েছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে 'রাজর্ষি' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। 'মানসী'তে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা বেশ পরিপুষ্ট রূপ নিয়েছিল। সুতরাং ১৮৯৩ অব্দে রবীন্দ্রনাথ দেশের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে এই বৎসর বিবেকানন্দের কীর্তির দীপ্তি রবীন্দ্রনাথের কীর্তিকে ম্লান ক'রে দিয়েছিল। দেশের মানুষের মনে অনুরূপ আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত হয়েছিল, বিবেকানন্দের তিরোধানের অনেক পরে। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর তিনি সে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু তার দশ বৎসর পূর্বে

বিবেকানন্দ চলে গিয়েছিলেন। তবে কি অনুমান করতে হবে যে উভয়ের মধ্যে সমকক্ষতার অবস্থা বিবেকানন্দের জীবনকালে আসে নি বলেই তাঁরা দূরে দূরে রয়ে গেলেন ?

মনে হয়, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য অনুমান করা দুষ্কর। দুজন সমকালীন প্রতিবেশীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হতে যে দুজনের খ্যাতির সাম্যাবস্থা থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সমধর্মী হলে মানুষের পরস্পরের সহিত আকৃষ্ট হতে এটি বাধা বলেই আদৌ পরিগণিত হবে না। আমরা প্রমাণ পাই যে, এই ঠাকুর পরিবারের আর একটি মানুষের সঙ্গে বিবেকানন্দের ইচ্ছাতেই তাঁর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল। তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথেরই ভাগিনেয়ী সরলা দেবী। সরলা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। বাগ্মী বলেও তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিবেকানন্দ তাঁকে বেলুড় মঠে আমন্ত্রণ ক'রে তাঁর সহিত আলাপ করেছিলেন। উভয়ের সহিত উত্তর কালে চিঠিপত্রেরও আদানপ্রদান হয়েছিল। অথচ একই পরিবারের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান মানুষটির সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে নি। এই কারণে মনে হয় খ্যাতির অসাম্য পরস্পরের মিলনে সম্ভবত বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় নি। উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হবার কোনো যোগসূত্র ছিল না বলেই সম্ভবত এমন ঘটেছে। প্রথম জীবনে উভয়ের মধ্যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা হেতু এমনটি ঘটে থাকবে।

উভয়ের জীবন যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুরু হয়েছিল এ কথা খুবই সত্য। বিবেকানন্দ ছিলেন বৈরাগী সন্ন্যাসী। তিনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গৃহী, সংসারী। তিনি সংসারের মাঝখানে থেকেই মুক্তির সন্ধান করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের ওপর বিবেকানন্দের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তা প্রচার করে এক অবিমিশ্র অদ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব, বহুরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগতের আমরা পরিচয় পাই তাকে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাকে মায়ার খেলা বলে তা উড়িয়ে দিতে চায়। অপর পক্ষে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের জগত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বভাবে সত্য এবং তার মধ্যে মায়ার কোনো চাতুরী লুকানো নেই।

অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে দুই বিভিন্ন পথে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁদের সাধনার জীবন আরম্ভ হয়ে থাকলেও পরবর্তী জীবনে পরিণত আকারে তাঁদের জীবনদর্শন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এমন কি দেখা

যাবে সাধন-জীবনের শেষ অধ্যায়ে উভয়ে যে উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন তা মোটামুটি একই ধরণের। উভয়ের জীবনদর্শন পরিণতিতে একত্র মিলিত হয়েছিল। যাঁরা জীবনকালে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে সংযুক্ত হতে পারেন নি, তাঁরা সাধন-জীবনে সাধনালব্ধ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েছিলেন। এই দুই মহামনীষীর সাধনপথে মিলনের এই বিচিত্র ইতিহাসখানি এখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

প্রথম জীবনে ভারতের এই দুই বিশিষ্ট সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কি গভীর পার্থক্য বর্তমান ছিল, তা ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম হবে বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁদের দার্শনিক মতের তুলনা করলে। বেদান্তের যে ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে প্রচার করেছিলেন বিবেকানন্দ তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে এর থেকে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা কিছু থাকতে পারে না। শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মতকে অদ্বৈত বেদান্ত বলা হয়। কারণ, যাকে বলা যায় অবিমিশ্র একবাদ তাকেই তিনি প্রচার করেন। তাঁর মতে বিশ্ব জুড়ে একটি মাত্র সত্তা বর্তমান এবং তা হল চিন্ময় আত্মাস্বরূপ। তার মধ্যে দ্বৈতভাবের কোনো অবকাশ নেই। কাজেই দেখবার, শোনবার, জানবার বা স্পর্শ করবার দ্বিতীয় কেউ নেই। চৈতন্যময় ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু তাঁর চৈতন্যকে প্রতিফলিত করতে কোনো জ্ঞানের বস্তু নেই। তিনি বলেন সূর্য যেমন মহাকাশে তার কিরণকে প্রতিফলিত করবার কিছু থাক বা নাই থাক, তবু কিরণ বিকীর্ণ করে, এখানেও সেইরূপ জ্ঞানের বস্তু কিছু না থাকলেও সেই একক মহান সত্তার চৈতন্য নিত্য বিরাজমান থাকে। তা যদি হয়, তা হলে আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয় বর্ণ-গন্ধ-রঙে বিচিত্র যে বহু সত্তাবিশিষ্ট বিশ্বের পরিচয় এনে দেয়, তার ব্যাখ্যা কি হবে? শঙ্করাচার্য বলেন, মায়ার বিভ্রান্ত করবার শক্তি-হেতু আমরা ভুল ক'রে বিশ্বকে এমন বহুরূপে দেখি। বাস্তবে তা বহু নয়, যা দেখি তা ব্রহ্মের সত্তারূপের বিবর্তিত ছবি। তা স্বপ্নের মত অলীক। স্বপ্নে একই মন বহুকে দেখে, শোনে, জানে। কিন্তু, আসলে স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্যময় মন ছাড়া ত আর কিছু থাকে না। এখানে আমরা বিভ্রান্তির প্রভাবে যা অবিমিশ্র ভাবে এক, তাকে বহু রূপে প্রত্যক্ষ করি।

শঙ্করাচার্য-রচিত বেদান্তের এই ব্যাখ্যাকে যে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর রচনা ও বক্তৃতাবলী পড়লেই বেশ বোঝা যায়। এই সম্পর্কে তাঁর রচিত একটি ছোট কবিতার একটি স্তবকের মধ্যে অদ্বৈতবাদের স্বীকৃতির সুন্দর স্বাক্ষর আছে। তা অতি সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদের মর্ম কথাটি শোনায়।

স্তবকটি এই :

একমাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
অমায়, অরূপ, অক্লেদ নিশ্চয় ;
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এসব স্বপ্নের ছায়া।

(জ্ঞানযোগ)

এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এই কয়েকটি লাইনের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্তের সব কটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ হয়েছে যে বিশ্ব একটিমাত্র অবিভাজ্য সত্তা নিয়ে গঠিত, তার প্রকৃতি চৈতন্যময় এবং আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয় যে বহুধায় খণ্ডিত বৈচিত্র্যময় জগতের পরিচয় এনে দেয় তা স্বপ্নের মত অলীক বস্তু।

বিশ্ব সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি মুখ্যত কবি, অনুভূতি-বৃত্তি তাঁর একান্ত প্রবল। পরমসত্তার দ্বৈতভাব-বিহীন নিঃসঙ্গ একাকিত্ব তাঁর মনোমত কিছুতেই হতে পারে না। যে দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্বের দ্বৈতভাবকে স্বীকার করে না তা বড় নিঃসঙ্গ, তা বড় নীরস, সেখানে দু'য়ের জানা-জানি নেই, দু'য়ের ভালবাসাবাসি নেই, সেখানে ভালবাসবার বা ভক্তি করবার পাত্র নেই। এমন কি ঈশ্বরের সহিত ভক্তির সূত্রে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে সংযুক্ত হবার সুযোগও নেই। এই পরিকল্পনায় পরমসত্তার আনন্দরূপটি উদ্‌ঘাটিত হবার সুযোগ থাকে কৈ ? এই কারণেই চৈতন্যদেব একদিন শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। এই কারণেই অদ্বৈত বেদান্তদর্শনের বিশ্ব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর কাব্যে, তাঁর বিভিন্ন রচনায় নানা যুক্তি দিয়ে এই ব্যাখ্যার তিনি ঘোর বিরোধিতা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তার দু-একটি উদাহরণ এখানে স্থাপন করা যেতে পারে :

মায়াবাদ ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বকে মায়ার খেলা বলে অস্বীকার করে। তার এই দার্শনিক প্রতিপাদ্য সম্পর্কে তিনি সন্দেহের প্রশ্ন তুলেছেন এই ভাবে :

তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে, থাকে, আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ, আর-সব আছে আর নাই ?
যুগ যুগান্তর ধ'রে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই ?

(কড়ি ও কোমল, চিরদিন)

বিশ্বসত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে একই কবিতায় নিজের অভিমতের তিনি কিছু আভাসও দিয়েছেন এই ভাবে :

বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন—
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

মায়াবাদ বিশ্ব সম্বন্ধে যে পরিচয় দেয় তা বড় শুষ্ক, বড় নীরস, তা অন্ধ অন্ধকারের সামিল। এই যেন কবির মত। জগতটা মায়ার খেলা নয়, তা স্বপ্নের মত প্রপঞ্চময় নয়—এই তাঁর দৃঢ় ধারণা। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে বিশ্বসত্তা আমাদের প্রবঞ্চনা করবার জন্য এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে বিচিত্র বিশ্বকে মোহ দিয়ে রচনা করেছেন। তাই তিনি ক্ষোভভরে অদ্বৈতবাদীর জন্য এই ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন :

হায়রে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে—
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।
লয়ে কুশাঙ্কুরবুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে
মিথ্যা ব'লে জানিয়াছ বিশ্ববসুন্ধরা—
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।

(সোনার তরী, মায়াবাদ)

প্রথম জীবনে এই দুই মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কি গভীর পার্থক্য বর্তমান ছিল, তা উপরের আলোচনা হতে বেশ বোঝা যায়। একজনের ধারণা অনুসারে বিশ্ব হল মায়ার রচনা ; অপরের বিশ্বাস, এই বিশ্বের মধ্যেই পরমসত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ। একজন বৈরাগ্যসাধনে মুক্তিসাধনা করতে উন্মুখ। অপর জন দৃশ্য-গন্ধ-গানে বিচিত্রিত এই বিশ্বেই ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ না ক'রে পরমসত্তার সন্ধান করেছেন। একজন যদি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে উত্তর মেরুর মানুষ হন, অপরটিকে দক্ষিণ মেরুর মানুষ বলে ধরে নেওয়া উচিত।

অথচ আশ্চর্য এই যে, পরিণতিতে তাঁদের এই সাধনলব্ধ উপলব্ধি তাঁদের একই স্থানে মিলিয়ে দিয়েছিল। দুই বিপরীত পথে যাত্রা সুরু ক'রেও বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তাঁরা একই মিলনক্ষেত্রে উপনীত হয়েছিলেন। মনে হয় এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁদের উভয়েরই মনে তাঁদের অজ্ঞাতসারে অন্তর্নিহিত এক ভাবের ঐক্য বর্তমান ছিল বলে। প্রথম জীবনে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের গলায় তাঁরা বরমাল্য

দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কোনটিরই এই ঐক্যসাধক ভাবটির সহিত সংযোগ ছিল না। পরবর্তী জীবনে তাঁদের চিন্তাধারা পরিণতির পথে যত অগ্রসর হয়েছে ততই তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। অবশেষে প্রথম অবস্থার পারস্পরিক মতের অনৈক্য খণ্ডিত হয়ে মিলনের পথের বাধা অপসারিত হয়েছে। উভয়ের ক্ষেত্রে এই ঐক্যসাধক ভাবধারা হল তাঁদের গভীর হৃদয়বত্তা।

বুদ্ধদেবের সেকালের মানুষ নাম দিয়েছিল 'পরম কারুণিক মহর্ষি।' তাঁর কারুণিকতাই সে কালের মানুষের মনকে সব থেকে বেশী মুগ্ধ করেছিল। বাস্তবিকই তাঁর মত হৃদয়বান মানুষ কেউ হতে পারে কল্পনা করা যায় না। তাঁর ভাগ্যে ত সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্যের কোনো অভাব ছিল না। রাজবংশে তাঁর জন্ম, স্নেহশীল পিতা সর্বক্ষণ দেখতে তৎপর যে তনয় যেন কোনো দুঃখের সংস্পর্শে না আসে। সঙ্গিনী হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন পতিগতপ্রাণা সুন্দরী পত্নী। জীবনের পাত্রটি সকল সম্ভাব্য সুখে পরিপূর্ণ ছিল। তবু তিনি তাকে অতি সহজেই ভগ্নপাত্রের মত প্রত্যাখ্যান ক'রে সংসারত্যাগী হয়ে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিশ্বমানবের দুঃখ তাঁর মনকে এত গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল বলেই ত তাদের দুঃখমোচনের এই সাধনা তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

এই মহর্ষির এই অনন্যসাধারণ কারুণিকতা যেমন রবীন্দ্রনাথের মনকে স্পর্শ করেছিল, তেমন করেছিল বিবেকানন্দের মনকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁর রচিত বুদ্ধদেবের প্রশস্তি হতেই হৃদয়ঙ্গম হবে। আজ বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র মানবজাতি তার ইতিহাসের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছে। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে আজ প্রীতি নেই, আছে বিদ্বেষ; বাস্তব সম্পদ সঞ্চয়ের লোভে তারা তীব্র এবং হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উন্মত্ত। আজ মহাপ্রলয়ের দুঃসহ দুঃস্বপ্ন মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। বিভ্রান্ত মানুষকে এই আত্মসংহারের পথ হতে নিবৃত্ত করতে রবীন্দ্রনাথ ভগবান বুদ্ধের পুনরাবির্ভাব কামনা ক'রে যে প্রশস্তি রচনা করেছেন তার তুলনা হয় না। কারণ, তাঁর বিশ্বাস এই পরমকারুণিক মহর্ষির বাণীই মানুষের মনের এই বিদ্বেষ-বহ্নি নির্বাপিত করবার ক্ষমতা রাখে। তিনি তাই পুনরায় আবির্ভাবের জন্য বুদ্ধদেবকে এই বলে আহ্বান জানিয়েছেন :

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর 'ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।"

(ব্রহ্মসঙ্গীত)

বিবেকানন্দের ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল স্বতন্ত্র ধরণের। রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল সর্বতোভাবে, কিন্তু বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা ছিল নির্বাচিত ক্ষেত্রে। বিবেকানন্দ বুদ্ধের সকল দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বুদ্ধের করুণাবৃত্তি তাঁকে এত বেশী মুগ্ধ করেছিল যে, সকল বিরূপ মনোভাব ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর হৃদয়কে তা সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। আমাদের এই প্রতিপাদ্যটি বিবেকানন্দের নীচে-উদ্ধৃত উক্তির দ্বারা সমর্থিত হবে :

"আমি সেই গৌতম বুদ্ধের ন্যায় চরিত্রশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না ; যিনি এই সম্বন্ধে কখন প্রশ্নই করেন নাই, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারাজীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই যাঁহার চিন্তা ছিল।"

(জ্ঞানযোগ)

দেখা যাবে উভয়ের এই হৃদয়ধর্মই সাধনার ক্ষেত্রে উভয়কে মিলনের পথে আকৃষ্ট করেছে। আবার উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব হয়েছে একটি দ্বন্দ্বের অবস্থার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে। এই অতিরিক্ত সাদৃশ্যটি তাঁদের এই মিলনের ইতিহাসকে আরও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে।

অদ্বৈত বেদান্তের অবিমিশ্র একত্ববাদের গলায় বরণ-মালা দিয়ে বিবেকানন্দ একটি দোটানার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিশ্ব যদি প্রপঞ্চময় হয়, তা যদি স্বপ্নের মত অলীক হয়, তা হলে মানুষের জীবনে দুঃখকষ্ট ভোগও ত অলীক। তার জন্য ত আর হৃদয়বৃত্তির অপব্যয়ের কোনো অর্থ থাকে না। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি যা বলেছিল তাঁর হৃদয়বৃত্তি তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারে নি। সেই জন্যই দোটানার সমাধান খুঁজতে বিবেকানন্দের বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছিল। তার ফলে তিনি একটি সমাধানের পথও খুঁজে পেয়েছিলেন। এই চিন্তার সাহায্যে তিনি এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন যে, ইন্দ্রিয়গোচর